রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা

রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা

প্রথম খণ্ড · ১৯৬৫

সম্পাদক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

চিত্রাবলী

মুখপাতে মুদ্রিত রবীন্দ্র-প্রতিকৃতির ব্লক শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের সৌজন্যে

ভূমিকা

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসবের সময় একটি বার্ষিক রবীন্দ্রানুশীলন পত্রিকা প্রকাশের কথা ওঠে। বিশ্বভারতীর তদানীন্তন আচার্য পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর অভিপ্রায় অনুসারে এই পত্রিকা প্রকাশের ভার বিশ্বভারতী গ্রহণ করেন।

গত বৎসর শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হয়ে বিশ্বভারতীতে যোগ দিলে রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার ভার তাঁর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। সে ভার তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করেছেন।

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার বর্তমান খণ্ডের প্রধান আকর্ষণ মালতী-পুঁথি—গুরুদেবের হস্তাক্ষর-সংবলিত একটি পুরাতন খাতা। আজ পর্যন্ত গুরুদেবের যত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে এই খাতাটি তার মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন। তাঁর তের-চোদ্দ বছর বয়সের রচনার খসড়া এই খাতায় পাওয়া যাচ্ছে। বিজনবিহারী নিরতিশয় সতর্কতা সহকারে এই পুঁথিটিও সম্পাদন করেছেন। তাঁর টীকা-টিপ্পনী ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এবং শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের পাণ্ডুলিপি-পরিচয় বালক রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য-সাধনার উপরে নূতনতর আলোকপাত করছে।

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসায় প্রবন্ধ দিয়ে আমাদের আনুকূল্য করেছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। আমাদের জ্যেষ্ঠতম আশ্রমিক শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর অঙ্কিত প্রচ্ছদপটে গুরুদেবের পুণ্যস্মৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা পুনর্মুদ্রিত হয়ে রইল।

শান্তিনিকেতন
অক্টোবর ১৯৬৫

সুধীন্দ্র[illegible]

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
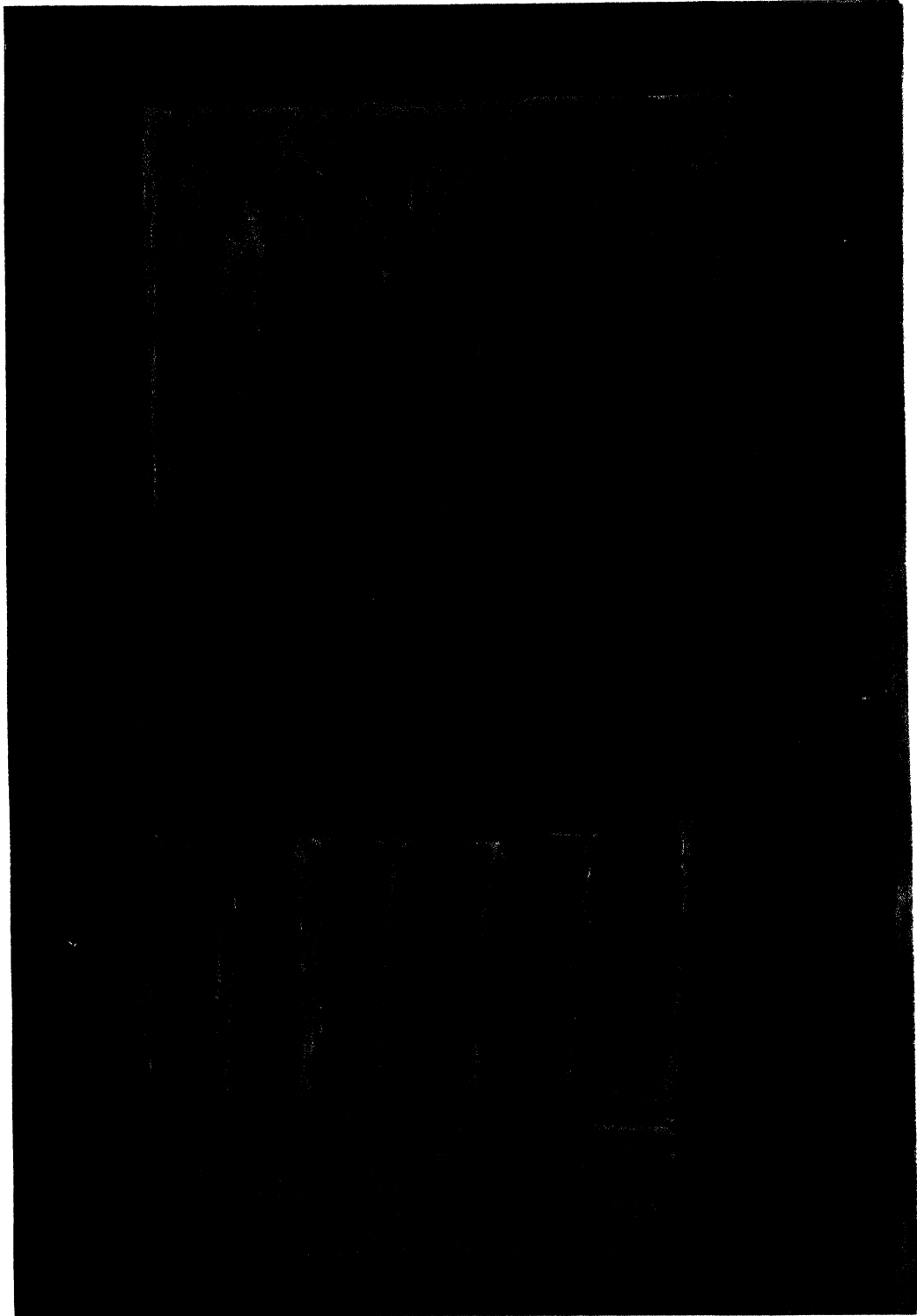
মালতী-পুঁথি

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা ১/২ক]

প্রথম সর্গ

হা বিধাতা—ছেলেবেলা হতেই এমন
দুর্ব্বল হৃদয় লয়ে লভেছি জনম,
আশ্রয় না পেলে কিছু, হৃদয় আমার
অবসন্ন হোয়ে পড়ে লতিকার মত ।
স্নেহ আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ না হইলে
কাঁদে ভূমিতলে পোড়ে হোয়ে ম্রিয়মান ।২·১
তবে হে ঈশ্বর ! তুমি কেন গো আমারে
ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে করিলে নিক্ষেপ ;
যেখানে সবারি হৃদি যন্ত্রের মতন ;
স্নেহ প্রেম হৃদয়ের বৃত্তি সমুদয়
কঠোর নিয়মে যেথা হয় নিয়মিত ।
কেন আমি হলেম না কৃষক-বালক,
ভায়ে ভায়ে মিলে মিলে করিতাম খেলা,
গ্রাম প্রান্তে প্রান্তরের পর্ণের কুটীরে
পিতামাতা ভাইবোন সকলে মিলিয়া
স্বাভাবিক হৃদয়ের সরল উচ্ছ্বাসে,
মুক্ত ওই প্রান্তরের বায়ুর মতন
হৃদয়ের স্বাধীনতা করিতাম ভোগ ।
শ্রান্ত হোলে খেলা-সুখে সন্ধ্যার সময়ে
কুটীরে ফিরিয়া আসি ভালবাসি যারে
তার স্নেহময় কোলে রাখিতাম মাথা,
তা হইলে দ্বেষ ঘৃণা মিথ্যা অপবাদ

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আর হতনা সহিতে।
হৃদয় বিহীন প্রাসাদের আড়ম্বর
গর্ব্বিত এ নগরের ঘোর কোলাহল
কৃত্রিম এ ভদ্রতার কঠোর নিয়ম
ভদ্রতার কাষ্ঠ হাসি, নহে মোর তরে।
দরিদ্র গ্রামের সেই ভাঙ্গাচোরা পথ,
গৃহস্থের ছোটখাট নিভৃত কুটীর
যেখানে কোথা বা আছে, তৃণ রাশি রাশি,
কোথা বা গাছের তলে বাঁধা আছে গাভী
অযত্নে চিবায় কভু গাছের পল্লব
কভু বা দেখিছে চাহি বাৎসল্য-নয়নে
ক্রীড়াশীল কুটীরের শিশুদের দিকে।
কুটীরের বধু[২.২] গণ উঠিয়া প্রভাতে
আপনার আপনার কাজে আছে রত।
সে ক্ষুদ্র কুটীর আর ভাঙ্গাচোরা পথ,
দিগন্তের পদতলে বিশাল প্রান্তর[২.৩]

... ...

তাহইলে মধুময় কবিতার মত
কেমন আরামে যেত জীবন কাটিয়া।

এমন হৃদয়হীন উপেক্ষার মাঝে
একজন ছিল মোর প্রেমের প্রতিমা,
অমিয়া, সে বালিকারে কত ভালবাসি।
দিগন্তের দূর প্রান্তে ঘুমন্ত চন্দ্রমা,
ধবল জলদ জালে, আধো আধো ঢাকা—
বালিকা তেমনি আহা মধুর কোমল।
সেই বালা দয়া করি হৃদয় আমার
রেখেছিল জুড়াইয়া স্নেহের ছায়ায়।

অনন্ত-প্রণয়ময়ী রমণী তোমরা
পৃথিবীর মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
তোমাদের স্নেহধারা যদি না বর্ষিত
হৃদয় হইত তবে মরুভূমি সম
স্নেহ দয়া প্রেম ভক্তি যাইত শুকায়ে।
তোমরাই পৃথিবীর সঙ্গীত, কবিতা,
স্বর্গ, সে ত তোমাদের হৃদয়ে বিরাজে
সে হৃদয়ে স্নেহছায়ে দিলে গো আশ্রয়
পাষাণ-হৃদয় সেও যায় গো গলিয়া!
কেহই আশ্রয় যবে ছিলনা অমিয়া!
জননী, ভগ্নীর মত বেসেছিলে ভাল
সে কি আর এ জনমে পারিব ভুলিতে!
বিষন্ন কাতর এক বালকের পরে
সে যে কি স্নেহের ধারা করেছ বর্ষণ
চিরকাল হৃদয়ে তা' রহিবে মুদ্রিত।
ওই স্নেহময় কোলে রাখি শ্রান্ত মাথা
কাতর হইয়া কত করেছি রোদন
কত না ব্যথিত হোয়ে আদরে যতনে
অঞ্চলে সে অশ্রুজল দিয়াছ মুছায়ে।
কবিতা লিখিলে ছুটে ওই কোলে গিয়া
ওই গলা ধোরে তাহা শুনাতাম কত
বাল্য হৃদয়ের মোর যত ছিল কথা
তোমার কাছেতে কিছু করিনি গোপন।
ওই স্নেহময় কোল ছিল স্বর্গ মোর
সেইখানে একবার মুখ লুকাইলে
সব শ্রান্তি সব জ্বালা যেত দূর হোয়ে।
শ্রান্ত শিশুটির মত ওই কোলে যবে
নীরবে নিষ্পন্দ হোয়ে রহিতাম শুয়ে

অনন্ত স্নেহেতে পূর্ণ আনত নয়নে
কেমন মুখের পানে চাহিয়া রহিতে
তখন কি হর্ষে হৃদি যাইত ফাটিয়া !
কতবার করিয়াছি কত অভিমান,
আদরেতে উচ্ছ্বসিয়া কেঁদেছি কতই।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা ১/২খ]

প্রতিকূল বায়ুভরে, ঊর্ম্মিময় সিন্ধুপরে
তরীখানি যেতেছিল ধীরি,
কম্পমান কেতু তার, চেয়েছিল কতবার
সে দ্বীপের পানে ফিরি ফিরি।
যারে আহা ভালবাসি, তারে যবে ছেড়ে আসি,
যত যাই দূর দেশে চলি,
সেই দিক পানে হায়, হৃদয় ফিরিয়া চায়
যেখানে এসেছি তারে ফেলি !

—॥—

বিদেশেতে দেখি যদি, উপত্যকা দ্বীপ, নদী,
অতিশয় মনোহর ঠাঁই
সুরভি কুসুমে যার, শোভিত সকল ধার
শুধু হৃদয়ের ধন নাই
তখন কি হয় মনে, থাকিতাম এইখানে
হেথা যদি কাটিত জীবন
রয়েছে যে দূর দেশে, সে যদি থাকিত পাশে
কি যে সুখ হইত তখন !

—॥—

পূর্ব্ব যবে সন্ধ্যাকালে, গ্রাসে অন্ধকার জালে
ভীত পান্থ চায় ফিরে ফিরে
দেখিতে [সে] শেষ জ্যোতি, মৃদুতর হোয়ে অতি
এখনো যা' জ্বলিতেছে ধীরে—
তেমনি সুখের কাল, গ্রাসে গো আঁধার জাল
অদৃষ্টের সায়াহ্নে[২.৪] যখন
ফিরে চাই বারে বারে শেষবার দেখিবারে
সুখের সে মুমূর্ষু কিরণ!

—॥—

এস এস এই বুকে, নিবাসে তোমার…
… … …
জানিনা জানিতে আমি চাহিনা চাহিনা—
ও হৃদয়ে একতিল দোষ আছে কিনা—
ভালবাসি তোমারে গো এই শুধু জানি—
তাই হোলে হল, আর কিছু নাহি মানি
কিসের সে চিরস্থায়ী ভালবাসা তবে
গৌরবে কলঙ্কে যাহা সমান না রবে।
দেবতা, সুখের দিনে বলেছ আমায়
বিপদে দেবতা সম রক্ষিব তোমায়
অগ্নিময় পথ দিয়া যাব তব সাথে
রক্ষিব, মরিব কিম্বা তোমারি পশ্চাতে।

—॥—

কষ্টের জীবন

মানুষ কাঁদিয়া হাসে, পুনরায় কাঁদে গো হাসিয়া।
পাদপ শুকায়ে গেলে তবুও সে না হয় পতিত
তরণী ভেঙ্গেও গেলে তবু ধীরে যায় সে ভাসিয়া
ছাদ যদি পোড়ে যায় দাঁড়াইয়া রহে তবু ভিত।

বন্দী চোলে যায় বটে তবুও ত রহে কারাগার
মেঘ ঢাকিলেও সূর্য্যে দিন তবু অস্ত নাহি হয়—
তেমনি হৃদয় যদি ভেঙ্গেচূরে হয় চূরমার—
কোন ক্রমে বেঁচে থাকে তবুও সে ভগন হৃদয়।
ভগন দর্পণ যথা ক্রমে [গো] যতই ভগ্ন হয়
ততই সে শত শত প্রতিবিম্ব করয়ে ধারণ
তেমনি হৃদয় হোতে কিছুই গো যাইবার নয়
হোক না শীতল স্তব্ধ শত খণ্ডে ভগ্ন চূর্ণ মন
হউক্ না রক্তহীন, হীনতেজ তবুও তাহারে
বিনিদ্র জ্বলন্ত জ্বালা ক্রমাগত করিবে দহন
শুকায়ে শুকায়ে যাবে অন্তর বিষম শোক ভারে
অথচ বাহিরে তার চিহ্ন[২.৬] মাত্র না পাবে দর্শন।
মানুষের নিরাশার অগ্নিময় আছে কি জীবন,
সে বিষ বাঁচায়ে রাখে কোন ক্রমে ভগন হৃদয়
নিরাশার সে জীবন কিন্তু সেই ফলের মতন
মৃত-সিন্ধুতীরে জন্মে অভ্যন্তর যার ভস্মময়।[২.৭]

—॥—

ভালবাসে যারে তার চিতাভস্ম [২.৮] পানে
প্রেমিক যেমন চায় কাতর নয়ানে
তেমনি যে তোমা পানে নাহি চায় গ্রীস্
তাহার হৃদয় মন পাষাণ কুলিশ
ইংরাজেরা ভাঙ্গিয়াছে প্রাচীর তোমার[২.৯]
... ...

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 5/৩ক]

[ধূম]কেতু সম তারা কি কুক্ষণে হায়
[ছা]ড়িয়া সে ক্ষুদ্র দ্বীপ আইল হেথায়
[অ]সহায় বক্ষ তব রক্তময় করি
দেবতা প্রতিমাগুলি লয়ে গেল হরি।

—॥—

সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন
উত্তর অয়ন যবে করিল আশ্রয়
দক্ষিণের দিকবালা প্রাণের হুতাশে[৩.১]

... ...

সুন্দরীর পদাঘাত না পাইতে তবু
ফুটিয়া উঠিল যত অশোকের ফুল
নবীন পল্লব দিয়া রচি পক্ষগুলি,
ভ্রমর অক্ষরে লিখি মদনের নাম
নব চূত-বাণ চয় নির্ম্মিল বসন্ত।
মনোহর বর্ণময় কর্ণিকার ফুল
ফুটিল, নাইক যাহে সুবাসের লেশ
বিধাতা সকল গুণ দেন কি সবারে ?
মর্ম্মর শবদ করি জীর্ণ পত্রগুলি
ফেলে ধীরে বনস্থলী বায়ুর পরশে
মদোদ্ধত হরিণেরা করে বিচরণ
পিয়াল মঞ্জরী হোতে রেণু ঝরি ঝরি
যাদের বিশাল আঁখি হোয়েছে আকুল

× × × ×

যখন মদন বসি বনশ্রীর কোলে
পুষ্প শরে গুণ তার করিল বন্ধন
স্নেহরসে মগ্ন হল যত ছিল প্রাণী
একই কুসুম-পাত্রে ভ্রমর প্রিয়ার
পীত-অবশেষ মধু করিল গো পান।
স্পর্শ-নিমীলিত চক্ষু মৃগীর শরীরে
কৃষ্ণসার শৃঙ্গ দিয়া করিল আদর,
আধেক মৃণাল খেয়ে সুখে চক্রবাক্
আধেক তুলিয়া দিল প্রিয়ার মুখেতে।
পুষ্পমদ পান করি ঢল ঢল আঁখি—

কিম্পুরুষ ললনারা গাইতেছে গান
প্রিয়তম তাহাদের হইয়া বিহ্বল
থেকে ২ প্রিয়ামুখ করিছে চুম্বন।
কুসুম-স্তবকগুলি স্তন যাহাদের
নব কিসলয়গুলি ওষ্ঠ মনোহর
বাঁধিল সে লতিকারা বাহুপাশ দিয়া
নম্রশাখা তরুদের গাঢ়-আলিঙ্গনে।
লতাগৃহ দ্বারে নন্দী করি আগমন
বাম করতলে এক হেম বেত্র ধরি
অধরে অঙ্গুলি দিয়া করিল সঙ্কেত
নিষ্কম্প অমনি বৃক্ষ নিভৃত ভ্রমর[৩.২]

... ...

শুকতারা সমান অযাত্রা মনে গণি
নন্দীর নয়ন পথ এড়ায়ে মদন
নমেরু তরুর ডালপালার আড়ালে
হেরিল মহাদেবের ধ্যানের প্রদেশ
দেখিল সে—মহাদেব শার্দ্দূল-আসনে
দেবদারু বেদী পরে আছেন বসিয়া—
শোভিতেছে সন্নমিত দৃঢ় স্কন্ধদেশ
কোলে তাঁর হাত দুটি রয়েছে অর্পিত
প্রফুল্ল পদ্মের মত শোভিছে কেমন।
বদ্ধ দরশন জটা কলাপ ভুজঙ্গ[৩.৩]
কর্ণে তাঁর অক্ষসূত্র রয়েছে জড়িত—
গ্রন্থিবদ্ধ কৃষ্ণসার হরিণ-অজিন
ধরিয়াছে নীলবর্ণ কণ্ঠের প্রভায়।
ঈষৎ প্রকাশে যার স্তিমিত তারকা
শান্ত যার ভ্রূযুগল অচল নিষ্পন্দ
অকম্পিত পক্ষ্মমালা ভেদ করি যার—

বিকীরিত হইতেছে শান্ত জ্যোতিরাশি
সে নেত্র নাসাগ্রভাগ করিছে বীক্ষণ।
অবৃষ্টি-সংরম্ভ স্তব্ধ মেঘের মতন
তরঙ্গবিহীন শান্ত সমুদ্রের মত
নির্ব্বাত নিষ্কম্পা অগ্নিশিখার সমান
মহাদেব শান্তভাবে ধোয়ানে নিমগ্ন!
মস্তক করিয়া ভেদ উঠিয়াছে জ্যোতি
কপালের শশধরে করিয়া মলিন।
মনের অগম্য সেই মহাদেবে হেরি'
মদনের সকম্পিত হস্তদ্বয় হতে
থর থর কাঁপি খসি পড়িল ধনুক।
হেন কালে বনদেবীদের সাথে সাথে
উমা পশিলেন সেই বনস্থলী মাঝে—
হেরি সে অতুল রূপ পাইয়া আশ্বাস
মদন তুলিয়া নিল ধনুর্ব্বাণ তার।
পদ্মরাগ মণি জিনি অশোক কুসুম
কনক বরণ জিনি কর্ণিকার ফুল
মুকুতা কলাপ সম সিন্ধুবার মালা[৩.৪]

... ...

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 6/৩খ]

স্তনভারে নতকায় ঈষৎ অমনি
অবনত কুসুমের মঞ্জরীর ভারে
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটির মত।
থেকে থেকে খুলে পড়ে বকুল মেখলা,
বার বার হাতে কোরে রাখেন আটকি!
ভ্রমর তৃষিত হোয়ে নিশ্বাস-সৌরভে,
বিম্ব-অধরের কাছে বেড়ায় উড়িয়া।

সম্ভ্রমে বিলোল-দৃষ্টি উমা প্রতিক্ষণ
লীলা-শতদল নাড়ি দিতেছেন বাধা।
যাঁর রূপরাশি হেরি রতি লজ্জা পায়
অকলঙ্ক সে উমারে করি নিরীক্ষণ
জিতেন্দ্রিয় শূলীরেও বাণ সন্ধানিতে,
রতিপতি বক্ষে নিজ বাঁধিল সাহস।
শৈলসুতা ভবিষ্যৎপতি শঙ্করের
লতাগৃহ দ্বার মাঝে করিলা প্রবেশ।
পরমাত্মা সন্দর্শনে পরিতৃপ্ত হোয়ে
যোগ ভাঙ্গি উঠিলেন মহেশ তখন।

× × × ×

নন্দী তাঁর পদতলে প্রণিপাত করি
উমা আগমন বার্ত্তা করিল জ্ঞাপন।
ঈষৎ ভ্রূক্ষেপমাত্রে মহেশ অমনি
পার্ব্বতীরে প্রবেশিতে দিলা অনুমতি!
উমার স্বহস্তে তুলা, পল্লবে জড়িত
হিমসিক্ত ফুলগুলি অর্পি পদতলে
সখীগণ মহাদেবে করিল প্রণাম।
উমাও যেমন তাঁরে করিলা প্রণাম[৩.৫]

… … …

পদ্মবীজ মালা লয়ে আরক্তিম করে
মহেশের হস্তে উমা করিলা অর্পণ!
সম্মোহন পুষ্পধনু করিয়া যোজনা
অমনি শিবের প্রতি হানিলা মদন!
অমনি হইলা হর ঈষৎ অধীর
সবেমাত্র চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশি সম
উমার মুখের পরে মহেশ তখন
একেবারে ত্রিনয়ন করিলা নিবেশ।

অমনি উমার দেহ উঠিল শিহরি,
সরম-বিভ্রান্ত নেত্রে লাজনম্র-মুখে
পার্ব্বতী মাটির পানে রহিলা চাহিয়া।
মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়ক্ষোভ করিয়া দমন
বিকৃতির হেতু কোথা দেখিবার তরে
দিগন্তে করিল দেব ত্রিনয়ন-পাত।
দেখিলা জ্যাবদ্ধ মুষ্টি সশর মদন
তাঁর লক্ষ্য নিজ [৩.৬] করেছে নিবেশ।
তপস্যার বিঘ্ন হেরি ক্রুদ্ধ অতিশয়
ভ্রূভঙ্গ-দুষ্প্রেক্ষ্য [৩.৭] মুখ মহা-তপস্বীর
তৃতীয় নয়ন হোতে ছুটিল অনল।
ক্রোধ প্রভু সংহর সংহর এই বাণী[৩.৮]
... ...
হইল মদন তনু ভস্ম [৩.৯] অবশেষ।

—॥—

ধ্বজা লয়ে গেলে যথা প্রতিকূল বাতে
অংশুক তাহার মুখ ফিরায় পশ্চাতে।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 7/৪ক] [৪.১]

... ...
বাহিরের আবরণ খুলে যায় যেন ;—
জগতের মর্ম্মগত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার
এ চোখের সামনে যেন হয় প্রকাশিত !
দুইজনে আছিলাম কল্পনার শিশু
বনে ভ্রমিতাম যবে, সুদূর নির্ঝরে
বনশ্রীর পদধ্বনি পেতাম শুনিতে !

যাহা কিছু দেখিতাম সকলেরি মাঝে
জীবন্ত প্রতিমা যেন পেতেম দেখিতে।
ক্রমশঃ বালককাল হোল অবসান—
নীরদের প্রেমদৃষ্টে পড়িল মালতী
নীরদের সাথে তার হইল বিবাহ।
মাঝে মাঝে যাইতাম তাদের আলয়ে—
দেখিতাম মালতীর সে শান্ত হাসিতে
কুটীরের গৃহখানি রোয়েছে উজলি !
শান্তির প্রতিমাসম বিরাজিত যেন !
সঙ্গীহারা হোয়ে আমি ভ্রমিতাম একা—
নিরাশ্রয় এ হৃদয় অশান্ত হইয়া—
কাঁদিয়া উঠিত যেন অধীর উচ্ছ্বাসে,
কোথাও পেতনা যেন আরাম বিশ্রাম !
[অ]ন্যমনে আছি যবে, হৃদয় আমার
[স]হসা স্বপন ভাঙ্গি উঠিত চমকি—
সহসা পেতনা ভেবে, পেতনা খুঁজিয়া—
আগে কি আছিল যেন এখন তা নাই !
প্রকৃতির কি যেন কি গিয়াছে হারায়ে
মনে তাহা পড়িছে না। ছেলেবেলা হোতে
প্রকৃতির যেই ছন্দ এসেছি শুনিয়া—
সেই ছন্দোভঙ্গ যেন হোয়েছে তাহার—
সেই ছন্দে কি কথার পোড়েছে অভাব,
কানেতে সহসা তাই উঠিত বাজিয়া
[হৃ]দয় সহসা তাই উঠিত চমকি !
[জা]নিনা কিসের তরে, কি মনের দুখে
একটি দীর্ঘশ্বাস উঠিত উচ্ছ্বসি !—
শিখর হোতে শিখরে—বন হোতে বনে
অন্যমনে একেলাই বেড়াতাম ভ্রমি

সহসা চেতন পেয়ে উঠিয়া চমকি
সবিস্ময়ে ভাবিতাম কেন ভ্রমিতেছি,
কেন ভ্রমিতেছি তাহা পেতেম না ভাবি!
একদিন নবীন বসন্ত সমীরণে[৪.২]

... ...

শুনি সে হাসিত কভু, শুনিত না কভু[৪.৩]
আমি ফুল তুলে দিলে ফেলিত ছিঁড়িয়া
ভর্ৎসনার অভিনয়ে কহিত কত কি!—
কভু বা ভ্রূকুটী করি রহিত বসিয়া—
হাসিতে হাসিতে কভু যাইত পালায়ে!
অলীক সরমে কভু হইত অধীর!
কিন্তু তার ভ্রূকুটিতে, সরমে, সঙ্কোচে
লুকানো প্রেমেরি কথা করিত প্রকাশ।
এইরূপে প্রতি উষা যাইত কাটিয়া—
একদিন সে বালিকা না আসিত যদি—
হৃদয় কেমন যেন হইত বিকল—
প্রভাত কেমন যেন যেতনা কাটিয়া—
অবসাদে সারাদিন যেত যেন ধীরে!
বর্ষচক্র আর বার আসিল ফিরিয়া
নূতন বসন্তে পুনঃ হাসিল ধরণী—
প্রভাতে অলসভাবে বসি তরুতলে—
দামিনীরে শুধালেম কথায় কথায়
"দামিনী, তুমি কি মোরে ভালবাসো বালা?"
অলীক সরম-রোষে ভ্রূকুটি করিয়া—
ছুটিয়া পলায়ে গেল দূর-বনান্তরে—
জানিনা কি ভাবি পুনঃ ছুটিয়া আসিয়া
"ভালবাসি—ভালবাসি" কহিয়া অমনি
সরমে মাখানো মুখ লুকালো এ বুকে!

এইরূপে যেত দিন অস্ফুট স্বপনে !
কত ক্ষুদ্র অভিমানে কাঁদিত বালিকা—
কত ক্ষুদ্র কথা লয়ে হাসিত হরষে
কিন্তু জানিতাম নাকো এই ভালবাসা
বালিকার ক্ষণস্থায়ী কল্পনা কেবল ॥
আর-কিছুকাল পরে এই দামিনীরে
যে কথা বলিয়াছিনু আজো মনে আছে—
সুদূর-পর্ব্বতশিরে ইন্দ্রধনু যথা—
মধুর সৌন্দর্য্য তুষে পথিক নয়ন—
যেমন নিকটে যাও অমনি তাহার
বিচিত্র বরণ যায় শূন্যে মিশাইয়া—

—॥—

মরিতে ॥ ছিলনা ॥ সাধ ॥ তোমাতরে ॥ ভাই—
জানি ॥ আমি ॥ গেলে ॥ আর কে রবে ॥ তোমার
আমার মতন ভাল কে বাসিবে আর ?

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা ৪/৪খ][৪.৪]

... ...

তারকার ফুল রাশি দিল ছড়াইয়া
অতি ধীরে সাবধানে নায়ক যেমন
ঘুমন্ত প্রিয়ার মুখ করয়ে চুম্বন,
দিন পরিশ্রমে ক্লান্ত পৃথিবীর দেহ
অতি ধীরে পরশিল সায়াহ্নের[৪.৫] বায়ু ।
দুরন্ত তরঙ্গগুলি যমুনার কোলে
সারাদিন খেলা করি পড়েছে ঘুমায়ে ।
ভগ্ন দেবালয়খানি যমুনার ধারে,
শিকড়ে শিকড়ে যার ছায়ি জীর্ণদেহ
বট অশথের গাছ জড়াজড়ি করি

আঁধারিয়া রাখিয়াছে হৃদয় যাহার
দুয়েকটি বায়ুচ্ছ্বাস পথ ভুলি গিয়া
আঁধার আলয়ে তার হোয়েছে আটক
অধীর হইয়া তারা হেথায় হোথায়
হু হু করি বেড়াইছে পথ খুঁজি খুঁজি!
শুন সন্ধ্যে আবার এসেছি আমি হেথা—
নীরব আঁধারে তব বসিয়া বসিয়া
তটিনীর কলধ্বনি শুনিতে এয়েছি!
হে তটিনী—ওকি গান গাইতেছ তুমি
দিন নাই রাত্রি নাই একতানে শুধু
এক সুরে একি গান গাইছ সতত
এত মৃদুস্বরে—ধীরে—যেন ভয় করি
সন্ধ্যার প্রশান্ত স্বপ্ন না যায় ভাঙ্গিয়া!
এ নীরব সন্ধ্যাকালে—তব মৃদু গান
একতান ধ্বনি তব শুনি মনে হয়
এ হৃদি গানের যেন শুনি প্রতিধ্বনি!
মনে হয় যেন তুমি আমারি মতন
কি এক প্রাণের ধন ফেলেছ হারায়ে
তাই লোয়ে এক সুরে এক তানে সদা
এ কি গান গাইতেছ দিন রাত্রি ধরি!
সে গানের নাইক বিরাম অবসান।
হতভাগ্য কবি আমি কি বলিব আর—
যে কথা বলিতে যাই কহি সেই কথা
যে গান গাহিতে যাই গাই সেই গান!
এ পুরাণো কথা আর এ পুরাণো গান
কেহই—কেহই যদি না শুনিতে চায়
অভাগার অশ্রুসাথে অশ্রু না মিশায়—
তবে আর কাহারেও শুনাতে চাহিনা—

গাহিব আপন মনে কাঁদিব আপনি—
তটিনীর কলস্বরে—নিশীথ নিশ্বাসে—
[ব]রষার অবিরল বৃষ্টি বারিধারে[৪.৬]
... ...
দুই ভাইবোনে মোরা আছিনু কেমন—
আমি আছিলাম অতি শান্ত ও গম্ভীর—
মালতী প্রফুল্ল অতি সদা হাসি হাসি—
ছিল না সে উচ্ছ্বসিনী নির্ঝরিণী সম
শৈশব তরঙ্গবেগে চঞ্চলা সুন্দরী—
ছিল না সে লজ্জাবতী লতাটির মত
সরম-সৌন্দর্য্য-ভরে ম্রিয়মান[৪.৭] পারা—
আছিল সে প্রভাতের ফুলটির মত
প্রশান্ত হরষে অতি মাখানো মুখানি—
সে হাসি গাহিত ধীরে উষার সঙ্গীত
সকলি পবিত্র আর সকলি বিমল।
মালতীর শান্ত সেই হাসিটির সাথে
হৃদয়ে পড়িত যেন প্রভাত-শিশির—
জাগিয়া উঠিত যেন প্রভাত পবন
নূতন জীবন যেন সঞ্চরিত মনে!
ছেলেবেলাকার যত কবিতা আমার
সে হাসির কিরণেতে উঠেছিল ফুটি—
মালতী আঘাত দিত হৃদয়ের তারে
তাইতে শৈশব-গান উঠিত জাগিয়া।
এমনি আসিত সন্ধ্যা—শ্রান্ত জগতেরে
স্নেহময় কোলে তার ঘুম পাড়াইতে।
সুবর্ণ-সলিল-সিক্ত সায়াহ্ন[৪.৮] অম্বরে
গোধূলির অন্ধকার নিঃশব্দ-চরণে
তারাময় যবনিকা দিত বিছাইয়া—

রবীন্দ্রনাথ

মালতী-পুঁথির সমকালে

মালতীরে লয়ে পাশে আসিতাম হেথা
সন্ধ্যার সঙ্গীত-স্বরে মিলাইয়া স্বর
মৃদুস্বরে শুনাতেম শৈশব কবিতা !
হর্ষময় গর্ব্বে তার আঁখি উজলিত
অবাক্ ভক্তির ভাবে ধরি মোর হাত
মুখপানে একদৃষ্টে রহিত চাহিয়া !
তার সে হরষ হেরি আমারো হৃদয়ে
কেমন নির্দ্দোষ-গর্ব্ব উঠিত উথলি।
ক্ষুদ্র এক কুটীর আছিল আমাদের—
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে[১.৯] আর নীরব সন্ধ্যায়
দূর হতে তটিনীর কলস্বর আসি—
শান্ত কুটীরের কানে গাহিত কেমন
ঘুম পাড়াবার গান অতি ধীরে ধীরে।
চারিদিকে উঠিয়াছে পর্ব্বত শিখরী
সে পর্ব্বত শিরে মোরা উঠিতাম যবে
চারিদিকে যেত খুলে দৃশ্য মনোহর—
হেথা নদী—হোতা হ্রদ—হোথা নির্ঝরিণী
গ্রামের কুটীরগুলি গাছের আড়ালে।
এইখানে—এইখানে শিখেছিনু আমি
কল্পনার কাছ হোতে সে সব কাহিনী
মর্ত্ত্যের ভাষায় যাহা নারি প্রকাশিতে[৪.১০]
... ...

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা ৩/৫ক]

Laura Petrarcha—

প্রতি উচ্চ শাখাময় সরল কানন
প্রতি স্নিগ্ধ-ছায়া, মোর ভ্রমণের স্থান—
শৈলে শৈলে তাঁর সেই পবিত্র আনন,

দেখিতে পায় গো মোর মানস নয়ান।—
সহসা ভাবনা হোতে উঠি যবে জাগি—
প্রেমে মগ্ন মন মোর বলে গো আমায়
"কোথায় ভ্রমিছ ওগো ভ্রমিছ কি লাগি,
কোথা হোতে আসিয়াছ ? এসেছ কোথায় ?"
হৃদে মোর এই সব চঞ্চল স্বপন—
ক্রমে ক্রমে স্থির-চিন্তা করে আনয়ন—
আপনারে একেবারে যাই যেন ভুলি
দহে গো আমারে শুধু তারি চিন্তাগুলি—
মনে হয় প্রিয়া যেন আসিয়াছে কাছে—
সে ভুলে উজলি উঠে নয়ন আমার
চারিদিকে লরা যেন দাঁড়াইয়া আছে—
এ স্বপ্ন না ভাঙ্গে যদি কি চাহি গো আর ?
দেখি যেন, (কেবা তাহা করিবে বিশ্বাস ?)—
বিমল সলিল কিম্বা হরিত কানন
অথবা তুষার-শুভ্র উষার আকাশ
তাহারি জীবন্ত ছবি করিছে বহন !

* * * *

দুর্গম সংসারে যত করি গো ভ্রমণ—
ঘোরতর মরুমাঝে যতদূর যাই
কল্পনা ততই তার মূরতি মোহন—
দিশে দিশে আঁকে যেন দেখিবারে পাই—
অবশেষে আসে ধীরে সত্য সুকঠোর
ভাঙ্গি দেয় যৌবনের সুস্বপন মোর

—॥—

হারে হতভাগ্য বিহঙ্গম সঙ্গীহীন—
সুখ-ঋতু অবসানে গাইছিস্ গীত

ফুরাইছে গ্রীষ্মকাল, ফুরাইছে দিন—
আসিছে রজনী ঘোর, আসিতেছে শীত !
ওরে বিহঙ্গম তুই দুখ গান গাস—
যদি জানিতিস্ কি যে দহিছে এ প্রাণ—
তা হোলে এ বুকে আসি করিতিস্ বাস—
এর সাথে মিশাতিস্ বিষাদের গান !
কিন্তু হা জানিনা তোর কিসের বিষাদ !
ভ্রমিস্‌রে যার লাগি গাহিয়া গাহিয়া
হয়ত সে বেঁচে আছে বিহঙ্গিনী প্রিয়া
কিন্তু মৃত্যু মোর সুখে সাধিয়াছে বাদ !
সুখ, দুখ, চিন্তা, আশা যা কিছু অতীত—
তাই নিয়ে আমি শুধ্ গাইতেছি গীত !

—।।—

সুকোমল ম্লানভাব কপোলে তাহার—
ঢাকিল সে হাসি তার ক্ষুদ্র মেঘ যথা —
প্রেম হেন উথলিল হৃদয়ে আমার
আঁখি কৈল প্রাণপণ কহিবারে কথা !
তখন জানিনু আমি স্বরগ-আলয়ে
কি করিয়া কথা হয় আত্মায় আত্মায়
উজলি উঠিল তার দয়া দিক-চয়ে
আমি ছাড়া আর কেহ দেখে নি গো তায় ।

*   *   *   *

সবিষাদে অবনত নয়ন তাহার—
নীরবে আমারে যেন কহিল সে এসে—
"কে গো হায় বিশ্বাসী এ বন্ধুরে আমার—
লইয়া যেতেছে ডাকি এত দূর দেশে ?"

—।।—

স্তব্ধ সন্ধ্যাকালে যবে পশ্চিম-আকাশে
রবি অস্তাচল গামী পড়িছে ঢলিয়া
বৃদ্ধ যাত্রী কোন এক অজ্ঞাত প্রবাসে
শ্রান্ত পদক্ষেপে একা যেতেছে চলিয়া—
তবু যবে ফুরাইয়া যাবে শ্রম তার
তখন গভীর ঘুমে মজিয়া বিজনে
ভূলে যাবে দিবসের বিষাদের ভার
যত ক্লেশ সহিয়াছে সুদূর ভ্রমণে !
কিন্তু হায় প্রভাতের কিরণের সনে
যে জ্বালা জাগিয়া উঠে হৃদয়ে আমার
রবি যবে ঢলি পড়ে পশ্চিম গগনে
দ্বিগুণ বিঁধিয়া হৃদি করে ছারখার !

—॥—

প্রজ্জ্বলন্ত রথচক্র নিম্নপানে যবে
লোয়ে যান সূর্য্যদেব—অসহায় ভবে ··

··· ··· ···

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 10/৫খ]

দেয় উপত্যকা পরে বিস্তারিত করি
তখন কৃষক হল লোয়ে স্কন্ধোপরি—
ধরি কোন গ্রাম্য-গীতি অশিক্ষিত-স্বরে
চিন্তা ঢালি দেয় তার বন্য-বায়ু পরে ।

* * * *

চিরকাল সুখে তারা করুক্ যাপন ।
আমার আঁধার দিনে হর্ষের কিরণ—
এক তিল আমারে গো দেয়নি আরাম
এক মুহূর্ত্তের তরে দেয়নি বিরাম—

যে গ্রহ উঠিয়া কেন উজলে বিমান
আমার যে দশা তাহা রহিল সমান !

—॥—

দগ্ধ হোয়ে মর্ম্মভেদী মর্ম্ম-যন্ত্রণায়—
এ বিলাপ করিতেছি, দেখিতেছি হায়—
অতি ধীর পদক্ষেপে স্বাধীনতা সুখে
হল-যুগ-মুক্ত বৃষ ধায় গৃহমুখে ।
আমি কি হবনা মুক্ত এ বিষাদ হোতে ?
বিরাম পাবেনা আঁখি অশ্রু-জলস্রোতে ?
তার সেই মুখপানে চাহিল যখন
কি খুঁজিতেছিল মোর নয়ন তখন ?
একদৃষ্টে চাহিলাম সে স্বর্গীয় মুখে
মুদ্রিত হইয়া গেল সৌন্দর্য্য এ বুকে
কিছুতে সে মুছিবেনা, যতদিনে আসি
মৃত্যু এই জীর্ণ দেহ না ফেলে বিনাশি !

—॥—

বিমল-বাহিনী ওগো তরুণ-তটিনী
উজ্জল[১] তরঙ্গে তব ললনা আমার—
অনুরাগী এ মর্ম্মের এক মাত্র দেবী—
তাঁহার সৌন্দর্য্য যত কোরেছেন দান—
শুনগো পাদপ তুমি—তব দেহ পরে
ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন সে দেবী—
নত হোয়ে পোড়েছিল ফুল পত্রগুলি
বসনের তলে, বক্ষ সুবিমল তার
স্পর্শ কোরেছিলে তব মিষ্ট আলিঙ্গনে !
তুমি বায়ু সেইখানে বহিতেছ সদা
যেইখানে প্রেম আসি দেখাইলা মোরে
প্রিয়ার নয়নে শোভে ভাণ্ডার তাঁহার !

শুন গো তোমরা সবে আর এক বার
এই ভগ্ন-হৃদয়ের শেষ দুঃখ-গান !

—॥—

অবশ্য ফলিবে যদি ভাগ্যের লিখন
অবশ্যই অবশেষে প্রেম যদি মোর
অশ্রুময় আঁখিরেই করে গো মুদ্রিত
ভ্রমিবে যখন আত্মা স্বদেশ-আকাশে[৩.৩]

... ...

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 1।/৬ক]

[দাও গো] বিদায় এবে যাই নিজ ধামে—
এতকাল আছিলাম তোমাদের গ্রামে
[আর] কি কহিব বল মনে রেখো মোরে—
আর না ভ্রমিতে হবে সংসারের ঘোরে—
[বল] সবে রাম-কৃষ্ণ বিঠ্ঠলের নাম—
বৈকুণ্ঠে, পৃথিবী ছাড়ি যায় তুকারাম ।

—॥—

বাহিরে ও ঘরে মোর আছ যারা যারা—
এই আশীর্ব্বাদ—সুখে থাকগো তোমরা—
গুরু পূজ্যলোক মোর রয়েছেন যত—
প্রণতি তাঁদের মোর জানাইবে শত ।
মধু অন্বেষণ-তরে অলি যায় উড়ে—
বস্ত্র ছিন্ন হোলে পরে আর কি সে যুড়ে ?
নদী যবে একবার সাগরেতে মিশে—
তার সেই স্রোত আর ফিরাইবে কিসে ?
এই সব কথাগুলি মনে জেনো সার—
এই যে চলিল তুকা ফিরিবেনা আর !

—॥—

তুকার পরীক্ষা শেষ হয়—
তিন লোকে লাগিল বিস্ময়[৬.১]
প্রত্যহ দেবতা গুণগান
ইথে তার কেটে গেছে প্রাণ।
তুকা বসি আছে স্বর্গরথে—
দেবগণ দেখে স্বর্গ হোতে
বিধি—তিনি ভক্তি শুধু চান—
তুকারে বৈকুণ্ঠে লয়ে যান।

—॥—

ধরায় পাণ্ডুরি আছে লোকেদের তরে—
আমি চলিলাম কিন্তু বৈকুণ্ঠের পরে
যাহা কিছু কর সবে—ইহা জেনো সার—
বৈকুণ্ঠের সেই পথ খুঁজে পাওয়া ভার
আমি গেলে কাঁদিবে সকলে উচ্চরবে—
কিন্তু আর ফিরিবনা মনে জেনো সবে
আমার যে পথ বড় সহজ সে নয়—
দুর্গম সে পথ অতি জানিও নিশ্চয়।

—॥—

বন্ধুগণ শুন—রামনাম কর সবে—
তিনি ছাড়া সত্য বল—কি আছে এ ভবে।
"গ্রামের রত্ন যে ছিল, সে ছাড়িল দেহ—
মোদের সে বার্ত্তা তবু জানালে না কেহ।"
পাছে এই কথা বল ভয় করি তাই—
পৃথ্বি ছাড়িবার আগে জানাইনু ভাই।
লইয়া ধ্বজার বোঝা, করি ভেরী রব—
পাণ্ডুরীপুরেতে[৬.২] যায় হরিভক্ত সব

—॥—

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 12/৬খ]

"হেথা কেন আসে লোকগুলা,
তাদের কি কাজ নেই হা[তে]
তুকা কহে "ঈশ্বরের তরে,
পৃথিবী মিলেছে মোর সা[থে]
দুচারিটা ভাল বাক্যে,
তাতে কি বা ক্ষতি বৃদ্ধি আ[ছে]
কোথাও যায় না যারা,
ভালবেসে আসে মোর কাছে
এও সে বাসেনা ভাল,
ভাগ্য কি বা আছে এর বাড়া
সকল লোকের পাছে
কুকুরের মত করে তাড়া

—॥—

শুন দেব, এ মনের বাসনা নিচয়,
জীবনো৮.৩ সঁপিতে আমি নাহি করি ভয়,
সকলি কোরেছি ত্যাগ, তোমারেই চাই,
সংশয় আশঙ্কা ভয় আর কিছু নাই !
হে অনন্ত দেব ! মোর, আছিল সম্বন্ধ ডোর,
তব সাথে বহু পূর্ব্বে যাহা,
মিলি যত সাধুগণ, আমাদের সে বাঁধন,
দৃঢ়তর করিলেন আহা !
আর কিছু নাই, শুধু ভক্তি ও জীবন,
যা আছে তোমারি পদে করেছি অর্পণ,
সাধুগণ সঁপিয়াছে, আমারে তোমারি কাছে,
আমি কভু ছাড়িবনা ও তব চরণ,
তুমিই করগো মোর লজ্জা নিবারণ

—॥—

নামদেব পাণ্ডুরঙ্গে লোয়ে সঙ্গে কোরে,
একদা দিলেন দেখা স্বপ্নে তিনি মোরে।
আদেশ করিলা মোরে কবিতা রচনে,
মিছা দিন না যাপিয়া প্রলাপ-বচনে।
ছন্দ কহি দিলা মোরে, আদেশিলা পিছু,
বিঠলেরে লক্ষ্য কোরো লিখিবে যা কিছু!
কহিলেন পিঠ মোর চাপড়িয়া হাতে,
একশত কোটি শ্লোক হইবে পূরাতে।

—॥—

যদি মোরে স্থান দাও তব পদছায়,
দিবানিশি সাধুসঙ্গে রহিব সেথায়!
যাহা ভালবাসিতাম ছেড়েছি সকল,
তুমি মোরে ছাড়িওনা শুন গো বিঠ্ঠল!
চরণের এক পাশে দেহ যদি স্থান,
শান্তিসুখে কাটাইব এ মম পরাণ।
নামদেবে, মোর কাছে পাঠালে, স্বপনে,
এই অনুগ্রহ তব গাঁথা রোল মনে।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 17/৯ক][৯.১]

... ...

"গেছে সে আপদ গেছে,
ঘরেতে থাকিবে তবু রুটি,
যাহোক্ তাহোক্ করে,
পেট ভোরে খেতে পাব দুটি।
বোকে বোকে দিনু এলে,
জ্বালাতন হনু হাড়ে মাসে,
তুকা বলে "যদিও সে

দিবানিশি কত কটু ভাষে,
তুকারে তুকার স্ত্রী,
মনে মনে তবু ভালবাসে।”

—॥—

ঘরে আর আসেনা সে
কোন পরিশ্রম নাহি কোরে
নিজে নাকি খেতে পায়
রোজ ২ সুখে পেট ভোরে।
না উঠিতে শয্যা হোতে,
মিলি দলবলগুলা সাথে
করতাল বাজাইতে,
আরম্ভ করেন অতি প্রাতে।
খেয়েছে লজ্জার মাথা,
জ্যান্তে তারা মড়ার মতন,
ঘরে আছে ছেলেপিলে,
তাদের ত না করে যতন।
স্ত্রী তাদের পোড়ে আছে—
হতভাগী লজ্জা দুঃখ ভরে
অভিশাপ দিতে দিতে
মাথায় পাথর ভেঙ্গে মরে।
“ভাগ্যে যাহা আছে তাহা,”
তুকা বলে “থাক সহ্য কোরে।”

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা ১৪/৯খ][১.২]

... ...

ঘরে অন্ন নেই বলে,
বল দেখি যাই কার দ্বার?
পোড়া সংসারের তরে,
কত জ্বালা সহি বল আর?

ক্ষুধা ক্ষুধা করে রাতদিন,
ছেলেগুলো খেলে যে আমায় !
মরণ তাদের হয়,
সকল বালাই ঘুচে যায় !
সকলি ঝেঁটিয়ে নিয়ে যান,
তিলমাত্র ঘরে থাকা ভার,
ঘরে যে গোবর দেব,
একটিও গরু নেই তার !
তুকা বলে "দূর পোড়ামুখী,
আপনি মাথায় নিলি ভার,
এখন তাহার তরে,
কাঁদিলে কি হবে বল আর ।"

—॥—

বোধ হয় এ পাষণ্ড
পূর্ব্ব জন্মে ছিল মোর অরি,
এ জনমে স্বামী হোয়ে,
বৈর সাধিতেছে এত করি ।
কত জ্বালা সব বল আর,
কত ভিক্ষা মাগি পর দ্বারে,
বিঠোবার মুখে ছাই—
কি ভাল কোল্লেন এ সংসারে ?
তুকা বলে "স্ত্রী আমার,
রাগিয়া কতই কটুভাষে,
কভু বা কাঁদিয়া মরে,
কভু বা আপন মনে হাসে ।"

—॥—

ঘরে দুটা অন্ন এলে,
ছেলেদের দেব কোথা খেতে,

হতভাগা তা দেবেনা,
সকলি পরেরে যান দিতে।
তুকা বলে, "অতিথিরে,
যখনি গো দিতে যাই ভাত,
রাক্ষসীর মত এসে,
হতভাগী ধরে মোর হাত,
না জানি যে পূর্ব্বজন্মে,
কতই করিয়াছিলি পাপ
তুকা বলে এ জনমে,
তাই এত পেতেছিস্ তাপ।[৯.৩]

—॥—

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 15/৮ক][৮.১]

বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার
চাহিয়া দেখিল চারি ধার ;
সৌন্দর্য্যের বিন্দু সেই মালতীর চোখে
সহসা জগত প্রকাশিল,
প্রভাত সহসা বিভাসিল
বসন্ত লাবণ্যে সাজি গো,
একি হর্ষ—হর্ষ আজি গো !
উষারাণী দাঁড়াইয়া শিয়রে তাহার
দেখিছে ফুলের ঘুম-ভাঙ্গা,
হরষে কপোল তাঁর রাঙ্গা।
কুসুম ভগিনী-গণ চারি দিক হ'তে
আগ্রহে র'য়েছে তারা চেয়ে,
কখন ফুটিবে চোক ছোট বোনটির
জাগিবে সে কাননের মেয়ে।
আকাশ সুনীল আজি কিবা !

অরুণ-নয়নে হাস্য-বিভা !
বিমল শিশির-ধৌত তনু
হাসিছে কুসুম-রাজি গো
একি হর্ষ—হর্ষ আজি গো !
মধুকর গান গেয়ে বলে
"মধু কই মধু দাও দাও !"
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে
ফুল বলে "এই লও লও"

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 16/৮খ]

বায়ু আসি কহে কাণে ২
"ফুল বালা পরিমল দাও"
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল
"যাহা আছে সব ল'য়ে যাও !"
হরষ ধরেনা তা'র চিতে
আপনারে চায় বিলাইতে ।
বালিকা আনন্দে কুটি কুটি
পাতায় পাতায় পড়ে লুটি ।
নূতন জগত দেখি রে
আজিকে হরষ এ কি রে !

—॥—

তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল,
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার
চাহিয়া দেখিল চারি ধার !
শুষ্ক তৃণরাশি মাঝে একেলা পড়িয়া
চারিদিকে কেহ নাই আর ঃ
নিরদয় অসীম সংসার !

কে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধরে
এক বিন্দু শিশিরের কণা ?
কেহ না, কেহ না !
মধুকর কাছে এসে বলে,
"মধু কই, মধু চাই চাই !"
সবিষাদ নিঃশ্বাস ফেলিয়া
ফুল বলে "কিছু নাই নাই !"
কথাটি না ক'য়ে ধীরে ধীরে
মধুকর গেল অন্য ঠাঁই ।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 13/৭ ক]

"ফুলবালা পরিমল দাও"
বায়ু আসি কহিতেছে কাছে
মলিন বদন ফিরাইয়া
ফুল বলে "আর কি বা আছে ?"
কথাটি না ক'য়ে সমীরণ
চ'লে গেল দূর দূর বন !
মধ্যাহ্ন[৭.১] কিরণ চারিদিকে
খর-দৃষ্টে চেয়ে অনিমিখে !
ফুলটির মৃদু-প্রাণ হায়
ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায় !

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 14/৭খ]

দেখি দেখি মুখানি,
দেখি দেখি দেখি মানিনী লো
দেখি দেখি কচি হাসি মুখানি তোলো ।

বল বল দেখি লো,
নিরদয় লাজ তোর টুটিবে কি লো ?

চেয়ে আছি ললনা,
মুখানি তুলিবি কি লো ?
ঘোমটা খুলিবি কি লো ?
আধ ফুটো অধরে
হাসি ফুটিবে কি লো ?
তৃষিত মনের আশা পূরাবি কি লো,
তবে, ঘোমটা খোল', মুখটি তোল',
আঁখি মেল লো !

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 27/১৫ক]

সরমের মেঘে ঢাকা বিধু-মুখানি
মেঘ টুটে জ্যোৎস্না ফুটে উঠিবে কি লো

—॥—

বেলওয়ার।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 19/১০ক]

[গে]ল ২ নিয়ে গেল—এ প্রণয় স্রোতে—
যাবনা ২ করি—ভাসায়ে দিলাম তরী—
উপায় নাইক আর এ তরঙ্গ হোতে !
দাঁড়াতে পাইনে স্থান—ফিরিতে না পারে প্রাণ—
বায়ুবেগে চলিয়াছি সাগরের পথে !
জানিনু না শুনিনু না কিছু না ভাবিনু—
অন্ধ হোয়ে একেবারে তাহে ঝাঁপ দিনু—
এত দূরে ভেসে এসে—ভ্রম গো বুঝেছি শেষে
এখন ফিরিতে কেন হয় গো বাসনা ?
আগে ভাগে অভাগিনী কেন ভাবিলি না ?
এখন যে দিকে চাই, কূলের উদ্দেশ নাই—
সম্মুখে আসিছে রাত্রি—আঁধার করিছে ঘোর—

স্রোত-প্রতিকূলে যেতে—বল যে নাহি এ চিতে—
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হোয়েছে হৃদয় মোর !—

—॥—

হায় বিধি এ কপালে এই কি আছিল শেষে ?
ভালবাসা পাইনু না মানুষেরে ভালবেসে ?
কোথা ভেবেছিনু মনে—এক সাথে দুই জনে
দিন রাত্রি গাব শুধু—প্রণয়ের সুখ-গান
ভুলিব স্বর্গের মায়া—নন্দন-কানন-ছায়া—
প্রেমে ২ স্তরে ২ ডুবায়ে রাখিব প্রাণ !—
আর কেহ দেখিবে না—আর কেহ জানিবে না
আর কিছু জানিব না কিছু শুনিব না আন
প্রেম ২ প্রেম শুধু—দিবারাত্রি প্রেম শুধু
প্রেম হবে আমাদের মনের আহার পান !
সায়াহ্ন ১০.১ আসিবে ধীরে—যাব দোঁহে সিন্ধুতীরে
রজত-বালুকা পরে বসিব গো গলে ২
সখার বিশাল-বুকে—মুখটি রাখিব সুখে
ভাঙ্গিয়া পড়িবে ঊর্মি সুধীরে চরণ তলে !
সন্ধ্যার আঁধার ছায়ে বিজন প্রেমিক দুটি
কহিবে মরম কথা শরমের বাঁধ টুটি—

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 19/১০খ]

কাছে থাকি, দূরে থাকি, দেখ আর নাই দেখ,
শুধু স্নেহ দাও !
স্নেহ ক'রে ভাল থাক', স্নেহ দিতে ভালবাস'
কিছু নাহি চাও !
দূরে থেকে কাছে থাক', আপনি হৃদয় তাহা
জানিবারে পায় ।

সুদূর প্রবাস হ'তে স্নেহের বাতাস এসে
লাগে যেন গায়!
এত আছে, এত দাও, কথাটি নাহিক কও,
—স্নেহ-পারাবার,—
প্রভাত শিশির সম নীরবে ঝরিছে সুধা
প্রাণের মাঝার।
তব স্নেহ প্রাণে মম নীরবে ভাসিয়া আসে
সৌরভের প্রায়,
উষার কিরণ সম নীরবে বিমল হাসি
প্রাণেরে জাগায়!

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 19A/১১ক]

ভ্রমরে ডাকিত হাসিতে হাসিতে
কাছে এলে তারে দিত না বসিতে
সহসা আজ সে হৃদয় আমার
কোথায় হারিয়েছি!
এখনো যদি গো খুঁজিয়া পাই
এখনো তাহারে কুড়ায়ে আনি
এখনো তাহারে দলে নাই কেহ
আমার সাধের কুসুম খানি
এখনো স্বজনি একটি পাপড়ি
ঝরেনি তাহার জানি লো জানি
শুধু হারায়েছে খুঁজিয়া পাইলে
এখনো তাহারে কুড়ায়ে আনি—

ত্বরা কর্ তবে ত্বরা কর্ সখি—
হৃদয় খুঁজিতে যাই

শুকাবার আগে ছিঁড়িবার আগে
হৃদয় আমার চাই!

—॥—

এস মন! এস, তোমাতে আমাতে
মিটাই বিবাদ যত—
আপনার হোয়ে কেন মোরা দোঁহে
রহি গো পরের মত!
আমি যাই এক দিকে মন মোর!
তুমি যাও আর দিকে
যার কাছ হোতে ফিরাই নয়ন ,
তুমি চাও তার দিকে!
তার চেয়ে এস দুজনে মিলিয়ে
হাত ধোরে যাই এক পথ দিয়ে—
আমারে ছাড়িয়ে অন্য কোন খানে১১.১
. . . .

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 20/১১খ]

পারি না কি মোরা দুজনে থাকিতে?
দোঁহে হেসে খেলে কাল কাটাইতে?
তবে কেন তুই না শুনে বারণ
যাস্‌রে পরের দ্বার?
তুমি আমি মোরা থাকিতে দুজন
বল্‌ দেখি হৃদি কি বা প্রয়োজন
অন্য সহচরে আর?
এত কেন সাধ বল দেখি মন
পর ঘরে যেতে যখন তখন—
সেথা কিরে তুই আদর পাস্‌?

বল্ ত কত না সহিস্ যাতনা—
দিবানিশি কত সহিস্ লাঞ্ছনা
তবু কি রে তোর মেটেনি আশ ?
আয় ফিরে আয়! মন! ফিরে আয়—
দোঁহে এক সাথে করিব বাস!
অনাদর আর হবে না সহিতে
দিবস রজনী পাষাণ বহিতে
মরমে দহিতে মুখে না কহিতে
ফেলিতে দুখের শ্বাস!
শুনিলিনে কথা—আসিলিনে হেথা
ফিরিলিনে একবার ?
সখি লো দুরন্ত হৃদয়ের সাথে
পেরে উঠিনে তো আর!
"নয় রে সুখের খেলা ভালবাসা"
কত বুঝালেম তায়—
হেরিয়া চিকণ সোনার শিকল
খেলাইতে যায় হৃদয় পাগল
খেলাতে ২ না জেনে না শুনে[১১.২]
... ...

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 21/১২ক]

বাহিরিতে চায় বাহিরিতে নারে
করে শেষে হায় হায়!
শিকল ছিঁড়িয়া এসেছে ক'বার
আবার কেন রে যায় ?
চরণে শিকল বাঁধিয়া কাঁদিতে
না জানি কি সুখ পায় ?

তিলেক রহেনা আমার কাছেতে
যতই কাঁদিয়া মরি
এমন দুরন্ত হৃদয় লইয়া
স্বজনি, বল্ কি করি ?

—॥—

বায়ু! বায়ু! কি দেখিতে আসিয়াছ হেথা ?
কৌতুকে আকুল ?
আমি একটি জুঁই ফুল !
সারারাত এ মাথায় পোড়েছে শিশির
গনেছি কেবল—
প্রভাতে বড়ই শ্রান্ত, ক্লান্ত, হে সমীর !
অতি হীন-বল !
ভাঙ্গা বৃন্তে ভর করি রোয়েছি জীবন ধরি
জীবনে উদাস—
ওগো উষার বাতাস !
শ্রান্ত মাথা পড়ে নুয়ে চাহিয়া রয়েছে ভুঁয়ে
মর' মর' একটি জুঁই ফুল !
ছুঁয়োনা ২ এরে—এখনি পড়িবে ঝোরে
সুকুমার একটি জুঁই ফুল—
ও ফুল গোলাপ নয়—সুষমা সুরভিময়
নহে চাঁপা নহে গো বকুল
ও নহে গো মৃণালিনী তপনের আদরিণী
ও শুধু একটি জুঁই ফুল !

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 22/১২খ]

ওরে আসিয়াছ দিতে কি সংবাদ হায় ?
হে প্রভাত বায়—?

প্রভাতে নলিনী আজি হাসিছে সরসে ?
হাস্থক্ সরসে !
শিশিরে গোলাপগুলি কাঁদিছে হরষে ?
কাঁদুক্ হরষে !

ও এখনি বৃন্ত হোতে কঠিন মাটিতে
পড়িবে ঝরিয়া
শান্তিতে মরে গো যেন মরিবার কালে
যাও গো সরিয়া !

ওরে কি শুধাতে আছে প্রেমের বারতা
মর' মর' যবে ?
এক্‌টি কহেনি কথা অনেক সহেছে—
মরমে ২ কীট অনেক বহেছে
আজ মরিবার কালে শুধাইছ কেন ?
কথা নাহি কবে !

ও যখন মাটি পরে পড়িবে ঝরিয়া
ওরে লোয়ে খেলাস্‌নে তুই
উড়ায়ে যাস্‌নে লোয়ে হেথা হোতে হেথা
ক্ষুদ্র এক যুঁই—

যেখানে খসিয়া পড়ে, সেথা যেন থাকে পোড়ে
ঢেকে দিস্ শুকানো পাতায় !
ক্ষুদ্র জুঁই ছিল কি না কেহইত জানিত না
মরিলেও জানিবেনা তায় !

কাননে হাসিত চাঁপা হাসিত গোলাপ
আমি যবে মরিতাম কাঁদি
আজো হাসিবেক তারা শাখায় ২
ভুজে ভুজ বাঁধি

সে অজস্র হাসি মাঝে সে হরষ রাশি মাঝে
ক্ষুদ্র এই বিষাদের হইবে সমাধি !

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 2২/১৩ক]

[ভ]য়ে তাহাদের হৃদি হইল আকুল—
মৃত্যু হেরি সমুদ্র করিল আর্ত্তনাদ !
পর্ব্বত-শিখর রক্তে হইল রঞ্জিত—
সিন্ধু রক্তময় ফেন করিল উদ্গার !

উঠিল মৃত্যু-আঁধার—গর্জ্জিল তরঙ্গ,
পলালো ইজিপ্টগণ ভয়ে কম্পান্বিত !
ধাইয়া তাদের পানে লুটায়ে পড়িল
সমুদ্র-তরঙ্গ-রাশি মেঘের মতন—
গৃহে আর কাহারেও হলনা ফিরিতে !
যেথা যায় সেখানেই উন্মত্ত জলধি—
বিনষ্ট হইয়া গেল বল তাহাদের
উঠিল ঝটিকা ঘোর আকাশ ব্যাপিয়া—
শত্রুদল করিল সে দারুণ চিৎকার
মুমূর্ষুর স্বরে বায়ু হোল ঘনীভূত।

কেন বা সেবিব তাঁরে প্রসাদের তরে ?
কেন তাঁর কাছে হব দাসত্বে বিনত ?
তাঁর মত আমিও ত বিধি হোতে পারি !
তবে—শুন—শুন সবে বীর সঙ্গীগণ—
তোমরা সকলে মোর কর সহায়তা—
তা হোলে এ যুদ্ধে মোরা লভিব বিজয় !
সুবিখ্যাত, সুদৃঢ়-প্রকৃতি বীরগণ—

আমারেই রাজা বোলে কোরেছে গ্রহণ
সুযুক্তি দিবার যোগ্য ইহারাই সবে—
যুঝিব ঈশ্বর সাথে ইহাদেরি লোয়ে !
ইহাদেরি রাজা হোয়ে শাসিব এ দেশ
তবে কি কারণে হব তাঁহার অধীন ?
কখনো—কখনো তাঁর হইব না দাস !

—॥—

উচ্চ স্বর্গধামে মোরে করিলেন দান,
ঈশ্বর যে সুখভূমি, সে স্থানের সাথে
এ সঙ্কীর্ণ আবাসের কি ঘোর প্রভেদ !
যদি কিছুক্ষণ তরে পাই গো ক্ষমতা—
এক শীত ঋতু তরে—হই মুক্ত যদি—
তাহা হোলে সঙ্গীগণ লোয়ে—কিন্তু হায়
চারিদিকে রহিয়াছে লৌহের বাঁধন !
এই ঘোর নরকের দৃঢ়-মুষ্টি মাঝে
কি দারুণ রূপে আমি রোয়েছি আবদ্ধ !
উর্দ্ধে ১০.১ নিম্নে জ্বলিতেছে বিশাল অনল—
এমন জঘন্য দৃশ্য দেখিনি কখনো !
চির প্রজ্জ্বলিত ১০.২ অগ্নি নিভেনা কিছুতে !

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 24/১৩খ]

দেখে যা ২ ২ লো তোরা সাধের কাননে মোর—
(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া
মলয় বহিছে হরষে ছুটিয়া রে—
(সেথা) জ্যোছনা ফুটে
তটিনী লুটে
প্রমোদে কানন ভোর !

এস এস সখা এস গো হেথা
দুজনে কহিব মনের কথা
তুলিব কুসুম দুজনে মিলিরে
(সুখে) গাঁথিব মালা
গণিব তারা
করিব রজনী ভোর !
এ কাননে বসি গাহিব গান
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ—
খেলিব দুজনে মনের খেলা রে
(মোদের) রহিবে প্রাণে
দিবস নিশি
আধ আধ ঘুম ঘোর !

—॥—

গহির নীদমে অবশ শ্যাম মম
অধরে বিকশত হাস—
মধুর বদনমে মধুর ভাব অতি
কয়্স পায় পরকাশ !
চুম্বনু শত শত—চন্দ্র বদনরে—
তবহুঁ ন পূরল আশ :
অতি ধীরে ময় হৃদয় রাখনু
তবহুঁ ন মিটল তিয়াষ !
শ্যাম সুখে তুঁহু—নীদ যাও পহু—
মম এ প্রেমময় উরষে—
অনিমিখ নয়নে সারা রজনী
হেরব মুখ তব হরষে
শ্যাম ! মুখে তব—মধুর অধরমে
হাসি বিকাশত কায়—

কোন্ স্বপন অব দেখত মাধব
কহবে কোন্ হমায় ?
এ সুখ-স্বপনে ময়ক কি দেখত,
হরষে বিকশত হাসি ?
শ্যাম—শ্যাম মম—কয়সে শোধব
তুঁহুক প্রেমঋণ রাশি !'

জনম ২ মম প্রাণ পূর্ণ করি
থাক' হৃদয় করি আলা—
তুঁহুক পাশ রহি—হাসত হাসত
সহব সকল দুখ জ্বালা !
বিহঙ্গ কাহ তু বোলন লাগলি ?
শ্যাম ঘুমায় হমারা !
রহ—রহ চন্দ্রম, ঢাল ঢাল তব
শীতল জোছন ধারা !
তারা-মালিনী মধুরা যামিনী
ন যাও—ন যাও বালা
নিরদয় রবি অব কাহতু আয়লি ?
সঁপিতে বিরহক জ্বালা !
হমার সারা জীবন জনি কভু
রজনী রহত সমান
হেরই হেরই শ্যাম মুখচ্ছবি
প্রাণ ভইত অবসান ।
ভানু কহত অব—"রবি অতি নিষ্ঠুর
নলিন-মিলন অভিলাষে—
কত শত নারী···মিলন টুটাওত[১০.৩]
··· ··· ···

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 25/১৪ক]

মরণের কঠোরতা···হ্রাস
যদি এই প্রিয় আশা, সেই ভয়ানক
অনন্তের পথ করে পুষ্প-বিকীরিত!
এই কাননের মত সুশীতল ছায়া
কোথা আছে পৃথিবীতে, শ্রান্ত-আত্মা যেথা
এক মুহূর্ত্তের তরে করিবে বিশ্রাম!
নাইক এমন স্তব্ধ হরিত কবর
যেখানে আমার এই পরিশ্রান্ত দেহ
ঘুমাইবে পৃথিবীর দুখ শোক ভুলি!

—॥—

বোধ হয় একদিন সে মোর ললনা
স্বর্গীয় সুন্দর সেই—নিষ্ঠুর দয়ালু—
একদিন এইখানে আসিবে কি ভাবি
যেইখানে একদিন মুগ্ধ-নেত্র মোর
তাঁর সে উজ্জ্বল নেত্র দেখিত চাহিয়া—
হয়ত নয়ন তাঁর আপনা আপনি—
খুঁজিয়া খুঁজিয়া মোরে—চারিদিক পানে
আমার কবর সেই পাইবে দেখিতে!
হয়ত গলিবে তার লোমাঞ্চিত মন—
হয়ত একটি তার বিষাদ নিশ্বাস
জাগাইবে মোর পরে স্বর্গের করুণা!

* * * *

এখনো সে মনে পড়ে—যবে পুষ্প-বন
বসন্তের সমীরণে হইয়া বিনত
সুরভি-কুসুম-রাশি করিত বর্ষণ—
তখন রক্তিম-মেঘে হইয়া আবৃত

বসিতেন প্রকৃতির উপহার মাঝে—
কভু বা বসনে তার কভু বা কুন্তলে
প্রকৃতি, কুসুম-গুচ্ছ দিত সাজাইয়া
চারিদিকে তাঁর কভু তটিনী সলিলে
কভু বা তৃণের পরে পড়িত ঝরিয়া
পুষ্প-বন হোতে কত পুষ্প রাশি রাশি—
চারিদিকে তরুলতা কহিত মর্ম্মরি
"প্রেম হেথা করিয়াছে সাম্রাজ্য বিস্তার !"

—॥—

হর্ষময় ভক্তিভরে সায়াহ্ন বিমান
সমুদয় দীপ তার করেছে জ্বলিত
প্রচারিতে দিশে ২ তার যশোগান
পাইয়া যাহার শোভা হোয়েছে শোভিত।

———

সেই পুরাতন বায়ু লাগিতেছে গায়ে,
সেই পুরাতন গিরি স্পর্শিয়া বিমান
কি সৌন্দর্য্য স্রোত ওথা পড়িছে ঝরিয়া
স্বর্গ দিতেছেন ঢালি কি আলোক রাশি—
চরণে হরিত তৃণ উঠে অঙ্কুরিয়া—
শত বর্ণময় ফুল উঠিছে বিকাশি !

———

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 2(/১৪খ]

[ক্ষ]মা কর মোরে সখি শুধায়োনা আর
মরমে লুকানো থাক মরমের ভার !
[সে]-গোপন কথা সখি, সতত লুকায়ে রাখি—
দেবতা-কাহিনী সম পূজি অনিবার
[আ]হা মানুষের কানে, ঢালিতে যে লাগে প্রাণে !
লুকানো থাক্ তা' সখি হৃদয়ে আমার

ভালবাসি,— শুধায়োনা কারে ভালবাসি !
সে নাম কেমনে সখি কহিব প্রকাশি ?
আমি তুচ্ছ হোতে তুচ্ছ, সে নাম যে অতি উচ্চ,
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার !
ক্ষুদ্র ওই কুসুমটি পৃথিবী কাননে,
আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে
দিন ২ পূজা করি শুকায়ে পড়ে সে ঝরি—
আজন্ম নীরব প্রেমে যায় প্রাণ তার !
তেমনি পূজিয়া তারে এ প্রাণ যাইবে হা রে—
তবুও লুকানো রবে এ কথা আমার !

—॥—

তোমারেই করিয়াছি সংসারের ধ্রুবতারা— ১৮.১
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক' পথহারা। ১৪.২
যেথা আমি যাইনাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল এ আঁখিপরে ঢাল গো আলোক-ধারা !
ও মুখানি সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
আঁধার হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমা পারা—
কখনো কুপথে যদি—ভ্রমিতে চায় এ হৃদি—
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা !

—॥—

সখা, এতদিনে জুড়াল' হৃদয়—
পেয়েছি সে সুখ যাহা খুঁজেছি পৃথিবীময়—

—॥—

শুধু যদি বলি সখা ভালবাসি তারে
এ মনের কথা যেন ফুরায় যে না রে—
ভালবাসা ২ সবাইত কয়—
ভালবাসা কথা যেন ছেলেখেলাময়—

প্রতি কাজে প্রতি পলে, সবাই যে কথা বলে—
তাহে যেন মোর প্রেম প্রকাশ না হয় !
মনে হয় যেন সখা এত ভালবাসা ;
কেহ ভালবাসে নাই— কারো মনে আসে নাই
প্রকাশিতে নারে তাহা মানুষের ভাষা !

—॥—

কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের তুয়ার ?
ঢালিতেছ এত সুখ, ভেঙ্গে গেল গেল বুক—
যেন এত সুখ হৃদে ধরেনাকো আর !
তোমার সৌন্দর্য্যভারে—তুর্ব্বল-হৃদয় হা রে
অভিভূত হোয়ে যেন পোড়েছে আমার !
এস হৃদে এস দেবি—আজন্ম তোমারে সেবি—
ঘুচাইব হৃদয়ের যন্ত্রণা-আঁধার !
তোমার চরণে দিব প্রেম উপহার
না যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার—
নাইবা দিলে তা বালা, থাক হৃদি করি আলা
হৃদয়ে থাকুক্ জেগে সৌন্দর্য্য তোমার ।

———

কে আমার সংশয় মিটায় ?
কে বলিয়া দিবে, ভালবাসে কি আমায়
তাঁর প্রতি দৃষ্টি, হাসি, তুলিছে তরঙ্গরাশি
এক মুহূর্ত্তের শান্তি কে দিবে গো হায় ?
পারিনে ২ আর— বহিতে সংশয় ভার
চরণে ধরিয়া তার শুধাইগে গিয়া
হৃদয়ের এ সংশয় দিই মিটাইয়া
কিন্তু এ সংশয় ভালো—পাছে গো সত্যের [আলো]
ভাঙ্গে এ সাধের স্বপ্ন বড় ভয় গণি
পাছে এ আশার মাথে পড়ে গো অশনি

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 28/১৫খ]

সারস্বত সমাজ

—॥—

১২৮৯ শালে শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবারে ২রা তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি ৬ নম্বর ভবনে সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়।

ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সারস্বত সমাজ স্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে সভাপতি মহাশয় এক বক্তৃতা দেন। বঙ্গভাষার সাহায্য করিতে হইলে কি কি কার্য্যে সমাজের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হইবে, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমতঃ বানানের উন্নতিসাধন। বাঙ্গলা বর্ণমালায় অনাবশ্যক অক্ষর আছে কি না এবং শব্দবিশেষ উচ্চারণের জন্য অক্ষরবিশেষ উপযোগী কি না, এই সমাজের সভ্যগণ তাহা আলোচনা করিয়া স্থির করিবেন। কাহারো কাহারো মতে আমাদের বর্ণমালায় স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ নাই, এ তর্কটিও আমাদের সমাজের সমালোচ্য। এতদ্ব্যতীত ঐতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক নাম সকল বাঙ্গলায় কি রূপে বানান করিতে [হইবে তাহা] স্থির করা আবশ্যক। আমাদের সাম্রাজ্ঞীর[১৫.১] নামকে অনেকে "ভিক্‌টো [রিয়া" বানান] করিয়া থাকেন, অথচ ইংরাজি "V" অক্ষরের স্থলে অন্তস্থ "ব" সহজেই···হইতে পারে। ইংরাজী[১৬.১] পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ লইয়া বাঙ্গলায় বিস্তর··· ঘটিয়া থাকে— এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সমাজের কর্ত্তব্য। দৃ[ষ্টান্ত] স্বরূপে উল্লেখ করা যায়—ইংরাজী isthmus শব্দ কেহবা "ডমরু-মধ্য" কেহবা "যোজক" বলিয়া অনুবাদ করেন, উহাদের মধ্যে কোনটাই হয়ত সার্থক হয় নাই।— অতএব এই সকল শব্দ নির্ব্বাচন বা উদ্ভাবন করা সমাজের প্রধান কার্য্য। উপসংহারে সভাপতি কহিলেন— এই সকল, এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য নানাবিধ সমালোচ্য বিষয় সমাজে উপস্থিত হইবে— যদি সভ্যগণ মনের সহিত অধ্যবসায় সহকারে সমাজের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমাজের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

পরে সভাপতি মহাশয় সমাজের নিয়মাবলী পর্য্যালোচনা করিবার জন্য সভায় প্রস্তাব করেন।

স্থির হইল— বিদ্যার উন্নতিসাধন করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য।

তৎপরে তিন চারিটি নামের মধ্য হইতে অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে সভার নাম স্থির হইল সারস্বত সমাজ।

সমাজের দ্বিতীয় নিয়ম নিম্নলিখিত মতে পরিবর্ত্তিত হইল ;—

"যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বাঙ্গলাভাষার উন্নতিসাধনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন।

সমাজের তৃতীয় নিয়ম কাটা হইল।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 29/১৬ক]

[সমাজের] চতুর্থ নিয়ম নিম্নলিখিত মতে রূপান্তরিত হইল—

সমাজের মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যের মধ্যে অধিকাংশের ঐকমত্যে [নূ]তন সভ্য গৃহীত হইবেন। সভ্যগ্রহণ কার্য্যে গোপনে সভাপতিকে মত জ্ঞাত করা হইবেক।

সমাজের চতুর্ব্বিংশ নিয়ম নিম্নলিখিত মতে রূপান্তরিত হইল ;—

সভ্যদিগকে বার্ষিক ৬ টাকা আগামী চাঁদা দিতে হইবেক। যে সভ্য এককালে ১০০ টাকা চাঁদা দিবেন তাঁহাকে ঐ বার্ষিক চাঁদা দিতে হইবেক না।

অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে বর্ত্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমাজের কর্ম্মচারীরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভাপতি ঃ—ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

সহযোগী সভাপতি। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।—শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

—॥—

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 31/১৭ক]

এস আজি সখা বিজন পুলিনে
বলিব মনের কথা ;
মরমের তলে যা কিছু রয়েছে
লুকানো মরম-ব্যথা।

সুচারু রজনী, মেঘের আঁচল
চাপিয়া অধরে হাসিছে শশি,
বিমল জ্যোছনা সলিলে মজিয়া
আঁধার মুছিয়া ফেলেছে নিশি,
কুসুম কাননে বিনত আননে
মুচকিয়া হাসে গোলাপবালা,
বিষাদে মলিনা, শরমে নিলীনা,
সলিলে তুলিছে কমলিনী বধূ
ম্লানরূপে করি সরসী আলা !
আজি, খুলিয়া ফেলিব প্রাণ
আজি, গাইব কত কি গান,
আজি, নীরব নিশীথে, চাঁদের হাসিতে
মিশাব' অফুট তান !
দুই হৃদয়ের যত আছে গান
এক সাথে আজি গাইব,
দুই হৃদয়ের যত আছে কথা
দুইজনে আজি কহিব ;
কতদিন সখা, এমন নিশীথে
এমন পুলিনে বসি,
মানসের গীত গাহিয়া ২
কাটাতে পাইনি নিশি !
স্বপনের মত সেই ছেলেবেলা
সেইদিন সখা মনে কি হয় ?
হৃদয় ছিল গো কবিতা মাখানো
প্রকৃতি আছিল কবিতাময়,
কি সুখে কাটিত পূরণিমা রাত
এই নদীতীরে আসি,

[কু]সুমের মালা গাঁথিয়া ২
গণিয়া তারকা রাশি ।
যমুনা সুমুখে যাইত বহিয়া
সে যে কি সুখের গাইত গান,
ঘুম ঘুম আঁখি আসিত মুদিয়া
বিভল হইয়া যাইত প্রাণ !

[কত] যে সুখের কল্পনা আহা
আঁকিতাম মনে মনে
[সা]রাটি জীবন কাটাইব যেন[১৭.১]
... ...

তখন কি সখা জানিতাম মনে
পৃথিবী কবির নহে
কলপনা যার যতই প্রবল
ততই সে দুখ সহে !

এমন পৃথিবী, শোভার আকর
পাখী হেথা করে গান
কাননে কাননে কুসুম ফুটিয়া
পরিমল করে দান !

আকাশে হেথায় উঠে গো তারকা
উঠে সুধাকর, রবি,
বরণ বরণ জলদ দেখিছে
নদীজলে মুখছবি,
এমন পৃথিবী এও কারাগার
কবির মনের কাছে !
যে দিকে নয়ন ফিরাইতে যায়
সীমায় আটক আছে !

তাই ১৭.২ গো সখা মনে ২ আমি
গোড়েছি একটি বন,
সারাদিন সেথা ফুটে আছে ফুল,
গাইছে বিহগগণ !
আপনার ভাবে হইয়া পাগল
রাতদিন সুখে আছি গো সেথা
বিজন কাননে পাখীর মতন
বিজনে গাইয়া মনের ব্যথা !
কতদিন পরে পেয়েছি তোমারে,
ভূলেছি মরম জ্বালা ;
দুজনে মিলিয়া সুখের কাননে
গাঁথিব কুসুম মালা !
দুজনে মিলিয়া পূরণিমা রাতে
গাইব সুখের গান
যমুনা পুলিনে করিব দুজনে
সুখ নিশা অবসান,
আমার এ মন সঁপিয়া তোমারে
লইব তোমার মন
হৃদয়ের খেলা খেলিয়া খেলিয়া
কাটাইব সারাক্ষণ !
এইরূপে সখা কবিতার কোলে
পোহায়ে যাইবে প্রাণ
সুখের স্বপন দেখিয়া দেখিয়া
গাহিয়া সুখের গান ।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 32/১৭খ]

ঝান্সী রাণী

[ই]ংরাজ গবর্ণমেন্ট ঝান্সীর বিধবা রাণীর রাজ্য হস্তগত করিলেন এবং তাঁহার রাজকোষে যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল তাহাও অপহরণ করিলেন। এইরূপে রাজ্যহীনা সম্পত্তিহীনা তেজস্বিনী রাজ্ঞী এই নিষ্ঠুর অপমানে মনে মনে প্রতিহিংসার অগ্নি পোষণ করিতে লাগিলেন, এবং যেমন শুনিলেন, কম্পানির সৈনিকেরা বিদ্রোহী হইয়াছে অমনি, তাঁহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে সুকুমার দেহ রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। লক্ষ্মীবাইর বয়স বিংশতি বৎসরের কিছু অধিক হইবে, অত্যন্ত সুন্দরী এবং তাঁহার শরীর ও মন সমান বলিষ্ঠ।

ঝান্সীনগরী অত্যন্ত পরিপাটী ছিল ; সরোবর ও বৃহৎ বৃক্ষাবলীর কুঞ্জ মধ্যে স্থাপিত চতুর্দ্দিকে দৃঢ়প্রাচীর। একটি ক্ষুদ্র শৈলের উপর দুর্গবদ্ধ রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। বিদ্রোহের সময় ইংরাজরা সংবাদ পাইলেন যে ঝান্সী-রাজ্ঞি [১৭.৩] র এক ভৃত্য লক্ষ্মণরাও সৈনিকদের বিদ্রোহে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা পাইতেছে এবং স্থানে ২ ঐ নিমিত্ত গুপ্তচর নিয়োজিত হইয়াছে। অবশেষে ঝান্সী-নগরীতে বিদ্রোহ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ক্যাপটেন ডানলপ হত হইলেন। নগরীস্থ ইংরাজেরা ছদ্মবেশে পলাইতে আরম্ভ করিল কিন্তু ধৃত ও হত হইল। ঝান্সীর বিদ্রোহী সৈন্যদের দ্বারা ইংরাজেরা পরাজিত হইলেন এবং লক্ষ্মীবাই তাঁহার পৈত্রিক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন (1859)।

1858— সার হিউ রোস্ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে ঝান্সীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গ্রানিট প্রস্তর নির্ম্মিত, উচ্চ শৈলে স্থাপিত, নগরপ্রাচীরে ব্রিটিস-কামান গোলা বর্ষণ করিল! দুর্গ হইতে স্ত্রীলোকেরা কামান ছুঁড়িতে লাগিল, সৈনিকের খাদ্যাদি বহন করিতে লাগিল। 3১ [১৭.৪] মার্চ রাণী দেখিলেন ইংরাজ শিবির পার্শ্বে তাঁতিয়াটোপী ও বাণপূররাজের সৈন্যদল সঙ্কেত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত [১৭.৫] করিয়াছে, হর্ষধ্বনি ও তোপের শব্দে ঝান্সীদুর্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পরদিন তাঁতিয়াটোপী ইংরাজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু ১৫০০ লোক নিহত রাখিয়া, ১৮ কামান ও অনেক খাদ্যাদি ফেলিয়া রাখিয়া বেটোয়ার পর পারে তাড়িত হইলেন।

যুদ্ধে প্রত্যহ রাণীর ৬০।৭০ জন করিয়া লোক হত হইতে লাগিল। রাণীর ভাল কামানগুলির মুখ বন্ধ করা হইয়াছে এবং তাঁহার ভাল ভাল গোলন্দাজেরা হত হইয়াছে।

নগরপ্রাচীরে একটি গর্ত্ত খোদিত হইল এবং প্রাসাদ ও নগরের প্রধান অং[শ] ইংরাজদের দ্বারা অধিকৃত হইল। প্রাসাদের মধ্যে দারুণ হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিল। রা[ণীর] শরীর রক্ষকের একদল (৪০ জন) অশ্বালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করি[তে] লাগিল, ভূমিশায়ী সৈন্যেরা মুমূর্ষু অবস্থাতেও শত্রুদের [১৭.৬] বিরুদ্ধে অস্ত্র…[চালনা] করিতে লাগিল। একে একে সকলেই নিহত হইলে অবশিষ্ট একজন বারুদে আ[গুন] ধরাইয়া দিল এবং তাঁহার মহত্ত্বের [১৭.৭] ৮৬ দলের অনেকগুলিকে উড়াইয়া দিয়া আপনি উড়িয়া…[সেই] রাত্রেই রাজ্ঞী কতকগুলি অনুচরের সহিত দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। শত্রুরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল এবং প্রায় ধরিয়াছিল। লেপ্টেনেন্ট বাউকর (Bowker)…[১৭.৮]

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 33/১৮ক][১৮.১]

…　　…　　…

দস্যু দস্যু করি ধ্বনি !
শত বীর হৃদি উঠিল নাচিয়া
বাহিরিল শত অসি
শত ২ শর মিটাইল তৃষা
বীরের হৃদয়ে পশি !
আঁধার ক্রমশঃ নিবীড় [১৮.২] হইল
বাধিল বিষম রণ
লীলার শিবিকা কাড়িয়া লইয়া
পলাইল দস্যুগণ !

*　　*　　*　　*

কারাগার মাঝে বসিয়া রমণী
বরষিছে আঁখি জল।

বাহির হইতে উঠিছে গগনে
সমরের কোলাহল !
"হে মা ভগবতী শুন এ মিনতি
রাখ গো মিনতি মোর
দুখিনীর আর কেহ নাই মা গো
তার' এ বিপদে ঘোর !
যদি সতী হই মনে ২ যদি
তাঁহারি চরণ সেবি
পতি বোলে যাঁরে কোরেছি বরণ
বাঁচাও তাঁহারে দেবি !
মোর তরে দেবি এ শোণিত পাত !
আমি মা অবোধ বালা
জনমিয়া আমি মরিনু না কেন
ঘুচিত সকল জ্বালা।
মোর তরে তিনি হারাবেন প্রাণ ?
না—না মা রাখ এ কথা
ছেলেবেলা হোতে অনেক সহেছি
আর মা দিওনা ব্যথা !"
কহিতে ২ উঠিল আকাশে
দ্বিগুণ সমর-ধ্বনি
জয় ২ রব—আহতের স্বর
কৃপাণের ঝনঝনি !
[সাঁ]জের জলদে ডুবে গেল রবি
আকাশে উঠিল তারা
[এ]কেলা বসিয়া বালিকা সে লীলা
কাঁদিয়া হোতেছে সারা !
[সহ]সা খুলিল কারাগার দ্বার
বালিকা সভয় অতি।

নিদারুণ হাসি হাসিতে ২
পশিল বিজয় তথি ! ১৮.৩
... ...
শোণিতে মাখানো বাস
শোণিতে মাখানো মুখের মাঝারে
স্ফুরে নিদারুণ হাস !
অবাক বালিকা, বিজয় তখন
কহিল গভীর রবে
সমর বারতা শুনেছ কুমারী ?
সে কথা শুনিবে তবে ?”
“বুঝেছি—বুঝেছি—জেনেছি ২
বলিতে হবে না আর—
না না—বল—বল—শুনিব সকলি
যাহা আছে বলিবার !
এই বাঁধিলাম পাষাণে হৃদয়
বল কি বলিতে আছে !
যত ভয়ানক হোক্ না সে কথা
লুকায়ো না মোর কাছে ।”
“শুন তবে বলি” কহিল বিজয়
তুলি অসি খরধার
“এই অসি দিয়ে বধি রণধীরে
হরেছি ধরার ভার ।”
“পামর—নিদয়—পাষাণ—পিশাচ”
মূরছি পড়িল লীলা
অলীক বারতা কহিয়া বিজয়
কারা হোতে বাহিরিলা ।
সমরের ধ্বনি থামিল ক্রমশ
নিশা হোল সুগভীর

বিজয়ের সেনা পলাইল রণে
জয়ী হল রণধীর !

*　　*　　*　　*

কারাগার মাঝে পশি রণধীর
কহিল অধীর স্বরে—
"লীলা—রণধীর এসেছে তোমার
এস এ বুকের পরে !"
ভূমিতল হোতে চাহি দেখে লীলা
সহসা চমকি উঠি !
হরষ আলোকে জ্বলিতে লাগিল
লীলার নয়ন দুটি !
"এস নাথ এস অভাগীর পাশে
বোস একবার হেথা—
জনমের মত দেখি ও মুখানি
শুনি ও মধুর কথা !
ডাক নাথ সেই আদরের নামে
ডাক মোরে স্নেহ ভরে—
এ অবশ মাথা তুলে লও সখা
তোমার বুকের পরে।" ১৮.৪

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 34/১৮খ]

...　　...　　...

রহে রণধীর পলকবিহীন
যেন পাগলের পারা !
রণধীর বুকে মুখ লুকাইয়া
গলে বাঁধি বাহুপাশ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল বালিকা
"পূরিল না কোন আশ !

মরিবার সাধ ছিল না আমার
কত ছিল সুখ আশা—
পারিনু না সখা করিবারে ভোগ
তোমার ও ভালবাসা !—
হারে হা পামর কি করিলি তুই
নিদারুণ প্রতারণা—
এত দিনকার—সুখ সাধ মোর
পূরিল না পূরিল না !”
এত বলি ধীরে অবশ বালিকা
কোলে তার মাথা রাখি
রণধীর মুখে রহিল চাহিয়া
মেলিয়া অবাক আঁখি !
রণধীর ক্রমে শুনিল সকল
বিজয়ের প্রতারণা—
বীরের নয়নে উঠিল জ্বলিয়া
রোষের অনল-কণা !
“পৃথিবীর সুখ ফুরালো আমার
বাঁচিবার সাধ নাই !
এর প্রতিশোধ তুলিতে হইবে
বাঁচিয়া রহিব তাই !”
লীলার জীবন আইল ফুরায়ে
মুদিল নয়ন দুটি
কারাগার হোতে রণধীর তবে
বাহিরে আইল ছুটি !
দেখে সেই বিজয়ের মৃতদেহ
পড়িয়া রোয়েছে সমর ভূমে
রণধীর যবে মরিছে জ্বলিয়া
বিজয় ঘুমায় মরণ-ঘুমে !

শত ভাগে তার কাটিয়া শরীর
দলি তারে পদতলে
পাগলের মত পড়িল ঝাঁপায়ে
বিপাশা নদীর জলে !

———

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 35/১৯ক]

[ভবি]ষ্যৎ ক্রমে হইতেছে বর্ত্তমান
বর্ত্তমান ধীরে ধীরে মিশিছে অতীতে।
অস্ত যাইতেছে নিশি আসিছে দিবস,
দিবস নিশার ক্রোড়ে পড়িছে ঘুমায়ে।
এই সময়ের চক্রে ঘুরিয়া নীরবে
পৃথিবীরে—মানুষেরে অলক্ষিত ভাবে
পরিবর্ত্তনের পথে যেতেছে লইয়া
কিন্তু মনে হয় এই হিমাদ্রির বুকে
তাহার চরণ চিহ্ন ১৯.১ পড়িছে না যেন।
কিন্তু মনে হয় যেন আমার হৃদয়ে
দুর্দ্দান্ত ক্ষমতাশালী সময় সেওগো,
নূতন গড়েনি কিছু ভাঙ্গেনি পুরাণো
বাহিরের কত কি যে ভাঙ্গিল চূরিল
বাহিরের কত কি যে হইল নূতন
কিন্তু ভিতরের দিকে চেয়ে দেখ দেখি
আগেও আছিল যাহা এখনো তা আছে
বোধ হয় চিরকাল থাকিবে তাহাই
বরষে বরষে দেহ ভাঙ্গিয়া যেতেছে
কিন্তু মন আছে তবু তেমনি অটল।
নলিনী নাইক বটে পৃথিবীতে আর
নলিনীরে তেমনিই ভালবাসি তবু,—
যখন নলিনী ছিল, তখন যেমন

তার হৃদয়ের মূর্ত্তি ছিল এ হৃদয়ে
এখনো তেমনি তাহা রয়েছে স্থাপিত।
এমন অন্তরে তারে রেখেছি লুকায়ে
মরমের মর্ম্মস্থলে করিতেছি পূজা,
সময় পারে না সেথা কঠিন আঘাতে
ভাঙ্গিবারে এ জনমে সে মোর প্রতিমা,
হৃদয়ের আদরের লুকান সে ধন।
ভেবেছিনু একবার এই যে বিষাদ
নিদারুণ ১১.২ তীব্র স্রোতে বহিছে হৃদয়ে
এ বুঝি হৃদয় মোর ভাঙ্গিবে চূরিবে
পারেনি ভাঙ্গিতে কিন্তু এক তিল তাহা
যেমন আছিল হৃদি তেমনি রোয়েছে।
বিষাদ যুঝিয়াছিল প্রাণপণে বটে
কিন্তু এ হৃদয়ে মোর কি আছে যে বল
এ দারুণ সমরে সে হইয়াছে জয়ী—
গাওগো বিহগ তব প্রমোদের গান
তেমনি হৃদয়ে তার হবে প্রতিধ্বনি,
প্রকৃতি! মাতার মত সুপ্রসন্ন দৃষ্টি
যেমন দেখিয়াছিনু ছেলেবেলা আমি
এখনো তেমনি যেন পেতেছি দেখিতে?
যা কিছু সুন্দর দেবি তাহাই মঙ্গল—
তোমার সুন্দর রাজ্যে হে প্রকৃতি দেবী
[হে]ন অমঙ্গল কভু পারে না ঘটিতে। ১১.৩

… … …

তোমার আশ্বাসবাক্যে হে প্রকৃতি দেবী
সংশয় কখনো আমি করি না স্বপনে
কি সঙ্গীত শিখায়েছ আশারে হে দেবি
সে গীতে হৃদয় মোর হোয়েছে বিলীন!

পৃথিবীতে এক মন থাকে দুই হোয়ে
শরীরের ব্যবধানে, স্বর্গে গিয়া তারা
একত্রে মিলিয়া যায় জেনেছি নিশ্চয়।"
ক্রমে কবি যৌবনের সীমা ছাড়াইয়া
গম্ভীর বার্দ্ধক্যে আসি হোল উপনীত।
সুগম্ভীর বৃদ্ধ কবি, স্কন্ধে আসি তার
পড়েছে ধবল জটা অযত্নে লুটায়ে—
মনে হত দেখিলে সে গম্ভীর মুখশ্রী
হিমাদ্রি হতেও বুঝি সমুচ্চ মহান।
নেত্র তার বিকীরিত কি স্বর্গীয় জ্যোতি—
যেন তার নয়নের শান্ত সে কিরণ
সমস্ত পৃথিবীময় শান্তি বরষিবে।
বিস্তীর্ণ হইয়া গেল কবির সে দৃষ্টি—
দৃষ্টির সম্মুখে তার দিগন্তও যেন
খুলিয়া দিত গো তার অভেদ্য দুয়ার!
যেন কোন দেববালা কবিরে লইয়া
অনন্ত নক্ষত্র লোকে কোরেছে স্থাপিত
সামান্য মানুষ যেথা করিলে গমন
কহিত কাতর স্বরে নয়ন ঢাকিয়া—
"একি রে অনন্ত কাল মরি যে তরাসে—
কোথা ওগো সুরবালা, অনন্ত জগতে
আনিয়া কি খেলা খেল লয়ে ক্ষুদ্র মন
জ্ঞান হোল অবসন্ন, পরান অবশ
কোথায় ঢাকিব দেবি এ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি
কোথায় লুকাব দেবি এ সঙ্কীর্ণ মন।"

*   *   *   *

সন্ধ্যার আঁধারে হোথা বসিয়া বসিয়া
কি গান গাইছে কবি শুনগো কল্পনা!

"কি সুন্দর সাজিয়াছে ওগো হিমালয় !
তোমার বিশালতম শিখরের শিরে—
একটি সন্ধ্যার তারা ! সুনীল গগন
ভেদিয়া তুষার শুভ্র মস্তক তোমার।
সরল পাদপরাজি আঁধার করিয়া
উঠেছে তাহার পরে ; সে ঘোর অটবী
ঘিরিয়া হু হু হু করি তীব্র গাঢ় বায়ু
দিবানিশি ফেলিতেছে বিষণ্ণ নিশ্বাস।
শিখরে শিখরে ক্রমে নিভিয়া আসিল
অস্তমান তপনের আরক্ত কিরণে
প্রদীপ্ত জলদচূর্ণ। শিখরে শিখরে
মলিন হইয়া গেল উজ্জ্বল তুষার,
শিখরে শিখরে ক্রমে নামিয়া আসিল
আঁধারের যবনিকা ধীরে ধীরে ধীরে।
পর্ব্বতের বনে বনে গাঢ়তর হোলো।
ঘুমময় অন্ধকার। গভীর নীরব। ১৯.৪

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 36/১৯খ]

... ...

[সু]গম্ভীর পর্ব্বতের পদতল দিয়া।
কি মহান্ ! কি নীরব ! কি গম্ভীর ভাব !
ধরার সকল হোতে উপরে উঠিয়া
স্বর্গের সীমায় রাখি, ধবল জটায়
জড়িত মস্তক তব ওগো হিমালয়
[নী]রব ভাষায় তুমি কি যেন একটি
গম্ভীর আদেশ ধীরে করিছ প্রচার,
সমস্ত পৃথিবী তাই নীরব হইয়া

শুনিছে অনন্যমনে সভয়ে বিস্ময়ে !
[নী]রব নগর গ্রাম নিস্পন্দ কানন ! [১৯.৫]

... ...

ক্ষুদ্র হোতে ক্ষুদ্র নর আমি শৈলরাজ !
অকূল সমুদ্রে ক্ষুদ্র তৃণটির মত
হারাইয়া দিগ্বিদিক, হারাইয়া পথ,
সভয়ে বিস্ময়ে হোয়ে হতজ্ঞান প্রায়
তোমার চরণতলে রয়েছি পড়িয়া !
ঊর্দ্ধ[১৯.৬] মুখে চেয়ে দেখি ভেদিয়া আঁধার
শূন্যে শূন্যে শত শত উজ্জ্বল তারকা
অনিমিখ নত নেত্র মেলিয়া যেন রে
আমারি মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া !
অযুত তারকাকুল ! শুনগো তোমরা
একদৃষ্টে চাহিও না এমন করিয়া
আমার মুখের পানে লক্ষ নেত্র মেলি !
অন্ধকার ভেদি ওই দৃষ্টি তোমাদের
দেখিলে হৃদয় যায় সঙ্কুচিত হোয়ে
মরমের মর্ম্মস্থল উঠে গো কাঁপিয়া !
ওদিকে সুদূর শৈলে ঝরিছে নির্ঝর
মৃদু ঝর ঝর ধ্বনি পশিছে মরমে,
হে নির্ঝর ! ওকি গান গাইতেছ তুমি ?
ও গান গেওনা আমি করি গো বারণ !
একাকী গভীরতম নীরব নিশীথে
যখনি শুনি গো ওই মৃদু ঝর ঝর ;
হু হু করে উঠে প্রাণ মর্ম্মের মর্ম্মেতে
আকুলিয়া উঠে যেন কি যেন কি ভাব ;
বুকের ভিতরকার কথাগুলি যেন
বাহির হইয়া পড়ে শুনিলে সে ধ্বনি !

ওগো হিমালয়! তুমি কি গম্ভীরভাবে
দাঁড়ায়ে রয়েছ হেথা অচল অটল! ১১.৭

... ...

দেখিছ কালের লীলা করিছ গণনা—
কালচক্র কতবার আইল ফিরিয়া—
সিন্ধুর বেলার বক্ষে গড়ায় যেমন
অযুত তরঙ্গ কিছু লক্ষ্য না করিয়া।
কত কাল আইল রে গেল কতকাল
হিমাদ্রি গিরির ওই বক্ষের উপরি!
মাথার উপর দিয়া কত দিবাকর
উলটি কালের পৃষ্ঠা গিয়াছে চলিয়া
গম্ভীর আঁধারে ঢাকি তোমার ও দেহ
কত রাত্রি আসিয়াছে গিয়াছে পোহায়ে—
কিন্তু বল দেখি ওগো হিমালয় গিরি!
মানুষ সৃষ্টির অতি আরম্ভ হইতে
কি দেখিছ এইখানে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে—
যা দেখিছ—যা দেখেছ তাতে কি এখনো
সর্ব্বাঙ্গ তোমার গিরি উঠেনি শিহরি?
কিদারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে
রক্তপাত—অত্যাচার—ঘোর কোলাহল—
দিতেছে মানবমনে বিষ মিশাইয়া!
কত কোটি কোটি লোক অন্ধ কারাগারে
অধীনতা শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ—কাতর ক্রন্দনে
অবশেষে মন এত হোয়েছে নিস্তেজ
কলঙ্কশৃঙ্খল তার অলঙ্কার রূপে
আলিঙ্গন কোরে তারে রেখেছে গলায়।
দাসত্বের পদধূলি অহঙ্কার কোরে

মাথায় বহন করে পর প্রত্যাশীরা
যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তি ভরে করে গো চুম্বন।
যে হস্ত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল
সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
স্বাধীন সে অধীনেরে দলিবার তরে
অধীন সে স্বাধীনেরে পূজিবারে শুধু
সবল, সে দুর্ব্বলেরে পীড়িতে কেবল
দুর্ব্বল, বলের পদে আত্ম বিসর্জ্জিতে!
স্বাধীনতা কারে বলে জানে যেই জন
কোথায় সে অসহায় অধীন জনের
কঠিন শৃঙ্খল রাশি দিবে গো ভাঙ্গিয়া—
না—তার স্বাধীন হস্ত হোয়েছে কেবল
অধীনের লৌহপাশ দৃঢ় করিবারে।
সবল দুর্ব্বলে কোথা সাহায্য করিবে—
দুর্ব্বলে অধিকতর করিতে দুর্ব্বল
বল তার—হিমালয় দেখিছ কি তাহা?
সামান্য নিজের স্বার্থ করিতে সাধন
কত দেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য!
কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা
রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙ্গিয়া!
তবুও মানুষ বলি গর্ব্ব করে তারা ১৯.৮

... ...

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 37/২০ক]

... ...

শাখায় শাখায় সব করি জড়াজড়ি
কেমন গম্ভীরভাবে রোয়েছে দাঁড়ায়ে।

হেথায় ঝোপের মাঝে প্রচ্ছন্ন আঁধার
হোথা সরসীর বুকে প্রশান্ত জোছনা,
ছুটিয়া চলেছে হেথা শীর্ণ স্রোতস্বিনী
তরঙ্গিল বুকে তার পাদপের ছায়া
ভেঙ্গে চুরে কত শত ধরিছে মূরতি।
এমন নীরব বন নিস্তব্ধ গম্ভীর
শুধু দূর শৃঙ্গ হোতে ঝরিছে নির্ঝর,
শুধু এক পাশ দিয়া সঙ্কুচিত অতি
তটিনীটি সরসরি যেতেছে চলিয়া।
অধীর বসন্তবায়ু মাঝে মাঝে শুধু
ঝরঝরি কাঁপাইছে গাছের পল্লব।
এহেন নিস্তব্ধ রাত্রে কতবার আমি
গম্ভীর অরণ্যমাঝে করেছি ভ্রমণ
স্নিগ্ধরাত্রে গাছপালা ঝিমাইছে যেন
ছায়া তার পোড়ে আছে হেথায় হোথায়।
দেখিয়াছি, নীরবতা যত কথা কয়
প্রাণের ভিতর বাগে, এত কেহ নয়।
দেখি যবে অতি শান্ত জোছনায় মজি
নীরবে সমস্ত ধরা রয়েছে ঘুমায়ে
নীরবে পরশে দেহ বসন্তের বায়
জানিনা সুখে কি দুখে প্রাণের ভিতর
উচ্ছ্বসিয়া উথলিয়া উঠে গো যেমন !
কি যেন হারায়ে গেছে খুঁজিয়া না পাই,
কি কথা ভুলিয়ে যেন গিয়েছি সহসা,
বলা যেন হয় নাই প্রাণের কি কথা,
প্রকাশ করিতে গিয়া পাইনা তা' খুঁজি !
কে আছে এমন যার এহেন নিশীথে
পুরানো সুখের স্মৃতি উঠেনি উথলি।

কে আছে এমন যার জীবনের পথে
এমন একটি সুখ যায়নি হারায়ে[২০.১]

… … …

কতস্থানে আজ রাত্রে নিশীথ…
উঠিছে প্রমোদধ্বনি বিলাসীর…
মুহূর্ত্ত ভাবেনি তারা আজ নিশীথে…
কত হৃদি পুড়িতেছে নীরব অনলে
কত শত হতভাগ্য আজ নিশীথেই
হারায়ে জন্মের মত জীবনের সুখ
মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় হইয়া অধীর
একেলা হা-হাহা করি বেড়ায় ভ্রমিয়া
জোছনায় ঘুমাইছে অরণ্যকুটীর ;
বিষণ্ণ নলিনীবালা শূন্য নেত্র মেলি
চাঁদের মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া

—॥—

পার কি বলিতে কেহ কি হ'ল এ বুকে
যখনি শুনি গো ধীর সঙ্গীতের ধ্বনি
যখনি দেখি গো ধীর প্রশান্ত রজনী
কত কি যে কথা আর কত কি যে ভাব
উচ্ছ্বসিয়া উথলিয়া আলোড়িয়া উঠে !
দূরাগত রাখালের বাঁশরীর মত
আধভোলা কালিকার স্বপ্নের মতন—
কি যে কথা কি যে ভাব ধরি ধরি করি
তবুও কেমন ধারা পারিনা ধরিতে !
কি করি পাইনা খুঁজি পাই না ভাবিয়া,
ইচ্ছা করে ভেঙেচুরে প্রাণের ভিতর
যা' কিছু যুঝিছে হৃদে খুলে ফেলি তাহা

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 38/২০খ]

... ...

দিবানিশি হাসিবারে শিখেছিস তোরা,
সমস্ত প্রকৃতি যবে থাকে গো হাসিতে
সমস্ত জগত যবে গাহে গো সঙ্গীত
তখন ত তোরা নিজ বিজন কুটীরে
[ক্ষু]দ্রতম আপনার মনের বিষাদে
[স]মস্ত জগৎ ভুলি কাঁদিস না বসি,
জগতের, প্রকৃতির ফুল্ল মুখ দেখি
আপনার ক্ষুদ্র দুঃখ থাকে কি গো আর!
ধীরে ধীরে দূর হোতে আসিছে কেমন,
স্তব্ধ নভস্তল ভেদি সরল রাগিণী [২০.২]

... ...

এমনি স্বপনময় এমনি অস্ফুট,
তাই শুনি ধীরে ধীরে পুরাতন স্মৃতি
প্রাণের ভিতরে যেন উথলিয়া উঠে।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 39/২১ক]

[স]ংসারের পথে পথে, মরীচিকা অন্বেষিয়া,
ভ্রমিয়া হয়েছি ক্লান্ত নিদারুণে কোলাহলে,
[তাই] বলি একবার, আমারে ঘুমাতে দাও,
শীতল করিব হৃদি স্নিগ্ধ বিরামের জলে।
শ্রান্ত এ জীবনে মোর, আসুক নিশীথ কাল,
বিস্মৃতি আঁধারে ডুবি ভুলি সব দুখজ্বালা,
নিঃস্বপ্ন নিদ্রার কোলে, ঘুমাতে গিয়াছে সাধ,
মিশাতে সমুদ্রমাঝে জীবনের স্রোতমালা!
সর্ব্বব্যাপী অন্ধকারে, মিশিয়া যাইবে ক্রমে,
পৃথিবীর যতকিছু সুখদুখ ভালবাসা—

দারুণ শ্রান্তির পরে সে অতি সুখের ঘুম,
সেই ঘুম ঘুমাইব আর কিছু নাই আশা !
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে, ভাঙ্গিবে সে ঘুম ঘোর,
নূতন প্রেমের রাজ্যে পুন আঁখি যবে [২১.১] মেলিব।
সে যে কি সুখের উষা হাসিবে নূতন লোকে
সেই নব সূর্য্যালোকে মনো সুখে খেলিব !
রজনী পোহালে পরে, বিহঙ্গ খেলায় সুখে
মেঘে মেঘে সুখ গান গাহিয়া
তাপিত কুসুম যথা, বিতরে সুরভি শ্বাস[২১.২]
... ...

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 40/২১খ] ২১.৩

এক বৎসরের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা, দ্রুত,···নিবারক,···ও অল্প ব্যয়সাধ্য প্রণালী উদ্ভাবন করিবে তাহারই···[ভার]তবর্ষীয় সভ্য প্রথাসকল ক্রমে ক্রমে য়ুরোপে রাষ্ট্র হইতে···[বর্ণের] প্রতি ঘৃণা— ১৮৭৩ খৃঃ অঃ ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের মিলিটা···কজন নিগ্রো ভর্ত্তি হয়, বিদ্যা উপার্জ্জনে সকলের সমান অধিকার···তাহার সহপাঠীগণ, তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারে না, কিন্তু তাহাদের আপন··· ···জাতীর সহিত কথোপকথন করিতে সকলেই অস্বীকার করিল। যতদিন আর একজন নিগ্রো না ভর্ত্তি হইয়াছিল দরিদ্র বে···কাকী হইয়া পড়িল। পঁচাত্তর জন ছাত্র, যাহারা সকলেই, সাধারণতন্ত্র, রাজ্যে বাস ক···তাহারা সমানতা সমানতা করিয়া দিনরাত্রি মহা গোলযোগ করে, তাহাদের মধ্যে কেহ···এই নিগ্রোর সহিত মিশিতে সাহস করে নাই, কিন্তু এই নিগ্রো বিদ্যাশিক্ষার জন্য···[চা]রি বৎসর সম্পূর্ণরূপে একঘোরে হইয়া কাটাইয়াছিল। আমরা দেখিতেছি···ইংরাজি জাতীয় চরিত্র এখনো ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সবাসীরা সম্পূর্ণরূপে ভোগদখল করিতে···ছেন।

সে ঘুম ভাঙ্গিবে যবে, নূতন জীবন লোয়ে
নূতন নূতন রাজ্যে মনোসুখে খেলিব,
যত কিছু পৃথিবীর, দুখ, জ্বালা, কোলাহল,
ডুবায়ে বিস্মৃতি জলে মুছে সব ফেলিব

ওই যে অসংখ্য তারা, ব্যাপিয়া অনন্ত শূণ্য [২১.৪]
নীরবে পৃথিবী পানে রহিয়াছে চাহিয়া
ওই জগতের মাঝে, দাঁড়াইব একদিন,
হৃদয় বিস্ময়-গান উঠিবেক গাহিয়া—
রবিশশি গ্রহ তারা, ধূমকেতু শত শত,
আঁধার আকাশ ঘেরি চারিদিকে ছুটিছে,
বিস্ময়ে শুনিব ধীরে, বিশাল এ প্রকৃতির
অভ্যন্তর হোতে এক গীতধ্বনি উঠিছে !
অনন্ত গম্ভীর ভাবে, বিস্ফারিত হবে মন,
হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব যাবে সব ছিঁড়িয়া ?
তখন অনন্ত কাল, অনন্ত জগত মাঝে
অনন্ত গম্ভীর সুখে রহিব গো ডুবিয়া !

———

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা-41/২২ক] [২২.১]

Little Miss Muffet sat on a tuffet
Eating curd and whey
Litttle Jack Horner sat in a corner
Eating a Christmas pie
He put in his thumb and pulled out a plum
And said what a good boy am I
—Old Song

———

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 42/২২খ] [২২.২]

... .

ছেলেবেলাকার আহা, ঘুমঘোরে দেখেছিনু
মূরতি দেবতাসম অপরূপ স্বজনি,
ভেবেছিনু মনে মনে, প্রণয়ের চন্দ্রলোকে
খেলিব দুজনে মিলি দিবস ও রজনি,

আজ সখি একেবারে, ভেঙ্গেছে সে ঘুমঘোর
ভেঙ্গেছে সাধের ভুল মাখানো যা মরমে,
দেবতা ভাবিনু যারে, তার কলঙ্কের কথা
শুনিয়া মলিন মুখ ঢাকিয়াছি শরমে।
তাই ভাবিয়াছি সখি, এই হৃদয়ের পটে
এঁকেছি যে ছবিখানি অতিশয় যতনে,
অশ্রুজলে অশ্রুজলে, মুছিয়া ফেলিব তাহা,
আর না আনিব মনে, এই পোড়া জনমে।—
কিন্তু হা— বৃথা এ আশা, মরমের মরমে যা'
আঁকিয়াছি সযতনে শোণিতের আখরে,
এ জনমে তাহা আর, মুছিবে না, মুছিবে না,
আমরণ রবে তাহা হৃদয়ের ভিতরে!
আমরণ কেঁদে কেঁদে, কাটিয়া যাইবে দিন,
নীরব আগুনে মন পুড়ে হবে ছাই লো!
মনের এ কথাগুলি গোপনে লুকায়ে রেখে
কতদিন বেঁচে রব ভাবিতেছি তাই লো!

———

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 43/২৩ক]

কুমার সম্ভব

সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন
উত্তর অয়ন যবে করিল আশ্রয়
দক্ষিণের দিক্‌বালা প্রাণের হুতাশে
অধীর হইয়া উঠি ফেলিল নিশ্বাস।

নূপুর শিঞ্জনসহ সুন্দরী কুলের
মোহন পদাঘাতের অপেক্ষা না করি

অশোক তরুর কাঁধ অবধি করিয়া
ফুটিয়া উঠিল ফুল পল্লব সহিতে।

কচি কচি নবীন পল্লব উদগমে
সমাপ্তি লভিল যেই নব চূত বাণ
বসাইল অলিবৃন্দ বসন্ত অমনি
কুসুম-ধনুর যেন নামাক্ষরগুলি।

কর্ণিকার ফুলের এমন বর্ণ-শোভা
সৌরভ নাহি রে তার বড় প্রাণে বাজে,
একাধারে সব গুণ বর্ত্তিবে যে কভু
বিধাতার প্রবৃত্তি বড়ই তাতে বাম

মর্ম্মর শবদে যথা জীর্ণ পর্ণ ঝরে
হেন বনে মদ-ভরে উদ্ধত হইয়া
বায়ুর প্রত্যভিমুখে চরিছে হরিণ
পিয়াল-মঞ্জরী হ'তে উড়ি আসি রেণু
করিতেছে সবাকার দৃষ্টির[২৩.১]

উদ্যত কুসুম ধনু সঙ্গে লয়ো[রতি]
সেই ঠাঁই যখন হইলা উপনীত
জীবজন্তু সবাকার মরমে মরমে
কি যে রস সঞ্চারিল অন্তরের ভা [ব]
বাহিরিতে লাগিল সবার সব কাজে

ভ্রমরীর পিছে পিছে উড়িয়া ভ্রমর
একই কুসুম পাত্রে মধু কৈল পা [ন]
শৃঙ্গ দিয়া কৃষ্ণসার মৃগীর এমনি
দিতেছে গা চুলকিয়া, পরশের সুখে
মুদিয়া আসিছে আঁখি কুরঙ্গিনীটির।

রসাবেশে করিণী হইয়া গদগদ
গণ্ডূষ করিয়া লয়্যে পদ্মগন্ধি জল
পিয়াইয়া দিল তাহা প্রিয় মাতঙ্গেরে।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 44/২৩থ]

থামে যেই কিন্নরী করিয়া গীত গান
যখন মুখমণ্ডলে পত্রলেখা ছাপ
উঠিয়া গিয়াছে কিছু শ্রমজল লাগি
ঘুরিছে আঁখি যখন পুষ্পমদভরে
সেই অবসরটিতে বসিয়া কিন্নর
প্রেয়সীর বিধুমখে চুম্বে ঘন ঘন।

লতাবধু[২০.২] যতেক কানন বনময়,
কুসুম স্তবক নব স্তন যা' সবার,
নব কিসলয় আর ওষ্ঠ মনোহর
বাঁধিল তাহারা সবে গাঢ় আলিঙ্গনে
তরুশাখা সবাকারে, নম্রফুল ভরে।

দিব্য শুনা যাইতেছে অপ্সরীর গান
তবুও শঙ্কর দেব ধ্যানে নিমগন
আপনি আপন প্রভু যে মহাপুরুষ
কোন বিঘ্ন কভু [তাঁরে নারে] টলাইতে।

আসন্ন মরণ নাকি মদনের, তাই
দেবদারুবেদীতে শার্দূল চর্ম্মাসনে
নিরখিল আসীন সংযমী মহাদেবে।
পূর্ব্বকায় ঋজু স্থির স্কন্ধ দুই নত
কর দুটি শোভিছে উপর মুখা তেলো
প্রফুল্ল পঙ্কজ যেন কোলের গোড়ায়।

জড়ানো, জটা কলাপে জীয়ন্ত ভুজগ,
তুই ফের করি আর অক্ষমালা কাণে।
গ্রন্থিযুত মৃগছাল আছেন যা' পরি
হইয়াছে নীলবর্ণ কণ্ঠের প্রভায় ॥

চক্ষে নাহি পলক ; স্তিমিত উগ্রতারা
কিঞ্চিৎ কেবল পাইতেছে পরকাশ
ভুরুদ্বয়ে বিকারের প্রসঙ্গটি নাই
নাশিকার ২৩.৩ অগ্রভাগে লক্ষ আছে পড়ি।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 45/২৪ক]

লতা গৃহদ্বারে নন্দী করি আগমন
বাম করতলে এক হেম বেত্র ধরি
অধরে অঙ্গুলি দিয়া করিল সঙ্কেত।
নিষ্কম্প অমনি বৃক্ষ নিভৃত ভ্রমর
মূক বিহঙ্গম শান্ত মৃগ-যাতায়াত
সমস্ত কাননময় তাহারি শাসনে
[ছবিসম যে যেমন তেমনি] রহিল ॥

শুকতারা সমান অযাত্রা মনে গণি,
নন্দীর নয়ন পথ এড়ায়্যে মদন
নমেরু তরুর ডালপালার আড়ালে
হেরিল মহাদেবের ধ্যানের প্রদেশ

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 44/২৩খ]

জলপূর্ণ জলদ বৃষ্টির নাহি নাম
অকূল অগাধ সিন্ধু তরঙ্গটি না [ই]
নিবাত নিষ্কম্পশিখা প্রদীপ [যেমন]
এমনি [হইয়াছেন প্রাণবায়ু রোধে]

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 45/২৪ক]

জ্যোতির অঙ্কুর যাহা ব্রহ্মরন্ধ্র হ'তে
উঠিয়াছে, পথ পেয়ে মধ্যের আঁখিতে
মৃণালের সূত্র জিনি সুকুমারতর
নব শশধরশ্রীকে করিছে মলিন।

ইন্দ্রিয় হইতে মন ফিরাইয়া আনি
হৃদয়ে স্থাপন করি সমাধির বশে
যে অক্ষর পুরুষে ক্ষেত্রজ্ঞ জন জানে
আত্মাতে সেই আত্মাকে দেখিছেন তিনি।

মনেরো অধৃষ্য যিনি অদূরে তাঁহারে
নিরখি অমন ধারা ধ্যানে নিমগন
এমনি ভয়ে আড়ষ্ট হইল মদন
হাত হৈতে পড়ি গেল ধনুর্ব্বাণ খসি
কখন যে পড়িল তা' নারিল জানিতে।

বীর্য্য নিভ নিভ প্রায় এই যে তাহার
উস্কাইয়া তুলি তাহা রূপের ছটায়
পাছু পাছু দুই বন-দেবতা সুন্দরী
পর্ব্বতরাজদুহিতা দেখা দিল আসি।

পদ্মরাগ মণি জিনি অশোক কুসুম
কাড়িয়াছে হেমদ্যুতি কর্ণিকার ফুল
হইয়াছে সিন্ধুবার মুকুতাকলাপ
বসন্ত কুসুম যত অঙ্গ-অ[া]ভরণ

স্তনভারে নতকায় কিঞ্চিত অমনি
তরুণ অরুণ রাগ বসনে তাঁহার
কুসুম স্তবক ভরে নম্র আহা মরি
সঞ্চারিণী পল্লবিনী যেন গো লতাটি।

খসি খসি পড়িতেছে বকুল মেখলা
পুনঃ পুনঃ রাখিছেন আটক করিয়া ।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 46/২৪খ]

ভ্রমর তৃষিত হয়ে নিশ্বাস সৌরভে
বিম্ব অধরের কাছে বেড়ায় উড়িয়া
চঞ্চল নয়ন পাতে উমা প্রতিক্ষণ
লীলা শতদল নাড়ি দিতেছেন তাড়া !

যাঁর রূপরাশি দেখি রতি লজ্জা পায়
অকলঙ্ক সে উমারে নিরখি মদন
জিতেন্দ্রিয় শূলি ২৪.১ প্রতি স্বকাজ সাধিতে
পুনরায় বক্ষে নিজ বাঁধিল সাহস

এমন সময় উমা ভবিষ্যৎপতি
মহেশের দুয়ারে হইলা উপনীত
তিনিও পরমজ্যোতি পরমাত্মরূপ
নিরখিয়া অন্তরে ক্ষান্ত হ'লেন যোগে

ক্রমে ক্রমে প্রাণবায়ু করিয়া মোচন
যোগাসন শিথিল করিতেছেন হর
ওদিকে ভুজঙ্গ অধিপতির মস্তকে
কষ্টকর ঠেকিতেছে ধরণীর ভার

নন্দী তাঁর পদতলে প্রাণিপাত করি
নিবেদিল এসেছেন শুশ্রূষার তরে
শৈলসূতা, মহেশের ভ্রূক্ষেপ মাত্রেই
প্রবেশের অনুমতি হইল বুঝিয়া
নন্দী গিরিনন্দিনীরে পশাইলা তথি

সখী দুটি মহাদেবে করিয়া প্রণাম
উমার স্বহস্তে তোলা পল্লবে জড়িত
হিমসিক্ত ফুলগুলি অর্পিল চরণে

উমাও যেমন তাঁরে করিলা প্রণা[ম]
সুনীল অলক শোভি নবক[র্ণিকার]
খসিয়া অবনিতলে পড়িল [অমনি]

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 47/২৫ক]

অনন্যভাজন পতি লাভ কর বলি
আশিষিলা মহাদেব ; যথার্থ আশীষ
উচ্চারিত হৈল যদি ঈশ্বরের বাণী
কভু বিপরীত অর্থ না হয় ঘটন।

বহ্নিমুখকামী কাম পতঙ্গ যেমতি
বাণ-সন্ধানের অবসর প্রতীক্ষিয়া
মুহূর্ত্তেক আকর্ষিল শরাসন-গুণ

পার্ব্বতী এ হেন কালে তাম্ররুচি করে
লয়ে গেলা মন্দাকিনী পদ্মবীজমালা
ভানুর কিরণে শুষ্ক, হরে সমর্পিতে

ভকতবাৎসল্য হেতু যেমন শঙ্কর
লইবেন আদরে পুষ্কর বীজমালা
অমনি অব্যর্থ বাণ নাম সম্মোহন
শরাসনে যুড়িল কুসুম শরাসন

চন্দ্রোদয় আরম্ভে যেমন অম্বুরাশি
একরতি অধীর হইল যেই মন

বিম্বাধর শোভিত উমার মুখপানে
ত্রিনয়ন নিবেশিলা শম্ভু একেবারে।

উমাও মনের ভাব নারিলা ঢাকিতে
অঙ্গ যেন বিকসিত কদম্ব কুসুম
লজ্জা [য় বিভ্রান্ত আঁখি] সামালিতে নারি
[আড়ভাবে রাখিলেন চারু মুখখানি]

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 48/২৫খ]

মহাবশী মহাদেব অন্য কেহ নয়
মুহূর্ত্তে ইন্দ্রয়ক্ষোভ নিগ্রহ করিয়া
বিকৃতির কারণ কি জানিবার তরে
করিলা নয়নপাত দিগ্‌দিগন্তরে।

মদনেরে দেখিলেন দক্ষিণ অপাঙ্গে
মুষ্টি রহিয়াছে লগ্ন ধনুর্গুণ-ধারী
বামপদ কুঞ্চিত কাঁধের দিক্ নত
চক্রাকার করিয়া সুন্দর ধনুখানি
টানিয়াছে গুণ মারে আর কি সে বাণ॥

বাড়িল শিবের ক্রোধ তপস্যায় ভঙ্গে
এমনি ভ্রূভঙ্গ যে, তাকায় মুখপানে
সাধ্য নাই কাহারো, তৃতীয় নেত্র হ'তে
বাহিরিল সহসা জ্বলন্ত হুতাশন

ক্রোধ প্রভু সংহর সংহর এই বাণী
দেবতা সবার হোতা চরুক্ বাতাসে
হেতায় মদন তনু ভস্ম অবশেষ।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 51/২৭ক]

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গৌড়ে
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন বশে কিছু হয়না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি পিরহনে মান রয়না
পিতা মাতা ভ্রাতা নব-শিশু অনাথা ছুট্ কোরে
বিরাজে জাহাজে মসি-মলিন কোর্ত্তা বুট্ পোরে
সিগারে উদ্‌গারে মুহুমুহু মহা ধূম-লহরী
সুখ স্বপ্নে আপ্নে বড় চতুর মানে হরি হরি
ফিমেলে ফীমেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে
কি তাহে উৎসাহে মগন তিনি সাহেবগিরিতে।
বিহারে নীহারে বিবিজনসনে স্কেটিঙ করি
বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি।
ফিরে এসে দেশে গল কলর বেশে হটহটে—
গৃহে ঢোকে রোখে উলগতনু দেখে বড় চটে।
মহা আড়ি সাড়ী নিরখি চুল দাড়ি সব ছিঁড়ে
দুটা লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে।

—॥—

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 52/২৭খ] ২৭.১

মুখখানি ধীরে ধীরে দেখিতেছ তুলে
দাঁড়াইয়া কাছে
দেখিবারে—ক্ষুদ্র জুঁই মুখ নত করি
অভিমান কোরে বুঝি আছে
নয় ২ তাহা নয় সে সকল খেলা নয়
ফুরায় জীবন,
তবে যাও চলে যাও—আর কোন ফুলে যাও
প্রভাত পবন!

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 53/২৮ক]

কি উপায়ে সাবধান কর্ব্বেন ?—করিবে—
তার জন্য কি কল্লে ভাল হয় উপদেশ দিন—করিবে—
তিনি যে বিপদে পড়েছেন তাতে কি উদ্ধার পাবেন ? শীঘ্র না
ন বোঠান কি যাবেন ?—আমি ত বলিলাম
সনাতন মুখোপাধ্যায়
আমি বস্‌লেই কালীকুমার নন্দী কেন আসেন—A fool.
তাকে তাড়ান যাবে কি করে ?—In the name of God.
তাঁর নাম কচ্চি কিন্তু যাচ্চেন না—A certainly
আর একবার লিখুন—I meant to say—Most solemnly.
আজ বড় গোলযোগ হচ্চে আপনাকে প্রণাম করে বিদায় হই—হাঁ

তুমি কোথায় থাক ?—One one one
কোথায় থাক ?—One one one
জানকীবাবু ও নদিদি
তুমি কে ?—Cally···Mohun
গুনদাদাকে এনেই তুমি যাবে কি ?

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 54/২৮খ]

শৈশব সংগীত

বোটে লিখিয়াছি
মঙ্গলবার
২৪ আশ্বিন
১৮৭৭

কেমন গো, আমাদের, ছোট এ কুটীরখানি ;
সুমুখে নদীটি যায় চলি,
মাথার উপরে তার বট অশথের ছায়া
সামনে বকুল গাছগুলি !

সারাদিন হু হু করি, বহিছে নদীর বায়ু
ঝর ঝর দুলে গাছপালা,
ভাঙ্গা চোরা বেড়াগুলি, উঠেছে লতিকা তায়
ফুল ফুটি করিয়াছে আলা !
ওদিকে পড়িয়া মাঠ, দূরে দুচারিটি গরু
চিবায় নবীন তৃণদল।
কেহবা গাছের ছায়ে, কেহ বা খালের ধারে
পান করে সুশীতল জল।
ওগো কল্পনা বালা, কত সুখে ছেলেবেলা
এইখানে করেছি যাপন,
সেদিন পড়িলে মনে, প্রাণ যেন কেঁদে উঠে
হু হু করে উঠে শূন্য মন।
নিশীথে নদীর পরে ঘুমায়ে পড়েছে চাঁদ
সাড়া শব্দ নাই চারি পাশে
[এক]টি দুরন্ত ঢেউ, জাগেনি নদীর কোলে
পাতাটিও নড়েনি বাতাসে
[তখন] যেমন ধীরে, দূর হোতে দূর প্রান্তে
নাবিকের বাঁশরীর গান
[ধরি] ধরি করি সুর, না পারে ধরিতে মন,
হু হু করি উঠে গো পরাণ।
[কি] যেন হারায়ে গেছে, কি যেন না পাই খুঁজে
কি কথা গিয়াছি যেন ভুলে,
কি কু স্বপনসম, মরমের মরমেতে
কি যেন কি জাগাইয়া তুলে।
তেমনি হে কলপনা, তুমি ও বীণায় যবে
বাজাও সেদিনকার গান
বাঁশির মরমে তার জাগি উঠে প্রতিধ্বনি
কাঁদি [উঠে আ]কুল পরাণ।

[হা]দেবী [তেমনি য]দি, থাকিতাম চিরকাল
[না ফুরাত সেই] ছেলেবেলা[২৮.১]

... ...

ঘুম ভাঙা আঁখি মেলি যখন প্রফুল্ল উষা
ফেলেন গো সুরভি নিশ্বাস,
ঢেউগুলি জাগি উঠি, পুলিনের কানে কানে
মৃদু কথা কহে ফুস্‌ফাস্‌ ।
তেমনি উঠিত হৃদে, প্রশান্ত সুখের উর্ম্মি
অতি মৃদু অতি সুশীতল
বহিত সুখের শ্বাস, নাহিয়া শিশির জলে
ফেলে যথা কুসুম সকল ।
অথবা যেমন যবে প্রশান্ত সায়াহ্নে[২৮.২] আহা,
ডুবে সূর্য্য সমুদ্রের কোলে,
বিষণ্ণ কিরণ তার, শ্রান্ত বালকের মত
পড়ে থাকে সুনীল সলিলে ।
নিস্তব্ধ সকল দিক, একটি ডাকেনা পাখী
একটুও বহেনা বাতাস ।
তেমনি কেমন এক, গম্ভীর বিষণ্ণ সুখ
হৃদে জাগাইত দীর্ঘশ্বাস ।
এইরূপ কত কি যে, হৃদয়ের ঢেউখেলা
দেখিতাম বসিয়া বসিয়া
মরমের ঘুমঘোরে, কত দেখিতাম স্বপ্ন
যেত দিন হাসিয়া খুসিয়া ।
বনের পাখীর মত, অনন্ত আকাশ তলে
গাহিতাম অরণ্যের গান ।
আর কেহ শুনিত না, প্রতিধ্বনি জাগিত না,
শূন্যে মিলাইয়া যেত তান ।

এত দিন পরে আজ, অয়িগো কল্পনা দেবী
কি হল আমার দুরদশা
অতীতে সুখের স্মৃতি, বর্ত্তমানে দুখজ্বালা
ভবিষ্যতে দারুণ দুরাশা
যেনরে আমারি ঘোর মনের আঁধার ছায়া
ঢাকিয়াছে সমস্ত ধরণী
এই যে বাতাস বহে, আমারি মর্মের যেন
দুখনিশ্বাসের প্রতিধ্বনি
যেনরে এ জীবনের আঁধার সমুদ্রে আমি
ভাসায়ে দিয়াছি জীর্ণ তরি
এসেছি যেখান হতে, অস্ফুট সে নীল তট
এখনো রয়েছে দৃষ্টি ভরি।
সে[দিকে] ফিরায়ে আঁখি, এখনো দেখিতে পাই[২৮.৩]
... ...

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 55/২৯ক]

দামিনীর আঁখি কিবা—ধরে জ্বল জ্বল বিভা
কার তরে জ্বলিতেছে কেবা তাহা জানিবে!
চারিদিকে তীক্ষ্ণধার—বাণ ছুটিতেছে তার
কার পরে লক্ষ্য তার কে বা অনুমানিবে!
তার চেয়ে নলিনীর আঁখি পানে চাহিতে
কত ভাল লাগে তাহা কে পারিবে কহিতে
সদা তার আঁখি দুটি, নিচু পানে আছে ফুটি
সে আঁখি দেখেনি কেহ উঁচুপানে তুলিতে!
যদি বা সে ভুলে কভু চায় কারো আননে—
সহসা লাগিয়া জ্যোতি—সে জন বিস্ময়ে অতি

চমকিয়া উঠে যেন স্বরগের কিরণে !
ও আমার নলিনী লো—লাজ মাখা নলিনী—
অনেকের আঁখি পরে—সৌন্দর্য্য বিরাজ করে
তোর আঁখি পরে প্রেম—নলিনী লো—নলিনী—

—॥—

দামিনীর দেহে রয়—বসন কনকময়
সে বসন অপসরী সৃজিয়াছে যতনে
যে গঠন যেই স্থান, প্রকৃতি কোরেছে দা[ন]
সে সকল ফেলিয়াছে ঢাকিয়া সে বসনে [২৯.১]
নলিনী বসন পানে দেখ দেখি চাহিয়া
তার চেয়ে কত ভাল কে পারিবে কহিয়া !
শিথিল বসন তার—ওই দেখ চারিধার—
স্বাধীন বায়ুর মত উড়িতেছে বিমানে
যেথা যে গঠন আছে, পূর্ণভাবে বিকাশিছে
যেখানে যা উঁচু নিচু প্রকৃতির বিধানে !
ও আমার নলিনীলো—সুকোমলা নলিনী—
মধুর রূপের ভাস—তাই প্রকৃতির বাস—
সেই বাস তোর দেহে—নলিনীলো—নলিনী !

—॥—

সদা রসিকতা জাগে—দামিনীর মুখ আগে
চারিধারে জ্বলিতেছে খরধার বাণ সে—
কিন্তু কে বলিতে পারে—শুধু সে কি ধাঁধিবারে
নহে তা কি খরধারে বিঁধিবার মানসে ?
কিন্তু নলিনীর মনে—মাথা রাখি সঙ্গোপনে
ঘুমায়ে রয়েছে কিবা প্রণয়ের দেবতা—

স্নুকোমল সে শয্যার অতি যা কঠিন ধার—
দলিত গোলাপ তাও আর কিছু নহে তা!
ও আমার নলিনী লো—বিনয়িনী নলিনী—
রসিকতা তীব্র অতি—
নাই তার এত জ্যোতি
তোমার নয়নে যত—নলিনী-লো নলিনী—

———

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 56/২৯খ]

হে কবিতা—হে কল্পনা—
জাগাও—জাগাও দেবি উঠাও আমারে দীন হীন —
ঢাল এ হৃদয় মাঝে জ্বলন্ত-অনলময় বল —
দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন
নির্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন বল !
নিদাঘ তপন শুষ্ক ম্রিয়মান[২২.২] লতার মতন —
অবসন্ন হোয়ে যেন ভূমি পরে পড়িছি লুটায়ে —
চারিদিকে চেয়ে দেখি ক্লান্ত আঁখি করি উন্মীলন —
বন্ধুহীন—প্রাণহীন—জনহীন—মরু—মরু—মরু—
আঁধার—আঁধার—সব—নাই জল—নাহি তৃণ তরু —
নির্জীব হৃদয় মোর পড়িতেছে ভূমিতে লুটায়ে —
এস দেবি এস, মোরে — রাখ এ মূর্চ্ছার ঘোরে —
বলহীন হৃদয়েরে দাও দেবি দাও গো উঠায়ে !—
দাও দেবি সে ক্ষমতা—ওগো দেবি শিখাও সে মায়া —
যাহাতে জ্বলন্ত দগ্ধ নিরানন্দ মরু মাঝে থাকি —
হৃদয় উপরে পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া —
বাহিরের রৌদ্র হোতে মাতৃস্নেহে আবরিয়া রাখি !

দাও দেবি সে ক্ষমতা, যাহে এই নীরব শ্মশানে
হৃদয়-প্রমোদ বনে বাজে সদা আনন্দের গীত !
মুমূর্ষু মনের ভার —পারিনা বহিতে আর —
হইতেছি অবসন্ন—বলহীন চেতনা রহিত—
অজ্ঞাত পৃথিবী তলে—অকর্ম্মণ্য অনাথ অজ্ঞান
উঠাও—উঠাও মোরে করহ নূতন প্রাণ দান !
পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে যুঝিব—যুঝিব দিনরাত —
কালের প্রস্তরপটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম —
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিবনা এ শরীর পাত —
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্ম্মেরি অনুষ্ঠান —
অগম্য উন্নতি-পথে পৃথ্বি... তরে গঠিব সোপান !
তাই বলি দেবি —
সংসারের ভগ্নোদ্যম অবসন্ন দুর্ব্বল পথিকে
কর গো জীবন দান তোমার ও অমৃত-নিষেকে ॥১॥

Ahmedabad
1878-July 6th
আষাঢ় ২৩শে—শনিবার
6th July, 1878

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 57/৩০ক]

নানা বর্ণময় মেঘ, মিশেছে বনের শিরে
এখনো ওই যে যায় দেখা
যেতেছি যেখানে ভাসি, সেদিকে চাহিয়া দেখি,
কিছুইত না পাই উদ্দেশ ।
আঁধার তরঙ্গরাশি সমুদ্র দিগন্তে মিশে
উনমত্ত অকূল অশেষ ।

ক্ষুদ্র জীর্ণ ভগ্নতরি, একাকী যাইবে ভাসি,
যতদিনে ডুবিয়া না যায়
হু হু করি ববে বায়ু, গর্জ্জিবে উন্মত্ত ঊর্ম্মি
ঝকমকি বিদ্যুতশিখায়

*　　*　　*　　*　　*

আমার এ মনোজ্বালা কে বুঝিবে সরলে
কেন যে এমন করে, ম্রিয়মান হোয়ে থাকি
কেন যে নীরবে হেন বসে থাকি বিরলে।
এ যাতনা কেহ যদি বুঝিতে পারিত দেবি,
তবে কি সে আর কভু পারিত গো হাসিতে ?
হৃদয় আছয়ে যার সঁপিতে পারে সে প্রাণ
এ জ্বলন্ত যন্ত্রণার এক তিল নাশিতে !
হে সখী হে সখাগণ, আমার মর্ম্মের জ্বালা
কেহই তোমরা যদি না পার গো বুঝিতে,
কি আগুন জ্বলে তার নিভৃত গভীর তলে
কি ঘোর ঝটিকাসনে হয় তারে যুঝিতে।
তবে গো তোমরা মোরে শুধায়োনা শুধায়োনা
কেন যে এমন করে রহিয়াছি বসিয়া
বিরলে আমারে হেথা, একলা থাকিতে দাও,
[আমা]র মনের কথা বুঝিবে কি করিয়া ?
[ম্রিয়]মান৩০.১ মুখে, এই শূন্যপ্রায় নেত্রে
[ক]লঙ্ক সঁপিগো আমি তোমাদের হরষে ;
পূর্ণিমা যামিনী যথা মলিন হইয়া যায়
ক্ষুদ্র এক অন্ধকার জলদের পরশে
কিন্তু কি করিব বল, কি চাও কি দিব আমি
তোমাদের আমোদ গো একতিল বাড়াতে
হৃদয়ে এমন জ্বালা, কি কোরে হাসিব বল
কিছুতে বিষণ্ণভাব পারিনা যে তাড়াতে

বিরক্ত হয়োনা সখি, অমন বিরক্ত নেত্রে
আমার মুখের পানে রহিওনা চাহিয়া,
কি আঘাত লাগে প্রাণে, দেখি ও বিরক্ত মুখ
কেমনে সখিগো তাহা বুঝাইব কহিয়া ?
ব্যথায় পাইয়া ব্যথা, যদি গো শুধাতে কথা
অশ্রুজলে মিশাইতে যদি অশ্রুজল
আদরে স্নেহের স্বরে, একটি কহিতে কথা,
অনেক নিভিত তবু এ হৃদি অনল
জানিতাম ওগো সখি, কাঁদিলে মমতা পাব,
কাঁদিলে বিরক্ত হবে এ কি নিদারুণ ?
চরণে ধরিগো সখি, একটু করিও দয়া
নহিলে নিভিবে কিসে বুকের আগুন ! ৩০.২

... ...

উপহার গীতি

ছেলেবেলা হোতে বালা, যত গাঁথিয়াছি মালা
যত বনফুল আমি তুলেছি যতনে
ছুটিয়া তোমারি কোলে, ধরিয়া তোমারি গলে
পরায়ে দিয়াছি সখি তোমারি চরণে।
আজো গাঁথিয়াছি মালা, তুলিয়া বনের ফুল
তোমারি চরণে সখি দিব গো পরায়ে—
না হয় ঘৃণার ভরে, দলিও চরণতলে
হৃদয় যেমন কোরে দলেছ দুপায়ে।
পৃথিবীর নিন্দাযশে, কটাক্ষ করিনা বালা
তুমি যদি সোহাগেতে করহ গ্রহণ

আমার সর্ব্বস্বধন, কবিতার মালাগুলি
পৃথিবীর তরে আমি করিনি গ্রন্থন।
আমি যে সকল গান গাই গো মনের সুখে
সপ্তসুরে পূর্ণ করি এ শূন্য আকাশ
পৃথিবীর আর কেহ, শুনুক্ বা না শুনুক্
তুমি যেন শুন বালা, এই অভিলাষ !
তোমার লাগিবে ভালো, তুমি গো বলিবে ভালো,
গলাবে তোমারি মন এ সঙ্গীত ধ্বনি
আমার মর্ম্মের কথা, তুমিই বুঝিবে সখি
আর কেহ না বুঝুক্ খেদ নাহি গণি
একদিন মনে পড়ে, যাহা তাহা গাইতাম
সকলি তোমার সখি লাগিত গো ভাল
নীরবে শুনিতে তুমি, সমুখে বহিত নদী
মাথায় ঢালিত চাঁদ পূর্ণিমার আলো।
সুখের স্বপনসম, সেদিন গেলগো চলি
অভাগা অদৃষ্টে হায় এ জন্মের তরে
আমার মনের গান মর্ম্মের রোদনধ্বনি
স্পর্শও করেনা আজ তোমার অন্তরে।
তবুও—তবুও সখি তোমারেই শুনাইব
তোমারেই দিব সখি যা আছে আমার।
দিনু যা' মনের সাথে, তুলিয়া লও তা হাতে
ভগ্ন হৃদয়ের এই প্রীতি উপহার

Les Poetes হইতে অনুবাদিত বাড়িতে ১লা কার্ত্তিক মঙ্গলবার

—॥—

শুন কলপনা বালা, ছিল কোন কবি
বিজন কুটীরে একা ছেলে বেলা হোতে
তোমার অমৃতপানে আছিল মজিয়া।

তোমার বীণার ধ্বনি ঘুমায়ে ঘুমায়ে
শুনিত, দেখিত কত স্থখের স্বপন !
বালক আছিল যবে, সে অল্পবয়সে
হৃদয় আছিল তার সমুদ্রের মত,
সে সমুদ্রে চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ তারকার
প্রতিবিম্ব দিবানিশি পড়িত খেলিত।
সে সমুদ্র প্রণয়ের জোছনা পরশে
লঙ্ঘিয়া তীরের সীমা উঠিত উথলি।
সে সমুদ্র আছিল গো এমন বিস্তৃত
সমস্ত পৃথিবী দেবি ! পারিত বেষ্টিতে৩০.৩

… … …

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 58/৩০খ]

দুরন্ত শিশুর মত মুক্ত বায়ুধারা
দিবানিশি হু হু করি বেড়াত খেলিয়া।
বালকের হৃদয়ের গূঢ় তলদেশে
কত যে রতন রাশি ছিল গো লুকানো
কেহ জানিতনা কেহ পেতনা দেখিতে ?
প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত
নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল
কহিত প্রকৃতি দেবী বালকের কানে
প্রভাত সমীর যথা নিশ্বাস ফেলিয়া
কহে কুসুমের কানে মর্ম্মের বারতা।
নদীর মনের গান বালক যেমন
বুঝিত, এমন আর কেহ বুঝিতনা
কুসুমের মরমের সুরভি শ্বাসের
তুমিই কল্পনা তারে দিতে ব্যাখ্যা করি।

বিহঙ্গ তাহার কাছে গাহিত যেমন
এমন কাহারো কাছে গাহিত না আর।
তাহার নিকট দিয়া যেমন বহিত
এমন কাহারো কাছে বহিতনা বায়ু।
যখনি গো নিশীথের শিশিরাশ্রু জলে
ফেলিতেন উষাদেবী সুরভি নিশ্বাস
গাছপালা লতিকার পাতা নড়াইয়া,
ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া ঘুমন্ত নদীর
যখনি গাহিত বায়ু বন্য গান তার
তখনি বালক কবি ছুটিত প্রান্তরে
দেখিত ধান্যের শিষ দুলিছে পবনে
দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়
উষার জলদময় সুবর্ণ অঞ্চল
দূর দিগন্তের প্রান্তে পড়েছে খসিয়া।
যখনি নিশীথে চাঁদ সুনীল আকাশে
সুপ্ত বালকের মত ঘুমায়ে ঘুমায়ে
সুখের স্বপন দেখি হাসিত নীরবে,
ছুটিয়া তটিনী তীরে দেখিত সে কবি,
স্নান করি জ্যোছনায় উপরে হাসিছে
সুনীল আকাশতল, নিম্নে স্রোতস্বিনী,
সহসা সমীরণের পাইয়া পরশ
দুয়েকটি ঢেউ কভু জাগিয়া উঠিছে।
ভাবিত নদীর পানে চাহিয়া চাহিয়া,
নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান।
দিবসের আলোকেতে সবি অনাবৃত
সকলি রয়েছে খোলা চক্ষের সামনে
ফুলের প্রত্যেক কাঁটা পাইবে দেখিতে।
দিবালোকে চাও যদি বনভূমি পানে,

কাঁটা খোঁচা কৰ্দ্দমাক্ত বীভৎস জঙ্গল
তোমার চখের পরে হবে প্রকাশিত!
দিবালোকে মনে হয় সমস্ত জগৎ
নিয়মের যন্ত্রচক্রে ঘুরিছে ঘর্ঘরি।
কিন্তু [কবি] নিশাদেবী কি মোহন মন্ত্র
[পড়ি দেয়] সমুদয় জগতের পরে
[সকলি দেখায়] যেন রহস্যে পূরিত।
[সমস্ত জগৎ যেন স্বপ্নের মতন]
ওই স্তব্ধ নদীজলে চন্দ্রের আলোকে
[পিছলিয়া] চলিতেছে যেমন তরণী,
তেমনি সুনীল ওই আকাশ সলিলে
ভাসিয়া চলেছে যেন সমস্ত জগৎ,
সমস্ত ধরারে যেন দেখিয়া নিদ্রিতে
একাকী গম্ভীর কবি নিশাদেবী ধীরে
তারকার ফুলমালা জড়ায়ে মাথায়
জগতের গ্রন্থে কত লিখিছে কবিতা।
এইরূপে সে বালক কত কি ভাবিত।
নির্ঝরিণী, সিন্ধুবেলা, পৰ্ব্বত, গহ্বর
সকলি আছিল তার সাধের বসতি।
তার প্রতি তুমি এত ছিলে অনুকূল[৩০.৪]
জগতের সৰ্ব্বত্রেই পাইত শুনিতে
তোমার বীণার ধ্বনি, কখনো শুনিত
প্রস্ফুটিত গোলাপের হৃদয়ে বসিয়া
বীণা লয়ে বাজাইছ অস্ফুট কি গান।
কনক কিরণময় উষার জলদে
একাকী পাখীর সাথে গাইতে কি গীতি
তাই শুনি যেন তার ভাঙ্গিত গো ঘুম।
অনন্ত তারা খচিত নিশীথ গগনে

বসিয়া গাইতে তুমি কি গম্ভীর গান,
তাই শুনি সে যেমন হইয়া বিহ্বল
নীরবে আকাশপানে রহিত চাহিয়া।
নীরব নিশীথে যবে একাকী রাখাল
সুদূর কুটীর তলে বাজাইত বাঁশি,
তুমিও তাহার সাথে মিলাইতে ধ্বনি
সে ধ্বনি পশিত তার বুকের ভিতর।
নিশার আঁধার কোলে জগৎ যখন
দিবসের পরিশ্রমে পড়িত ঘুমায়ে
তখন বালক উঠি তুষার মণ্ডিত
সমুচ্চ পর্ব্বত শিরে গাইত একাকী
প্রকৃতি বন্দনা-গান মেঘের মাঝারে।
সে গম্ভীর গান তার কেহ শুনিত না
কেবল আকাশব্যাপী স্তব্ধ তারকারা
একদৃষ্টে মুখপানে রহিত চাহিয়া—
কেবল পর্ব্বতশৃঙ্গ করিয়া আঁধার
সরল পাদপরাজি নিস্তব্ধ গম্ভীর
ধীরে ধীরে শুনিত গো তাহার সে গান,
কেবল সুদূর বনে দিগন্ত বালার
হৃদয়ে সে গান পশি প্রতিধ্বনিরূপে
মৃদুতর হোয়ে পুনঃ আসিত ফিরিয়া
কেবল সুদূর শৃঙ্গে নির্ঝরিণী বালা
সে গম্ভীর গীতি সাথে কণ্ঠ মিশাইত
নীরবে তটিনী যেত সুমুখে বহিয়া
নীরবে নিশীথে বায়ু কাঁপাত [পল্লব]

—॥—

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 59/৩১ক]

কত রক্তমাখা ছুরি হাসিছে হরষে
কত জিহ্বা হৃদয়েরে ছিঁড়িছে খুঁড়িছে !
বিষাদের অশ্রুপূর্ণ নয়ন হে গিরি !
অভিশাপ দেয় সদা পরের হরষে
উপেক্ষা ঘৃণায় মাখা কুঞ্চিত অধর
পর অশ্রুজলে ঢালে হাসিমাখা বিষ।
পৃথিবী জানে না গিরি ! হেরিয়া পরের জ্বালা
হেরিয়া পরের মর্ম্ম দুখের উচ্ছ্বাস
পরের নয়নজলে, মিশাতে নয়ন জল
পরের দুখের শ্বাসে মিশাতে নিশ্বাস !
প্রেম ? প্রেম কোথা হেথা এ অশান্তি ধামে ?
প্রণয়ের ছদ্মবেশ পরিয়া যেথায়
বিচরে ইন্দ্রিয়সেবা—প্রেম সেথা আছে ?
প্রেমে পাপ বলে যারা প্রেম তারা চিনে ?
মানুষে মানুষে যেথা আকাশ পাতাল
হৃদয়ে হৃদয়ে যেথা আত্ম অভিমান,
যে ধরায় মন দিয়া ভালবাসে যারা
উপেক্ষা বিদ্বেষ ঘৃণা মিথ্যা অপবাদে
তারাই অধিক সহে বিষাদ যন্ত্রণা,
সেথা যদি প্রেম থাকে তবে কোথা নাই ?
তবে প্রেম কলুষিত নরকেও আছে !
কেহবা রতন-ময় কনক ভবনে
ঘুমায়ে রয়েছে সুখে বিলাসের কোলে
অথচ সুমুখ দিয়া দীন নিরালয়
পথে ২ করিতেছে ভিক্ষান্ন সন্ধান !
সহস্র পীড়িতদের অভিশাপ লয়ে
সহস্রের রক্তধারে ক্ষালিত আসনে

সমস্ত পৃথিবী রাজা করিছে শাসন
বাঁধিয়া গলায় সেই শাসনের রজ্জু
সহস্র পৃথিবী তার রহিয়াছে দাস !
সমস্ত পীড়ন সহি আনত মাথায়
একের দাসত্বে রত অযুত মানব !
ভাবিয়া দেখিলে মন উঠেগো শিহরি,
ভ্রমান্ধ দাসের জাতি সমস্ত মানুষ !
এ অশান্তি কবে দেব ! হবে দূরীভূত ?
অত্যাচার গুরুভারে হোয়ে নিপীড়িত
সমস্ত পৃথিবী দেব ! করিছে ক্রন্দন
সুখ শান্তি সেথা হোতে লয়েছে বিদায় ।
কবে দেব এ রজনী হবে অবসান ?
কবে এ আঁধার ভার করিয়া নিক্ষেপ
[স্না]ন করি প্রভাতের শিশির সলিলে
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী !
[অ]যুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব
[এক]গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি !
[নাইক] দরিদ্র ধনী, অধিপতি, প্রজা,
[কেহ কারো] কুটীরেতে করিলে গমন
[মর্য্যাদার অপ]মান করিবে না মনে।
[সকলেই সকলের] করিতেছে সেবা
[কেহ কারো প্রভু নয়,] নহে কারো দাস !
নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন [ভাষা]
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার !
সকলেই আপনার আপনার লোয়ে
পরিশ্রম করিতেছে প্রফুল্ল অন্তরে
কেহ কারো সুখে নাহি দেয় গো কণ্টক
কেহ কারো দুখে নাহি করে উপহাস—

দ্বেষ, নিন্দা, ক্রূরতার জঘন্য আসন
ধর্ম্ম-আবরণে নাহি করে গো সজ্জিত!
হিমাদ্রি! মানুষ-সৃষ্টি আরম্ভ হইতে
অতীতের ইতিহাস পড়েছ সকলি—
অতীতের দীপশিখা যদি হিমালয়
ভবিষ্যৎ অন্ধকার পারে গো ভেদিতে
বল তবে কবে গিরি হবে সেই দিন
যে দিন স্বর্গই হবে পৃথ্বীর আদর্শ!
সে দিন আসিবে গিরি! এখনই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে!
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানব হৃদয়!
প্রকৃতির সব কার্য্য অতি ধীরে ধীরে।
এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে
পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে —
পৃথিবীর সে অবস্থা আসেনি এখনো —
কিন্তু একদিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।
আবার বলি গো আমি হে প্রকৃতি দেবি
যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবেক তাহা,
একদিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়।
এ যে সুখময় আশা দিয়াছ হৃদয়ে
ইহার সঙ্গীত, দেবি, শুনিতে শুনিতে
পারিব হরষ চিতে ত্যজিতে জীবন।"
সমস্ত ধরার তরে নয়নের জল
বৃদ্ধ সে কবির নেত্র করিল পূর্ণিত!
যথা সে হিমাদ্রি হোতে ঝরিয়া ঝরিয়া
কত নদী শত দেশ করে গো উর্ব্বরা।
উচ্ছ্বসিত করি দিয়া কবির হৃদয়

সমস্ত পৃথিবীময় পোড়েছে ছড়ায়ে
অসীম করুণা সিন্ধু। মিলি তাঁর সাথে
জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী ভারতী
কাঁদিলেন আর্দ্র হোয়ে পৃথিবীর দুখে
[ব্যাধশরে] নিপতিত পক্ষীর মরণে
[বাল্মীকির সা]থে যিনি করেন রোদন
[কবির প্রাচীন নেত্রে] প্রকৃতির শোভা
[এখনও কিছুমাত্র হয়]নি পুরাণো। ৩১.১

... ...

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 60/৩১খ]

... ...

[একদিন হি]মাদ্রির নিশীথ বায়ুতে
[কবি]র অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া।
হিমাদ্রি হইল তার সমাধি মন্দির,
একটি মানুষ সেথা ফেলেনি নিশ্বাস,
প্রত্যহ প্রভাত শুধু শিশিরাশ্রু জলে
[হ]রিত পল্লব সেথা করিত প্লাবিত
শুধু সে বনের মাঝে বনের বাতাস
হু হু করি মাঝে ২ ফেলিত নিশ্বাস।
সমাধি উপরে তার তরুলতা কুল
প্রতিদিন বরষিত কত শত ফুল
কাছে বসি বিহগেরা গাইত গো গান
তটিনী তাহার সাথে মিশাইত তান!

কবির অন্তিমশয্যা-শিয়রের কাছে
কানন স্রজিত হল লতা গুল্ম গাছে !
আজিও তটিনী সেথা যায় গো বহিয়া
বাতাস কত কি কথা যায় গো কহিয়া।

শনিবার
অগ্রহায়ণ
১৮৭৭

১২ই কার্তিক
শনিবার
৪ দিন লিখি নাই।

পাষাণ হৃদয়ে কেন সঁপিনু হৃদয় ?
মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায়, ফিরেও যে নাহি চায়
বুক ফেটে গেলেও যে কথা নাহি কয়
প্রাণ দিয়ে সাধিলেও, পায়ে ধরে কাঁদিলেও
এক তিল এক বিন্দু দয়া নাহি হয়
হেরিলে গো অশ্রুরাশি, বরষে ঘৃণার হাসি,
বিরক্তির তিরষ্কার তীব্র বিষময়।
এত যদি ছিল মনে, তবে বল কি কারণে
একদিন তুলেছিল স্বর্গের আলয়
একদিন স্নেহভরে, মাথা রাখি কোল পরে
কেন নিয়েছিল হরে পরাণ হৃদয়
ভগ্নবুকে কেন আর, বজ্র হানে বার বার
মনখানা নিয়ে যেন করে ছেলেখেলা—
গিয়াছে যা ভেঙেচূরে, আর কেন তার পরে
মিছামিছি বিঁধে আহা বাণ বিষময় ! ৩২.২

—॥—

ভেবেছি কাহারো সাথে মিশিবনা আর
কারো কাছে বর্ষিব না অশ্রু বারি ধার।
মানুষ পরের দুখে, করে শুধু উপহাস
জেনেছি, দেখেছি তাহা শত শত বার
যাহাদের মুখ আহা একটু মলিন হোলে
যন্ত্রণায় ফেটে যায় হৃদয় আমার
তারাই—২ যদি এত গো নিষ্ঠুর হোল
তবে আমি হতভাগ্য কি করিব আর!
সত্য তুমি হও সাক্ষী, ধর্ম্ম তুমি জেনো' ইহা
ঈশ্বর! তুমিই শুন প্রতিজ্ঞা আমার।
যার তরে কেঁদে মরি, সেই যদি উপহাসে
তবে মানুষের সাথে মিশিব না আর।

—॥—

হারে বিধি কি দারুণ অদৃষ্ট আমার
যারে যত ভালবাসি, যার তরে কাঁদে প্রাণ
হৃদয়ে আঘাত দেয় সেই বারে বার—
যারে আমি বন্ধু বলি, করিয়াছি আলিঙ্গন
সেই এ হৃদয় করিয়াছে চূরমার
যারেই বেসেছি ভাল, সেই চিরকাল তরে
পৃথিবীর কাছে দুঃখ পেয়েছে অপার।
হান বিধি হান বজ্র, আমার এ ভগ্নহৃদে
তিলেক বাঁচিতে নাই বাসনা আমার
প্রস্তরে গঠিত এই, হৃদয় বিহীন ধরা
হেথা কত কাল বল বেঁচে রব আর

—॥—

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 61/৩২ক]

ফুরালো দুদিন

কেহ নাহি জানে এই দুইটি দিবসে
কি বিপ্লব বাধিয়াছে একটি হৃদয়ে।
দুইটি দিবস
চিরজীবনের স্রোত দিয়াছে ফিরায়ে —
এই দুই দিবসের পদচিহ্ন[৩২.১] গুলি
শত বরষের শিরে রহিবে অঙ্কিত।
এই দুই দিবসের হাসি অশ্রু মিলি
হৃদয়ে স্থাপিবে চির বসন্ত বরষা

—॥—

এই যে ফিরানু মুখ—চলিনু পূরবে
আর কি গো এ জীবনে ফিরে আসা হবে?
কত মুখ দেখিয়াছি—দেখিব না আর—
ঘটনা ঘটিবে শত—বরষ ২ কত
জীবনের পর দিয়া হোয়ে যাবে পার—
হয় তো গো একদিন অতি দূরদেশে
আসিয়াছে সন্ধ্যা হোয়ে, বাতাস যেতেছে বোয়ে
একেলা নদীর তীরে রহিয়াছি বোসে ঃ
হু হু কোরে উঠিবেক সহসা এ হিয়া —
সহসা এ মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উজলিয়া
একটি অস্ফুট রেখা, সহসা দিবেক দেখা
একটি মুখের ছবি উঠিবে জাগিয়া—
একটি গানের ছত্র পরিবেক মনে
দুয়েকটি সুর তার উদিবে স্মরণে!
অবশেষে একেবারে সহসা সবলে
বিস্মৃতির বাঁধগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া ফেলি

সেদিনের কথাগুলি বন্যার মতন
একেবারে বিপ্লাবিয়া ফেলিবে এ মন !

—॥—

পাষাণ মানব মনে সহিবে সকলি
ভূলিব—যতই যাবে বর্ষ বর্ষ চলি—
কিন্তু আহা দুদিনের তরে হেথা এনু
একটি কোমল হৃদি ভেঙ্গে রেখে গেনু !
তার সেই মুখখানি—কাঁদো কাঁদো মুখ
এলানো কুন্তল জাল ছাইয়াছে বুক
বাষ্পময় আঁখি দুটি—অনিমেষ আছে ফুটি
আমারি মুখের পানে অঞ্চল লুটিছে
থেকে ২ উচ্ছ্বসিয়া কাঁদিয়া উঠিছে
সেই সে মুখানি আহা করুণ মুখানি
সুকুমার কুসুমটি জীবন আমার
বুক চিরে হৃদয়ের হৃদয় মাঝার
শত বর্ষ রাখি যদি দিবস রজনী
মেটেনা ২ তবু তিয়াষ আমার
শত ফুলদলে গড়া সেই মুখ তার
স্বপনেতে প্রতি নিশি—হৃদয়ে উদিবে আসি
এলানো কুন্তল পাশে আকুল নয়নে !
সেই মুখ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে
নিশীথের অন্ধকার আকাশের পটে
নক্ষত্র তারার মাঝে উঠিবেক ফুটে
ধীরে ধীরে রেখা ২ সেই মুখ তার—
নিঃশব্দে মুখের পানে চাহিয়া আমার !
চমকি উঠিব জাগি শুনি ঘুমঘোরে
"গেলে সখা ? গেলে ?" সেই ভাঙ্গা ২ স্বরে !

সাহারার অগ্নিশ্বাস একটি পবনোচ্ছ্বাস
স্নিগ্ধচ্ছায়া সুকুমার ফুলবন পরে
বহিয়া গেলাম চলি মুহূর্ত্তের তরে
কোমলা যুঁথীর এক পাপড়ি খসিল
ম্রিয়মান[৩২.২] বৃন্ত তার নোয়ায়ে পড়িল

—॥—

ফুরালো দুদিন
শরতে যে শাখা[৩২.৩] হোতে ঝোরেছে পল্লব
এ দুদিনে সে শাখা উঠেনি মুকুলিয়া
অচল [শিখর 'পরি] যে তুষার ছিল পড়ি
[এ দু-দিনে কণা তার] যায়নি গলিয়া।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 62/৩২খ]

কিন্তু এ দুদিন মাঝে একটি পরাণে
কি বিপ্লব বাধিয়াছে কেহ নাহি জানে
ক্ষুদ্র এ দুদিন তার শত বাহু দিয়া
চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া !
দুদিনের পদচিহ্ন[৩২.৪] চিরকাল তরে
অঙ্কিত রহিবে শত বরষের শিরে

—॥—

কি হোল আমার ? বুঝিবা স্বজনি
হৃদয় হারিয়েছি—
প্রভাত কিরণে সকাল বেলাতে
মন লোয়ে সখি গেছিনু খেলাতে

মন কুড়াইতে মন ছড়াইতে
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে
মন ফুল দলি চলি বেড়াইতে
সহসা স্বজনি, চেতনা পাইয়া
সহসা স্বজনি দেখিনু চাহিয়া
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় হারিয়েছি !
পথের মাঝেতে খেলাতে খেলাতে
হৃদয় হারিয়েছি

যদি কেহ সখি দলিয়া যায় ?
তার পর দিয়া চলিয়া যায় ?
শুকায়ে পড়িবে ছিঁড়িয়া পড়িবে
দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে
যদি কেহ সখি দলিয়া যায় ?
আমার কুসুম-কোমল হৃদয়
কখনো সহেনি রবির কর
আমার মনের কামিনী পাপড়ি
সহেনি ভ্রমর চরণ-ভর —
চিরদিন সখি হাসিত খেলিত
জোছনা আলোয় নয়ন মেলিত[৩২.৭]
... ...

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 63/৩৩ক]

গভীর রজনী—নীরব ধরণী ।
মুমূর্ষু পিতার কাছে—
বিজন আলয়ে—আঁধার হৃদয়ে
বালক দাঁড়ায়ে আছে ।

বীরের হৃদয়ে ছুরিকা বিঁধানো।
শোণিত বহিয়া যায়—
বীরের বিবর্ণ মুখের মাঝারে
রোষের অনল ভায়।
পোড়েছে দীপের অফুট আলোক
আঁধার মুখের পরে—
সে মুখের পানে চাহিয়া বালক
দাঁড়ায়ে ভাবনা ভরে।
দেখিছে—পিতার নীরব অধরে
যেন অভিশাপ লিখা—
স্ফুরিছে আঁধার নয়ন হইতে
হিংসার অনল শিখা!
ঘুম হোতে যেন চমকি উঠিল
সহসা নীরব ঘর
মুমূর্ষু কহিলা বালকে চাহিয়া
সুধীর গভীর স্বর।
"শোন্ তবে বৎস—অধিক কি কব—
আসিছে মরণ বেলা—
এই শোণিতের প্রতিশোধ নিতে
করিস্‌নে অবহেলা—"
এতেক বলিয়া টানি উপাড়িলা
ছুরিকা হৃদয় হোতে
ঝলকে ঝলকে উচ্ছ্বাসে অমনি
শোণিত বহিল স্রোতে।—
কহিলা— "এই নে— এই নে ছুরিকা—
তাহার উরস পরে—
যতদিন ইহা ঘুমাতে না পায়
থাকে যেন তোর করে,

হা হা—ক্ষত্রদেব কি পাপ কোরেছি
এ তাপ সহিনু কাহে—
ঘুমাতে ঘুমাতে শয্যায় পড়িয়া
মরিতে হইল যাহে।

কুমার— কুমার— এই নে— এই নে
পিতার কৃপাণ তোর
এর অপমান করিস্‌নে যেন
এই শেষ কথা মোর।"

নয়নে জ্বলিল দ্বিগুণ আগুণ
কথা হোয়ে গেল রোধ
শোণিতে লিখিলা ভূমির উপরে
"প্রতিশোধ"— "প্রতিশোধ—"

পিতার চরণ [পরশ করিয়া]
ছুঁইয়া কৃপাণখানি
আকাশের পানে চাহিয়া কুমার
কহিলা প্রতিজ্ঞা বাণী

"ছুঁইনু কৃপাণ— প্রতিজ্ঞা করিনু
শুন ক্ষত্র-কুল প্রভু
এর প্রতিশোধ—তুলিব—তুলিব—
অন্যথা নহিবে কভু।

সেই বুক ছাড়া এ ছুরিকা আর
কোথা না বিশ্রাম পাবে
তার রক্ত ছাড়া এই ছুরিকার
তৃষা কভু নাহি যাবে।"

রাখিলা শোণিতে মাখা সে ছুরিকা
বুকের বসনে ঢাকি।

ক্রমে মুমূর্ষুর ফুরাইল প্রাণ
মুদিয়া আইল আঁখি !

—॥—

ভ্রমিছে কুমার— প্রতি দেশে দেশে
ঘুচাতে প্রতিজ্ঞা-ভার
দেশে দেশে— ভ্রমি তবুও ত আজি
পেলেনা সন্ধান তার।
এখনো সে বুকে রোয়েছে ছুরিকা
প্রতিজ্ঞা জ্বলিছে প্রাণে
এখনো পিতার শেষ কথাগুলি
বাজিছে যেন সে কানে।
"কোথা যাও যুবা যেওনা যেওনা
গহন কানন ঘোর—
সাঁঝের আঁধার ঢাকিছে ধরণী
এসগো কুটীরে মোর !"

"ক্ষমগো আমারে কুটীর স্বামী—
বিরাম আলয় চাইনা আমি
যে কাজের তরে ছেড়েছি আলয়
সে কাজ পালিব আগে।"
"শুনগো পথিক যেওনাকো আর
অতিথির তরে মুক্ত এ দুয়ার
দেখেছ চাহিয়া ছেয়েছে জলদ
পশ্চিম গগন ভাগে !"
কতনা ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে
মাথার উপর দিয়া
প্রতিজ্ঞা পালিতে চলেছে তবুও
যুবক নির্ভীক হিয়া।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 64/৩৩খ]

[চলেছে গহন গিরি নদী মরু]
[কোন বাধা] নাহি মানি
বুকেতে রয়েছে ছুরিকা লুকানো
হৃদয়ে প্রতিজ্ঞাবাণী !
"গভীর আঁধারে নাহি পাই পথ
শুনগো কুটীর স্বামী
খুলে দাও দ্বার দাও গো আশ্রয়
এসেছি অতিথি আমি !"
ধীরে ধীরে ধীরে খুলিল দুয়ার
পথিক দেখিল চেয়ে
করুণার যেন প্রতিমার মত
একটি রূপসী মেয়ে।
এলোথেলো চুলে বনফুলমালা
দেহে এলোথেলো বাস—
নয়নে করুণা—অধরে মাখানো
কোমল সরল হাস।
বালিকার পিতা রয়েছে বসিয়া
পরণ আসন পরি,
সম্ভ্রমে আসন দিলেন পাতিয়া
পথিকে যতন করি।
দিবসের পর যেতেছে দিবস
যেতেছে বরষ মাস—
আজিও কেন সে কানন কুটীরে
পথিক করিছে বাস ?
কি কর যুবক— ছাড় এ কুটীর
সময় যেতেছে চলি

যে কাজের তরে ছেড়েছ আলয়
সে কাজ যেওনা ভূলি !
বালিকার সাথে বেড়ায় পথিক
বন-নদী-তীর পানে
প্রেম গান গাহি— প্রেমের প্রলাপ
কহি তার কানে কানে ।
কহিত তাহারে সমর-কাহিনী
সভয়ে শুনিত বালা
কাহিনী ফুরালে যতন করিয়া
গলায় পরাত মালা ।
দিবসের পর যেতেছে দিবস
যেতেছে বরষ মাস
যুবার হৃদয়ে জড়ায়ে পড়িছে
ক্রমেই প্রণয়-পাশ ।
ক্রমশঃ যুবার ছুরিকা হইতে
রক্ত চিহ্ন[৩৩.১] গেল ঘুচি
শোণিতে লিখিত প্রতিজ্ঞা আখর
মন হোতে গেল মুছি ।

—॥—

মালতী বালার সাথে কুমারের
আজিকে বিবাহ হবে—
কানন আজিকে হতেছে ধ্বনিত
সুখের হরষ রবে ।
মালতীর পিতা প্রতাপের দ্বারে
কাননবাসীরা যত
গাইছে নাচিছে হরষে সকল
যুবক রমণী শত ।

কেহ বা গাঁথিছে ফুলের মালিকা
গাহিছে বনের গান
মালতীরে কেহ ফুলের ভূষণ
উপহার করে দান।
ফুলে ফুলে কিবা সেজেছে মালতি
এলায়ে কুন্তল রাশি
সুখের আভায় উজলে নয়ন
অধরে সুখের হাসি!
আইল কুমার বিবাহ সভায়
মালতীরে লয়ে সাথে
মালতীর হাত লইয়া প্রতাপ—
সঁপিল যুবার হাতে।
ওকি ও— ওকি ও— সহসা প্রতাপ—
বসনে নয়ন চাপি
মূরছি পড়িল ভূমির উপরে
থর থর করি কাঁপি
মালতী বালিকা পড়িল সহসা
মূরছি কাতর রবে!
বিবাহ সভায় যত ছিল লোক
ভয়ে পলাইল সবে!
সভয়ে কুমার চাহিয়া দেখিল
জনকের উপছায়া—
আগুনের মত আঁখি দু'টা জ্বলে
শোণিতে মাখান কায়া।
কি কথা বলিতে চাহিল কুমার
ভয়ে হোল কথা রোধ—
জলদ-গভীর স্বরে কে কহিল
"প্রতিশোধ— প্রতিশোধ!—"

"হারে কুলাঙ্গার—কি কাজ করিলি
প্রতিজ্ঞা ভূলিলি নাকি ?
কার দুহিতারে করিস্ বিবাহ
আজিকে জানিস্ তা কি ?
ক্ষত্র ধর্ম্ম যদি প্রতিজ্ঞা পালন
হয়—কুলাঙ্গার—তবে
এ চরণ ছুঁয়ে যে আজ্ঞা লইলি
সে আজ্ঞা পালিতে হবে।
নহিলে যদিন রহিবি বাঁচিয়া
দহিবে এ মোর ক্রোধ।"
নীরব সে গৃহে ধ্বনিল আবার
"প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—"

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 65/৩৪ক]

[বুে] কর বসন হইতে কুমার
ছুরিকা লইল খুলি
ধীরে প্রতাপের বুকের উপরে
সে ছুরি ধরিল তুলি—
অধীর হৃদয় পাগলের মত
থর থর কাঁপে পাণি—
কত বার ছুরি ধরিল সে বুকে
কত বার নিল টানি।
মাথার ভিতর ঘুরিতে লাগিল
আঁধার হইল বোধ—

নীরব সে গৃহে ধ্বনিল আবার
"প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!"
ক্রমশঃ চেতন পাইল প্রতাপ
মালতী উঠিল জাগি
চারিদিকে চেয়ে বুঝিতে নারিল
এ সব কিসের লাগি।

কুমার তখন কহিলা সুধীরে
চাহি প্রতাপের মুখে—
প্রতি কথা তার অনলের মত
লাগিল তাহার বুকে।—
"একদা গভীর বরষা নিশীথে
নাই জাগি জনপ্রাণী
সহসা সভয়ে জাগিয়া উঠিনু
শুনিয়া কাতর বাণী—
চাহি চারিদিকে দেখিনু বিস্ময়ে ৩৪.১
পিতার হৃদয় হোতে—
শোণিত বহিছে—শয়ন তাঁহার
ভাসিছে শোণিত স্রোতে।
কহিলেন পিতা—"অধিক কি কব
আসিছে মরণ বেলা
এই শোণিতের প্রতিশোধ নিতে
করিস্‌নে অবহেলা।"
হৃদয় হইতে টানিয়া ছুরিকা
দিলেন আমার হাতে—
সে অবধি সেই বিষম ছুরিকা
রাখিয়াছি সাথে সাথে—

করিনু প্রতিজ্ঞা ছুঁইয়া কৃপাণ
"শুন ক্ষত্রকুল প্রভু—
এর প্রতিশোধ তুলিব—তুলিব
অন্যথা নহিবে কভু !"
কি তাহার নাম—জানিতাম নাকো
ভ্রমিনু সকল গ্রাম—"
অধীরে প্রতাপ উঠিল কহিয়া
"প্রতাপ তাহার নাম !
এখনি—এখনি—ওই ছুরি তব—
বসাইয়া দেও বুকে—
যে জ্বালা হেথায় জ্বলিছে—কেমনে
কব তাহা একমুখে।
নি[ভাও সে] জ্বালা—নি[ভাও সে জ্বালা]
দাও তার প্রতিফল
মৃত্যু ছাড়া এই হৃদি-অনলের
নাই আর কোন জল !"
কাঁদিয়া উঠিল মালতী—কহিল
পিতার চরণ ধোরে—
"ও কথা—বোলোনা—বোলোনা গো পিতা
যেওনা ছাড়িয়া মোরে !—
কুমার—কুমার—শুন মোর কথা
এক ভিক্ষা শুধু মাগি—
রাখ মোর কথা—ক্ষমহ পিতারে
দুখিনী আমার লাগি !
শোণিত নহিলে ও ছুরির তব
পিপাসা না মিটে যদি—
তবে এই বুকে দেহ গো বিঁধায়ে
এই পেতে দিনু হৃদি !"

আকাশের পানে চাহিয়া কুমার
কহিল কাতর স্বরে—
"ক্ষমা কর পিতা পারিব না আমি
কহিতেছি সকাতরে ।—
অতি নিদারুণ অনুতাপ-শিখা
দহিছে যে হৃদিতল
সে হৃদয় মাঝে ছুরিকা বসায়ে
বলগো কি হবে ফল ?
অনুতাপী জনে ক্ষমা কর পিতা
রাখ এই অনুরোধ"—
নীরব সে গৃহ ধ্বনিল আবার
"প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—"
হৃদয়ের প্রতি শিরা উপশিরা
কাঁপিয়া উঠিল হেন—
সবলে ছুরিকা ধরিল কুমার
পাগলের মত যেন ।
প্রতাপের সেই অবারিত বুকে
ছুরি বিঁধাইলা বলে—
মালতী বালিকা মূৰ্চ্ছিয়া পড়িল
কুমারের পদতলে ।
উন্মত্ত হৃদয়ে জ্বলন্ত নয়নে
বদ্ধ করি হস্তমুঠি—
কুটীর হইতে পাগল কুমার
বাহিরেতে গেল ছুটি ।
এখনো কুমার সেই বনমাঝে
পাগল হইয়া ভ্রমে
মালতী বালার চিরমূৰ্চ্ছা আর
ভাঙ্গিল না, এ জনমে—

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 66/৩৪খ]

সাধিনু কাঁদিনু কত না করিনু
ধন মান যশ সকলি ধরিনু
চরণের তলে তার—
এত করি তবু পেলেমনা মন
ক্ষুদ্র এক বালিকার ?
না যদি পেলেম নাইবা পাইনু—
চাইনা ২ তারে
কি ছার সে বালা—তার তরে যদি
সহে তিল দুখ এ পুরুষ-হৃদি
তাহোলে পাষাণ ফেলিবে শোণিত
ফুলের কাঁটার ধারে—
এ কুমতি কেন হোয়েছিল বিধি
তারে সঁপিবারে গিয়েছিনু হৃদি—
এ নয়নজল ফেলিতে হইল
তাহার চরণ-তলে ?
বিষাদের শ্বাস ফেলিনু—মজিয়া
তাহার কুহক-বলে ?
এত আঁখিজল—হইল বিফল ?
বালিকা হৃদয় করিব যে জয়
নাই হেন মোর গুণ ?
হীন রণধীরে ভালবাসে বালা
তার গলে দিবে পরিণয় মালা ?
এ কি লাজ নিদারুণ ?
হেন অপমান নারিব সহিতে
ঈর্ষ্যার আগুন নারিব বহিতে—
ঈর্ষ্যা ? কারে ঈর্ষ্যা ? হীন রণধীরে—
ঈর্ষ্যার ভাজন সেও হোল কি রে ?

ঈর্ষ্যা-যোগ্য সে-কি মোর ?
তবে শুন আজি শ্মশান-কালিকা
শুন এ প্রতিজ্ঞা ঘোর !
আজ হোতে মোর রণধীর অরি—
শত নৃকপাল তার রক্তে ভরি
করাবো তোমারে পান
এ বিবাহ কভু দিব না ঘটিতে
এ দেহে রহিতে প্রাণ !
তবে নমি তোমা শ্মশান কালিকা
শোণিত-লুলিতা-কপাল মালিকা—
কর এই বর দান
তাহারি শোণিতে মিটায় গো তৃষা
যেন মোর এ কৃপাণ !”
কহিতে কহিতে—বিজন নিশীথে—
শুনিল বিজয়—সুদূর হইতে
শত শত অট্টহাসি
একেবারে যেন উঠিল ধ্বনিয়া
শ্মশান-শান্তিরে নাশি
শত শত শিবা উঠিল কাঁদিয়া—
কি জানি কিসের লাগি
কুস্বপ্ন দেখিয়া শ্মশান যেন রে—
কাঁদিয়া উঠিল জাগি !
শতেক আলেয়া উঠিল জ্বলিয়া
আঁধার হাসিল দশন মেলিয়া—
আবার যাইল মিশি—
সহসা থামিল অট্টহাসি ধ্বনি
শিবার রোদন থামিল অমনি
আবার ভীষণ—সুগভীরতর

নীরব হইল নিশি—
দেবীর সন্তোষ বুঝিয়া বিজয়
নমিল চরণে তাঁর—
মুখ নিদারুণ—আঁখি রোষারুণ
হৃদয়ে জ্বলিছে রোষের আগুন
করে অসি খরধার।

—॥—

গিরি অধিপতি রণধীর সাথে
লীলার বিবাহ হবে
হরষে রয়েছে আমোদে মাতিয়া
গিরিবাসীগণ ৩৪.২ সবে।
অস্ত গেল রবি—পশ্চিম শিখরে—
আইল গোধূলী ৩৪.৩ কাল—
ধীরে ধরণীরে ফেলিল আবরি
ক্রমশঃ আঁধার জাল।
ওই আসিতেছে লীলার শিবিকা
নৃপতি-ভবন পানে
শত অনুচর চলিয়াছে সাথে
মাতিয়া হরষ গানে—
জ্বলিছে আলোক—বাজিছে বাজনা
ধ্বনিতেছে দশ দিশি—
ক্রমশঃ আঁধার হইল নিবীড় ৩৪.৪
গভীর হইল নিশি।
চলেছে শিবিকা গিরিপথ দিয়া
সাবধানে অতিশয়
বনমাঝ দিয়া গিয়াছে সে পথ
বড় সে সুগম নয়।

অনুচরগণ হরষে মাতিয়া
গাইছে হরষ গীত
সে হরষধ্বনি—জনকোলাহল
ধ্বনিতেছে চারিভিত।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 67/৩৫ক]

আসে সন্ধ্যা হোয়ে আঁধার আলয়ে—একেলা রোয়েছি বোসি—
শ্রম হোতে সবে আসিয়াছে ফিরে—জ্বলিল প্রদীপ কুটীরে ২—
শ্রান্ত মাথা রাখি বাতায়ন দ্বারে—নীরব প্রান্তরে চেয়ে আছি হারে
আকাশে উঠিছে শশি। ৩৫.১
কত দিন আর রহিব এমন—মরণ হইলে বাঁচি যে এখন—
অবশ হৃদয় দেহ দুরবল—শুকায়ে গিয়াছে নয়নের জল
যেতেছে দিবস নিশি
কোথা গো ৩৫.২

—॥—

অদিতি ভবন হইতে যখন—আসিতেছিলাম অলকাপুরে
মাথার উপরে সাঁঝের গগন—শরৎ-তটিনী বহিছে দূরে
সাঁজের কনক বরণ সাগর—অলসভাবে সে ঘুমায়ে আছে
দেখিনু দারুণ বাধিয়াছে রণ—গৌরীশেখর গিরির কাছে—
দেখিনু সহসা বীর একজন—সমর সাগরে গিরির মতন
পদতলে আসি আঘাতে লহরী—তবুও অটল [পারা]
বিশাল ললাটে ভ্রূভঙ্গীটি নাই—শান্ত ভাব জাগে নয়নে সদাই
উরস বরমে বরষার মত—ঠেকিছে বাণের ধারা ?
অশনি বরষী ঝটিকার মেঘে—দেখেছি ত্রিদশ পতি—
চারিদিকে সব ছুটিছে ভাঙ্গিছে—তিনি সে মহান্ অতি—
এমন উদার শান্ত মুখভাব—দেখেনি তাঁহারো কভু
পৃথিবী বিনত যাঁহার অসিতে—স্বরগ যেজন পারেন শাসিতে

দুরবল এই নারী-হৃদয়ের   করিনু তাঁহারে প্রভু—
দিলাম বিছায়ে দিব্য পাখা-ছায়া   মাথার উপরে তাঁর
মায়া দিয়া তাঁরে রাখিনু আবরি—নাশিতে বাণের ধার—
প্রতি পদে পদে গেনু সাথে সাথে—দেখিনু সমর ঘোর—
শোণিত হেরিয়া শিহরি উঠিতে, লাগিল হৃদয় মোর—
থামিল সমর—জয়ী বীর মোর—উঠিলা তরণী পরে—
বহিল মৃদুল পবন তরণী—চলিল গরব ভরে—
গেল কতদিন, পূ[রব গগনে]—উঠিল জলদ-রেখা—
মৃদুল ঝলকি ক্ষীণ সুদামিনী—দূর হোতে দিল দেখা
ক্রমশঃ জলদ ছাইল আকাশ   অশনি সরোষে জ্বলি—
মাথার উপর দিয়া তরণীর, অভিশাপ গেল বলি !
নাবিকেরা সবে বিধাতারে তবে—ডাকিল কাতর স্বরে—
তরণী হইতে কোলাহলধ্বনি—উঠিল আকাশ পরে—
একটি লহরী উঠেনি সাগরে—একটু বহেনি বায়—
তড়িত-চরণে অশনি কেবল—দিশে দিশে দিশে ধায়—

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা ৩৪/৩৫খ]

সহসা ভ্রূকুটী উঠিল সাগর—পবন উঠিল জাগি
শতেক উরমি নাচিয়া উঠিল   সহসা কিসের লাগি ।
সাগরের অতি দুরন্ত শিশুরা   কহিয়া অস্ফুট বাণী
উলটি পালটি খেলিতে লাগিল   লইয়া তরণী খানি
দারুণ উল্লাসে সফেন সাগর—অধীর হইল হেন
প্রলয় কালের মহেশের মত   নাচিতে লাগিল যেন ।
তরণীর পরে একেলা অটল—দাঁড়ায়ে বীর আমার
শুনি ঝটিকার প্রলয়ের গীত   বাজিছে হৃদয় তাঁর
দেখিতে ২ ডুবিল তরণী—ডুবিল নাবিক যত—
যুঝি ২ বীর সাগরের সাথে—হইলেন জ্ঞান হত ।

আকাশ হইতে নামিনু তখন—ছুঁইনু সাগর জল
উরমিরা আসি খেলিতে লাগিল—চুমিয়া চরণ তল !
কেশ-পাশ লোয়ে খেলিল পবন—বারণ নাহিক মানে
ধীরে ২ তবে গাহিতে লাগিনু—পাগল-সাগর কানে।

—॥—

কেন গো সাগর, এমন চপল—এমন অধীর প্রাণ ?
শুনগো আমার গান—তবে—শুনগো আমার গান ?
পূরণিমা নিশি আসিবে যখন—আসিবে যখন ফিরে—
(তার) মেঘের ঘোমটা সরায়ে দিব গো—সরায়ে দিব গো ধীরে
প্রতি হাসি তার পড়িবে তোমার বিশাল হৃদয় পরে—
(সুখে) কতনা উরমি জাগিবে তখন—জাগিবে প্রণয় ভরে—
তবে থামগো সাগর থামগো—কেন হোয়েছ অধীর প্রাণ
প্রতি উরমিরে করিব তোমার—তারার খেলেনা দান !
দিকবালাদের বলিয়া দিব—আঁকিবে তাহারা বসি—
প্রতি উরমির মাথায় মাথায়—একটি একটি শশি ![৩৭.৩]
(আমি) তটিনী-বালারে দিব গো শিখায়ে—না হবে তাহার আন—
(তারা) গাইবে প্রেমের গান
তারা কানন হইতে আনি ফুলরাশি, করিবে তোমারে দান
তারা হৃদয় হইতে শত প্রেমধারা করাবে তোমারে পান—
তবে থামগো সাগর থামগো—কেন হোয়েছ, অধীর প্রাণ
যদি উরমি শিশুরা নীরব নিশীথে—ঘুমাতে নাহিক চায়—
তবে জানিও সাগর, বোলে দিব আমি—আসিবে মৃদুল বায়—
কানন হইতে করিয়া তাহারা—ফুলের সুরভি পান
কানে কানে ধীরে গাহিয়া যাইবে—ঘুম পাড়াবার গান
দেখিতে ২ ঘুমায়ে পড়িবে—তোমার বিশাল বুকে—
প্রতি উরমিরা দেখিবে তখন—চাঁদের স্বপন সুখে

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 6৮/৩৬ক]

গা সখি গাইলি যদি আবার সে গান, রে—
কত দিন শুনি নাই ও পুরানো তান।
কখনো কখনো যবে নীরব নিশীথে
একাকী রয়েছি বসি চিন্তামগ্ন চিতে—
চমকি উঠিত প্রাণ—কে যেন গায় সে গান
দুই একটি কথা তার পেলেম শুনিতে।—
হা হা সখি—সেদিনের সব কথাগুলি—
প্রাণের ভিতরে যেন উঠিছে আকুলি
যে দিন মরিব সখি, গাস্‌ ওই গান
শুনিতে শুনিতে যেন যায় এই প্রাণ রে—

—॥—

সেই যদি সেই যদি—ভাঙ্গিল এ পোড়া হৃদি—
সেই যদি ছাড়াছাড়ি হোল দুজনায়—
একবার এস কাছে—কি তাহাতে দোষ আছে
জন্মশোধ দেখে নিয়ে লইব বিদায়!
সেই গান একবার—গাও সখি—শুনি
যেই গান একসনে—গাহিতাম দুইজনে—
গাহিতে গাহিতে শেষে পোহাতো যামিনী—
কত ভাল বাসিতাম—শুনিতে সে গান—
একেলা মরমে মোরে—রহিবো বিদেশে পোড়ে
ওই গান গেয়ে গেয়ে কাটাব পরাণ!
চলিনু—চলিনু তবে—এ জন্মে কি দেখা হবে?
এ জন্মের সুখ তবে হোল অবসান?
তবে সখি এস কাছে কি তাহাতে দোষ আছে?
আর বার গাও সখি পুরাণো সে গান!

———

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 70/৬৮খ]

ভাল যদি বাস সখি কি দিব গো আর
কবির হৃদয় এই দিব উপহার—
এত ভালবাসা সখি—কোন্ হৃদে বল দেখি
কোন্ হৃদে ফুটে এত ভাবের কুসুম ভার।
তা হোলে এ হৃদি ধামে—তোমারি—তোমারি নামে
বাজিবে মধুর স্বরে হৃদয় বীণার তার
যা কিছু গাইব গান—ধ্বনিবে তোমারি নাম
কি আছে কবির বল কি তোমারে দিব আর ?

—॥—

ওই কথা বল সখা বল আর বার।
ভাল বাসো মোরে তাহা বল বার বার।
কতবার শুনিয়াছি—তবু গো আবার যাচি
ভাল বাসো মোরে তাহা বলগো আবার !

—॥—

ও কথা বোলনা সখি—প্রাণে লাগে ব্যথা—
আমি ভালবাসি নাকো এ কিরূপ কথা !
কি জানি কি মোর দশা কহিব কেমনে
প্রকাশ করিতে নারি রয়েছে যা মনে—
পৃথিবী আমারে সখি চিনিলনা তাই—
পৃথিবী না চিনে মোরে তাহে ক্ষতি নাই—
তুমিও কি বুঝিলে না এ মর্ম্ম কাহিনী
তুমিও কি চিনিলে না আমারে স্বজনি ?

—॥—

কত দিন এক সাথে ছিনু ঘুমঘোরে
তবু জানিতাম নাকো ভালবাসি তোরে—
মনে আছে কত খেলা—খেলিতাম ছেলেবেলা—
ফুল তুলিতাম মোরা দুইটি আঁচল ভোরে।

যতদিন ছিনু সুখে—দুই জনে বুকে বুকে
জানিতাম নাকো আমি ভালবাসি তোরে।
অবশেষে এ কপাল ভাঙ্গিল যখন
ছেলেবেলাকার যত ফুরাল স্বপন—
লইয়া দলিত মন হইনু প্রবাসী
তখন জানিনু সখি তোরে ভালবাসি।

—॥—

কি হবে বল গো সখি ভালবাসি অভাগারে
যদি ভালবেসে থাক ভূলে যাও একেবারে—
একদিন এ হৃদয়—আছিল কুসুমময়
চরাচর পূর্ণ ছিল সুখের অমৃত ধারে
সেদিন গিয়েছে সখি আর কিছু নাই
ভেঙ্গে পুড়ে সব যেন হোয়ে গেছে ছাই
হৃদয় কবরে শুধু মৃত ঘটনার
·· [র]য়েছে পোড়ে স্মৃতি নাম যার।৩৬.১

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 7] /৩৭ক]

এ হতভাগারে ভাল কে বাসিতে চায়?
সুখ আশা থাকে যদি বেসো না আমায়!
এ জীবন, অভাগার—নয়ন সলিলধার
বল সখি কে সহিতে পারিবে তা হায়!
এ ভগ্ন প্রাণের অতি বিষাদের গান
বল সখি কে শুনিতে পারে সারা প্রাণ
গেছি ভূলে ভালবাসা—ছাড়িয়াছি সুখ-আশা
ভালবেসে কাজ নাই স্বজনি আমায়! ৩৭.১

জানি সখা অভাগীরে ভাল তুমি বাসনা
ছেড়েছি ছেড়েছি নাথ তব প্রেম কামনা—
এক ভিক্ষা মাগি হায়—নিরাশ কোরো না তায়
শেষ ভিক্ষা শেষ আশা—অন্তিম বাসনা—
এ জন্মের তরে সখা—আর ত হবে না দেখা
তুমি সুখে থেকো নাথ   কি কহিব আর
একবার বোসো হেথা ভাল কোরে কও কথা
যে নামে ডাকিতে সখা ডাকো একবার—
ওকি সখা কেঁদোনাকো—দুখিনীর কথা রাখো
আমি গেলে বল নাথ—কি ক্ষতি তাহার ?
যাই সখা যাই তবে—ছাড়ি তোমাদের সবে—
সময় আসিছে কাছে বিদায় বিদায়—

—॥—

কেমনে শুধিব বল তোমার এ ঋণ
এ দয়া তোমার মনে রবে চিরদিন—
যবে এ হৃদয় মাঝে ছিল না জীবন—
মনে হোত ধরা যেন মরুর মতন—
সে হৃদে ঢালিয়া তব প্রেম বারিধার
নূতন জীবন যেন করিলে সঞ্চার।
একদিন এ হৃদয়ে বাজিত প্রেমের গান
কবিতায় কবিতায় পূর্ণ যেন ছিল প্রাণ
দিনে ২ সুখ গান থেমে গেল সে হৃদয়ে
নিশীথ শ্মশান সম আছিল নীরব হোয়ে

সহসা উঠেছে বাজি তব কর পরশনে
পুরাণো সকল ভাব জাগিয়া উঠেছে মনে
বিরাজিছে এ হৃদয়ে যেন নব উষাকাল
শূন্য হৃদয়ের যত ঘুচেছে আঁধার জাল।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 72/৩৭খ]

গুহা—অন্ধকার ছাড়া ছিলনা কিছুই—
এ মহা-অতলস্পর্শ—আঁধার—গভীর—
আছিল দাঁড়ায়ে শুধু শূন্য ও নিষ্ফল !
উন্নত ঈশ্বর তবে দেখিলো চাহিয়া
এই নিরানন্দ স্থান ! দেখিলা হেথায়
অন্ধকার, বিষণ্ণ ও শূন্য মেঘরাশি
রহিয়াছে, চিরস্থির নিশীথিনী লোয়ে !

উত্থিত হইল সৃষ্টি ঈশ্বরের বাক্যে।
মহান ক্ষমতা বলে অনন্ত ঈশ্বর
প্রথমে পৃথ্বি ৩৭.২ ও স্বর্গ করিলা সৃজন।
নির্ম্মিলা আকাশ—আর এ বিস্তৃত ভূমি
সর্ব্বশক্তিমান প্রভু করিলা স্থাপন !
পৃথিবী তরুণ তৃণে ছিল না হরিৎ—
সমুদ্র চিরান্ধকারে আছিল আবৃত—
পথ ছিল সুদূর—বিস্তৃত অন্ধকার !
আদেশিলা মহাদেব জ্যোতিরা আসিতে
এ মহা আঁধার স্থানে। মুহূর্ত্তে অমনি

ইচ্ছা পূর্ণ হোল তাঁর। পবিত্র আলোক
এই মরুময় স্থানে পাইল প্রকাশ।

[পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 73/৩৮ক]

কি করিলি আশার ছলনে!
গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি
পথ হারাইলি গহনে
(ঐ) সময় চলে গেল আঁধার হয়ে এল[৩৮.১]
মেঘ ছাইল গগনে,
শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না
বিঁধিছে কণ্টক চরণে!
গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে,
এখন ফিরিব কেমনে,
পথ বলে দাও পথ বলে দাও[৩৮.২]
কে জানে কারে ডাকি সঘনে!
বন্ধু যাহারা ছিল, সকলে চলে গেল,
কে আর রহিল বিজনে,
(ওরে) জগত-সখা আছে যা'রে তাঁর কাছে,
বেলা যে যায় মিছে রোদনে!
দাঁড়ায়ে গৃহদ্বারে জননী ডাকিছে
আয়রে ধরি তাঁর চরণে
পথের ধূলি লেগে অন্ধ আঁখি তোর
মায়েরে দেখেও দেখিলিনে!

কোথা গো কোথা তুমি, জননি, কোথা তুমি,
ডাকিছ কোথা হতে এ জনে,
হাত ধরিয়ে সাথে লয়ে চল
তোমার অমৃত ভবনে।

মালতীপুঁথি : টীকা

পাণ্ডুলিপির জীর্ণতাবশত অনেক অংশ অবলুপ্ত ও অ-পাঠ্য, এখানে তা নির্দেশ করা হল এবং দুষ্পাঠ্য অংশের পাঠ যথাসম্ভব উদ্ধার করা হল।

কয়েকটি শব্দের বানানে অশুদ্ধি ও অসংগতি আছে। মুদ্রিত পাঠে সেগুলি সংশোধন করা হয় নি। টীকায় অশুদ্ধ বানানগুলি নির্দেশ করে প্রয়োজন মত মন্তব্য দেওয়া হল।

পাণ্ডুলিপির মধ্যে কাটাকুটি বিস্তর আছে। অনেক স্থলে কবি এক শব্দ বাক্য বা বাক্যাংশ বদলে অন্য শব্দ বাক্য বা বাক্যাংশ বসিয়েছেন। কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে, একটি ছত্র লিখে তাঁর পছন্দ না হওয়ায় নূতন ছত্র বা ছত্রাংশ লিখেছেন কিন্তু আগেরটি কাটেন নি, হয়তো কাটতে ভুলে গেছেন। টীকায় তারও কিছু কিছু উল্লেখ করা হল। —সম্পাদক

২.১ ম্রিয়মান। ম্রিয়মাণ হওয়া উচিত, কিন্তু পুঁথিতে 'ণ' স্থলে 'ন'ই আছে। 'ম্রিয়মান' বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে।

২.২ বধু। বধূ হওয়া উচিত। কিন্তু 'ধূ' স্থলে 'ধু' আছে।

২.৩ এর পর দু-টি ছত্র আছে। প্রথমটির তিনটি এবং দ্বিতীয়টির চারটি অক্ষর মুছে গেছে। খণ্ডিত ছত্র দুটি এইরকম :

··· যৌবনময় হৃদয়ে যাহার
··· তৃণফুল শুকায়ে নিভৃতে

২.৪ সায়াহ্নে। সায়াহ্নে হওয়া উচিত। কিন্তু 'হ্ন' স্থানে 'হ্ণ' আছে। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই হ্ন এবং হ্ণ এই দুইটি যুক্তাক্ষর সাধারণতঃ ব্যবহার করতেন না। 'হ্ণ' এই অক্ষর দিয়েই হ্+ণ এবং হ্+ন এই দুইয়ের কাজ চালাতেন।

পরিণত বয়সের পাণ্ডুলিপিতে হ্ন স্থানে হ্ণ ব্যবহারের নিদর্শন বিরল নয়। একবার এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি বর্তমান সম্পাদককে বলেছিলেন "আমি দুটি অক্ষরে একই চিহ্ন ব্যবহার করি তোমরা প্রুফে যা করার ক'রো।"

২.৫ এর পর পাঁচটি খণ্ডিত ছত্র আছে। ছত্রগুলি এইরকম :

···ভ্রষ্ট বাণবিদ্ধ হরিণী আমার
··· ···এ হৃদয় চিরকাল মত
···তোমারি কাজে রহিবে গো রত
··· ···বাজিছে যেই চিরহাসি
··· ···রিতে তাহা মেঘরাশি

এর পরেও একটি ছত্র ছিল সেটি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত।

২˙৬ 'চিহ্ন' এই বানান আছে। ২˙৪ দ্রষ্টব্য।

২˙৭ পুঁথিতে 'ভস্ম' আছে। সেই বানান রাখা হল।

২˙৮ চিতাভস্ম। ২˙৭ দ্রষ্টব্য।

২˙৯ এর পর তিনটি খণ্ডিত ছত্র :

দেবতা প্রতিমা লোয়ে গেছে···
এ দেখে কার না হবে··· ···
এ··· ··· ··· ··· ···

৩˙১ এর পর ছিল 'ধীরে ধীরে ফেলিলেন বিষণ্ণ নিশ্বাস।' এর মধ্যে 'ধীরে ধীরে ফেলিলেন বিষণ্ণ' এই অংশটি কাটা।

৩˙২ এর পর দুটি খণ্ডিত ছত্র :

···হইল মূক, শান্ত হল মৃগ
··· ··· তাহারি শাসনে

এর পরেও সম্ভবত এক ছত্র ছিল, তা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত।

৩˙৩ এর পর যে ছত্রটি লেখা হয়েছিল সেটি এই :

বদ্ধ তাঁর জটা জাল ভুজঙ্গ বন্ধনে।

পরে 'তাঁর' কেটে তোলাপাঠে 'দরশন' এবং 'জাল' কেটে তোলাপাঠে 'কলাপ' লেখা হয়েছে। 'বন্ধনে' শব্দটি কাটা হয়েছে কিন্তু তার বদলে আর কোনো শব্দ বসানো হয় নি।

৩˙৪ এর পর দু-ছত্র লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।

৩˙৫ প্রথমে লেখা হয়েছিল,—'উমাও সে পদতলে হইলেন নত' এবং 'বৃষভবাহনে করিলা প্রণাম'। শেষ পর্যন্ত 'উমাও' 'করিলা প্রণাম' এইটুকু রেখে বাকী সবটুকু কেটে দেওয়া হল। আর তোলাপাঠে যোগ ক'রে দেওয়া হল, 'যেমন তাঁরে।'

৩˙৬ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে 'নিজ' এবং 'করেছে' এই দুটি শব্দের মধ্যে দু-অক্ষরের একটি শব্দ ছাড় পড়েছিল।

৩˙৭ 'দুষ্প্রেক্ষ্য' হওয়া উচিত ছিল।

৩˙৮ প্রথমে লেখা হয়েছিল :

ক্রোধ সম্বরহ প্রভু ক্রোধ সম্বরহ।

এই ছত্রের পর

স্বর্গ হোতে দেবতারা কহিতে কহিতে

লিখে কাটা। এ-ছাড়াও এই ছত্রের উপরে ও নীচে কয়েকটি শব্দ লেখা হয়েছিল তার মধ্যে কয়েকটা কাটা হয়েছিল, কয়েকটা কাটা হয় নি। 'হেতায়' 'দেবতা' 'বাতাসে' 'চরিছে' 'সরগ' 'হোতা'— এই শব্দগুলি পাওয়া যাচ্ছে।

৩˙৯ 'ভস্ম।' ২˙৭ দ্রষ্টব্য।

৪˙১ ৪ক পৃষ্ঠার প্রথম লাইনটি খণ্ডিত। লাইনের শেষাংশ '…এই বিশ্বজগতের'। পয়ারের ছত্র। আটটি অক্ষর আছে, তাই অনুমান হয়, বিলুপ্ত অক্ষরের সংখ্যা ছয়।

৪˙২ এর পর প্রায় ন-দশটি ছত্র খণ্ডিত। তার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ছত্র আছে :— 'মুখেতে পড়েছে তার উষার কিরণ।' এই ছত্রটি দুই সারি লেখার মধ্যে লম্বালম্বিভাবে নীচের থেকে উপরের দিকে লেখা।

৪˙৩ 'কভূ'। পাণ্ডুলিপির বানান। এই ছত্রেই শুদ্ধ বানানে 'কভু' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৪˙৪ একটি বা দুটি ছত্র খণ্ডিত। 'তারকার … ছড়াইয়া' এই ছত্রের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ছত্রের শেষাংশটি পড়া যায়। সেটি এই :— '…অন্ধকার সমাধির পরে।'

৪˙৫ সায়াহ্নের। ২˙৪ দ্রষ্টব্য।

৪˙৬ এর পর কয়েক ছত্র খণ্ডিত তবে শেষাংশ পড়া যায় :

… গানের প্রতিধ্বনি পাইব শুনিতে।
… স্মৃতি এস তুমি এ ভগ্ন হৃদয়ে
[স]ায়াহ্ন রবির মৃদু শেষ রশ্মি রেথা
… … অন্ধকার মেঘে

এর পর দু-একটি লাইন সম্পূর্ণ মুছে গেছে। তার পর তিনটি লাইনের প্রথমাংশ পড়া যায় :

যা… … …
সমস্ত মালতী… …
ছেলেবেলাকার মোর স্মৃতির…

৪˙৭ ম্রিয়মান। ২˙১ দ্রষ্টব্য।

৪˙৮ সায়াহ্ন। ২˙৪ দ্রষ্টব্য।

৪˙৯ মধ্যাহ্নে। ২˙৪ দ্রষ্টব্য।

৪˙১০ এর পর একটি অর্ধাবলুপ্ত ছত্র :

কল্পনা … মোর ধাত্রীর …

এর পরেও একটি ছত্র ছিল সেটি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত।

৫˙১ এর পরে দুটি অর্ধাবলুপ্ত ছত্র :

… রাত্রিকোলে যার দীর্ঘীকৃত ছা[য়া]
… গিরিশিখর সমুন্নত কায়া

৫˙২ উজ্জল। পাণ্ডুলিপির বানান।

৫˙৩ এর পরে দুটি ছত্র আছে। তার প্রথমটির কয়েকটি শব্দ পড়া যায়। দ্বিতীয়টির কিছু পড়া যায় না।

৬˙১ বিস্ময়। বানান এইরকম আছে। ২˙৭ দ্রষ্টব্য।

৬˙২ পূরেতে। বানান এইরকম আছে।

৬˙৩ জীবনো। শেষ অক্ষরের 'অ' যে উচ্চার্য সেটি বুঝিয়ে দেবার জন্যে ন-য় ওকার দেওয়া হয়েছে।

৯˙১ তুকারামের আরও কয়েকটি পদ ৯ক ও ৯খ পৃষ্ঠায় লেখা। তুকারামের পদগুলি একত্র মুদ্রিত করলে সুবিধা হবে এই ভেবে ৭ক, ৭খ, ৮ক এবং ৮খ এই চার পৃষ্ঠা অতিক্রম করে ৬খ-এর পর ৯ক ও ৯খ পৃষ্ঠা ছাপা হল। ৯ক পৃষ্ঠার গোড়ায় তুকার যে পদটি ছিল তার অনেকগুলি ছত্র খণ্ডিত, শেষের দু-ছত্র অখণ্ডিত :

ঘরে না বসেন এক রতি চলে যান অরণ্যে সদাই।
তুকা বলে "ধৈর্য্য ধর, এখনি সকল ফুরায় নাই।"

৯˙২ এই পদটির প্রথম দু-ছত্রের শেষের কিছু অংশ খণ্ডিত :

আমারি বেলায় উনি সংসারে বিরাগী,···
সব সুখে ঘরে আসে, শুধু মোর··· ···

৯˙৩ ৯খ পৃষ্ঠা এইখানে শেষ হল।

৮˙১ বিষয় অনুসারে ৯খ পৃষ্ঠার পরে পাঁচটি পৃষ্ঠা এইভাবে ছাপানো হয়েছে :—৮ক, ৮খ, ৭ক, ৭খ এবং ১৫ক। তারপর ১০ক থেকে শেষ পর্যন্ত সকল পৃষ্ঠাই ক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে।

৭˙১ মধ্যাহ্ণ। ২˙৪ দ্রষ্টব্য।

১০˙১ সায়াহ্ণ। ২˙৪ দ্রষ্টব্য।

১১˙১ এর পর এক ছত্র অবলুপ্ত।

১১˙২ এর পর এক ছত্র। তার প্রথমাংশ অবলুপ্ত। শেষাংশ এইরকম :

··· ··· নিগড় পায়।

১৩˙১ উর্দ্ধে। পাণ্ডুলিপির বানান।

১৩˙২ প্রজ্জলিত। পাণ্ডুলিপির বানান।

১৩˙৩ 'নারী'র পরে একটি অক্ষর পড়া যাচ্ছে না। ওটি 'ক' হবে। এই পদটির শেষ ছত্র অবলুপ্ত। কেবল প্রথম অক্ষর 'ভা' এইটি পড়া যাচ্ছে। সমগ্র ছত্রটি এই হবে : 'ভারত বিরহ-হুতাশে।' 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', ১২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য।

১৪˙১ ছত্রটি প্রথমে এইভাবে লিখিত হয়েছিল,—'তুমি যদি হও মোর সংসারের ধ্রুবতারা।' তারপর তোলাপাঠে বসানো হয়েছে—'তোমারেই করিয়াছি'। কিন্তু 'তুমি যদি হও মোর' এ অংশটি কাটা হয়নি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই অংশের পরিবর্তে 'তোমারেই করিয়াছি' করাই কবির অভিপ্রেত।

১৪˙২ এই ছত্রের উপরেও ওইরকম তোলাপাঠে 'এ সমুদ্রে আর কভু' লেখা। এবং এ ছত্রেরও প্রথম অংশ পাণ্ডুলিপিতে কাটা হয় নি। দুটো পাঠ লিখে বোধ হয় কবি কোন্‌টা ভাল সেটা বিচার করে দেখছিলেন তখনও মনঃস্থির করতে পারেন নি। শেষে যে দ্বিতীয় পাঠটাই রেখেছিলেন তার প্রমাণ আছে। এই গানটিই পরিবর্তিত রূপে ব্রহ্মসংগীতে স্থান পেয়েছে।

১৫˙১ সাম্রাজ্ঞী। পাণ্ডুলিপির বানান।

১৫˙২ ইংরাজী। পাণ্ডুলিপির বানান।

১৭.১ এর পর একটি ছত্র অত্যন্ত অস্পষ্ট।

১৭.২ 'তাই' এবং 'গো'র মধ্যে একটি অস্পষ্ট অক্ষর আছে। 'যে' হতে পারে।

১৭.৩ রাজ্ঞি। পাণ্ডুলিপির বানান।

১৭.৪ 3১। একটি অসতর্কতার চিহ্ন। ৩১ লিখতে গিয়ে কবি ইংরেজি '3'-এর পাশে বাংলা '১' বসিয়ে ফেলেছেন।

১৭.৫ প্রজ্জ্বলিত। এই বানানটি আরও একবার পাওয়া গেছে। ১৩.২ দ্রষ্টব্য।

১৭.৬ শক্রদের। অসতর্কতাবশত 'ত্রু' স্থলে 'ক্র' লেখা হয়েছে।

১৭.৭ মহত্ত্বের। এটিও অসতর্কতার নিদর্শন।

১৭.৮ এর পরের ছত্র পড়া যায় না।

১৮.১ এই পৃষ্ঠার প্রথম দু ছত্র একেবারেই পড়া যাচ্ছে না। তৃতীয় ছত্রে 'সকলে' ও 'চীৎকারি' এই দুটি শব্দ পড়া যাচ্ছে।

১৮.২ নিবীড়। পাণ্ডুলিপির বানান।

১৮.৩ এর পর একটি ছত্র খণ্ডিত।

১৮.৪ ১৮খ পৃষ্ঠার প্রথম দু-ছত্র অস্পষ্ট। দ্বিতীয় ছত্রটি চেষ্টা করলে পড়া যায়,— 'বহিছে শোণিতধারা'।

১৯.১ চিহ্ণ। ২.৪ দ্রষ্টব্য।

১৯.২ নিদারূণ। পাণ্ডুলিপির বানান।

১৯.৩ এর পর চার ছত্র। তার প্রথম তিন ছত্রের গোড়ার কথাগুলি মুছে গেছে। চতুর্থ ছত্রের মধ্যাংশের কেবল দুটি শব্দ পড়া যাচ্ছে। খণ্ডিত ছত্রগুলি এই রকম :

··· সুন্দর আহা নলিনীর মন
··· সৌন্দর্য্য দেবী তোমার এ রাজ্যে
··· নের তরে হবে না বিলীন।
··· দিয়াছ হৃদে ··· ···

১৯.৪ এর পরের ছত্র পড়া যাচ্ছে না। পরের পৃষ্ঠার প্রথম ছত্রটিও অত্যন্ত অস্পষ্ট। লাইনটি এই রকম :

···ভয়ে যেন চলেছে তটিনী

১৯.৫ এর পর দুটি লাইন। প্রথমাংশ ঈষৎ অবলুপ্ত, তবে অপাঠ্য নয়।

[আ]মিও একাকী হেথা রয়েছি পড়িয়া
··· মহা সমুদ্রে গিয়াছি মিশায়ে

১৯.৬ উর্দ্ধ। পাণ্ডুলিপির বানান।

১৯.৭ এর পর ছ-টি ছত্র, পাঁচটির প্রথমাংশ মুছে গেছে। শেষের লাইনটি নিশ্চিহ্ন :

··· ঝটিকা ঝঞ্ঝা বিদ্যুৎ অশনি
··· বুকের পরে করেছে আঘাত

··· গিয়াছে পোড়ে প্রকাণ্ড প্রস্তর
··· ··· কত তুষারের স্তূপ।
··· ···যেন মহর্ষির মত

১৯·৮ এর পর একটি ছত্র নিশ্চিহ্ন। ২০ক পৃষ্ঠার প্রথমাংশ খণ্ডিত :

··· গ্ন ধরা নীরব রজনী।
··· ন্ধকারময় গাছগুলি
··· উপরে মাখি রজত জোছনা,

উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় ছত্রের মধ্যে আর একটি ছত্র লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে। তার অর্ধাংশ পড়া যাচ্ছে :

··· র ডালপালা গুলি

২০·১ এর পরের লাইনগুলি ঈষৎ খণ্ডিত :

··· হারা সুখের তরে দিবানিশি তার
··· দয়ের এক দিক শূন্য হয়ে আছে!
··· ন নীরব রাত্রে কখনো কি···গো
·· মর্ম্মভেদী একটি ··· ···

২০·২ এর পর ছ-টি লাইন অস্পষ্ট এবং ঈষৎ অবলুপ্ত, তবে একেবারে অপাঠ্য নয় :

···কক রাগিণী আছে করিলে শ্রবণ
···ন হয় আমারি তা প্রাণের রাগিণী
···ই রাগিণীর মত আমার এ প্রাণ
আমার প্রাণের মত যেন সে রাগিণী
কখনো বা মনে হয় পুরাতন কাল
এই রাগিণীর মত আছিল মধুর

২০খ পৃষ্ঠার প্রথমে 'দিবানিশি হাসিবারে শিখেছিস তোরা,' এই ছত্রের পূর্বে আরও দশটি লাইন আছে। তার প্রথম তিনটি লাইন কাটা। বাকী সাতটি লাইন অস্পষ্ট এবং তাদের প্রথমাংশ অবলুপ্ত, তবে পাঠোদ্ধার করা যায় :

···রাখাল তব সরস বাঁশরী
···মনের সাধে প্রমোদের গান,
···মেলিয়া যবে গাইতেছে গীত
···ঘেরিয়া যবে বহিতেছে বায়ু

…কা ময় যবে ফুটিয়াছে ফুল
· তোদের আর কিসের ভাবনা ?
…চিরহাস্যময় প্রকৃতির মুখ।

২১˙১ 'যবে' শব্দটি তোলাপাঠে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ছন্দের পক্ষে শব্দটি অতিরিক্ত। কবি সম্ভবত 'পুন' এবং 'যবে' এই দুটি শব্দের মধ্যে কোন্‌টি উপযুক্ত হবে সে কথা ভাবছিলেন।

২১˙২ এর পর পাঁচ ছত্র, প্রথমাংশ অবলুপ্ত।

…শিশির জলে নাহিয়া !
…তি জলে অবগাহি মনখানি
…বীর সব ধুয়ে ফেলিব !
…লোয়ে, নূতন নূতন লোকে
…তন নূতন সুখে খেলিব।

২১˙৩ ২১ক পৃষ্ঠার গোড়ায় যে গদ্যাংশটি আছে তার অনেকখানি অবলুপ্ত। মধ্যে মধ্যে লেখকের নিজের হাতের কাটাকুটিও অনেক।

২১˙৪ শূণ্য। পাণ্ডুলিপির বানান।

২২˙১ ২২ক পৃষ্ঠায় গোড়ার কয়েক ছত্র বাংলা। তার পর পাচ ছত্র ইংরেজী ও তার বাংলা অনুবাদ। সবটার উপরে হিজিবিজি লেখা এবং কবির ইংরেজী স্বাক্ষরের মক্‌স। সব শেষে এই ইংরেজী ছড়া।

২২˙২ ২২খ পৃষ্ঠার গোড়ায় চার ছত্র, মাঝে মাঝে লেখা উঠে গেছে :

… লোনা সখি …   … ন্দে
… লিতে যা হবে তাহা…ভুলিব
·· হৃদয়ের বিন …   … ছ
পড়েছে কলঙ্ক…   …তুলিব।

২৩˙১ দৃষ্টির পর যে শব্দটি ছিল সেটি মুছে গেছে। এই ছত্রটি প্রথমে এই ভাবে লিখিত হয়েছিল :

করিছে তা সবাকার দৃষ্টির…

পরে 'করিছে'র 'করি' এবং 'ছে'র মাঝখানে তোলাপাঠে একটি 'তে' বসানো হয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যায় কবির 'তা' এই শব্দটি তুলে দেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা হয় নি।

২৩˙২ বধু। পাণ্ডুলিপির বানান।

২৩˙৩ নাশিকা। পাণ্ডুলিপির বানান। অনবধানতাবশতঃ 'স' স্থানে 'শ' হয়ে গেছে।

২৪˙১ শূলি। পাণ্ডুলিপির বানান।

২৮˙১ এর পর এক ছত্র ছিল। সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। তার পরে আর দু লাইন লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।

২৮˙২ সায়াহ্ণে। ২˙৪ দ্রষ্টব্য।

২৮˙৩ এর পরে এক ছত্র অবলুপ্ত।

২৯.১ 'যে গঠন যেই স্থান···ঢাকিয়া সে বসনে' এই দু-ছত্রের প্রথম পাঠ ছিল :

যেরূপ গঠন যেথা দেছেন প্রকৃতি মাতা
সে সকলে করিয়াছে বিকৃত সে বসনে।

'সে সকলে করিয়াছে' স্থানে একবার 'সে সকলে হইয়াছে' লেখা হয়েছিল। 'করিয়াছে' এবং 'হইয়াছে' এই দুটির মধ্যে লেখকের মন দোলায়িত ছিল। দুটি শব্দই রয়ে গেছে, কোনোটিই কাটা হয় নি।

২৯.২ ম্রিয়মান। ২.১ দ্রষ্টব্য।

২৯.৩ পৃথ্বি। পাণ্ডুলিপির বানান।

৩০.১ [ম্রিয়]মান। ২.১ দ্রষ্টব্য।

৩০.২ এর পরে তিন-চারটি ছত্র ছিল। তার মধ্যে প্রথম দু-ছত্রের কয়েকটি শব্দ পড়া যায়। বাকী অংশ একেবারে মুছে গেছে।

৩০.৩ এর পরের ছত্রটি অবলুপ্ত। ৩০ক পৃষ্ঠার ডান দিকের মার্জিনে লম্বালম্বি নীচের থেকে উপরে চার লাইন লেখা আছে, তার কিছু খণ্ডিত :

[এ]কাকী আপন মনে সরল শিশুটি
··· ···রি কমল বনে করিত গো খেলা
··· ···কি গান গাহিত হরষে
··· ···কি ফুলে গাঁথিত মালিকা

৩০.৪ অনুকুল। পাণ্ডুলিপির বানান।

৩১.১ এর পরেও দু-তিন ছত্র ছিল। সম্পূর্ণ মুছে গেছে। একটি ছত্রের শেষে 'গহ্বরে' এবং আর একটির শেষে 'শ্মশ্রু' এই দুটি শব্দ মাত্র পড়া যাচ্ছে।

৩১.২ এর পরে আছে একটি কবিতা, তার অধিকাংশ ছত্র খণ্ডিত :

ওকি সখি কেন করিতেছ···
একটু বিরলে বসি, কাঁদিতে ··
তাতেও কি আমি···
ভুলিনি তোমারে আমি···
একেলাই চা··· ···
তবে আর কেন··· ···
ভ্রূকুটি এ ভগ্ন··· ···
পথের পথিক এসে সেও গো যাইবে কেঁদে
তবুও অটল রবে হৃদয় তোমার···

৩২.১ চিহ্ন। ২.৬ দ্রষ্টব্য।

৩২.২ ম্রিয়মান। ২.১ দ্রষ্টব্য।

৩২˙৩ এইখানে তোলাপাঠে এই দুটি শব্দ আছে : 'হোয়েছিল পত্রহীন'। 'হোতে ঝরেছে পল্লব' এবং 'হোয়েছিল পত্রহীন' এই দুটি বাক্যাংশের মধ্যে কোন্‌টি এখানে প্রয়োগ করা উচিত হবে, কবির সম্ভবত সে বিষয়ে দ্বিধা ছিল।

৩২˙৪ চিহ্ন। ২˙৬ দ্রষ্টব্য।

৩২˙৫ এর পরেও খণ্ডিত দু-ছত্র আছে :

হাসি··· ···অধর ভরিয়া

··· ···সিঁদূর পরিত।

৩৩˙১ চিহ্ন। ২˙৬ দ্রষ্টব্য।

৩৪˙১ বিষ্ময়ে। ৬˙১ দ্রষ্টব্য।

৩৪˙২ গিরিবাসীগণ। পাণ্ডুলিপির বানান।

৩৪˙৩ গোধূলী। পাণ্ডুলিপির বানান।

৩৪˙৪ নিবীড়। পাণ্ডুলিপির বানান।

৩৫˙১ শশি। পাণ্ডুলিপির বানান।

৩৫˙২ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। 'কোথাগো'র পর আর কিছু লেখা হয় নি।

৩৫˙৩ শশি। ৩৫˙১ দ্রষ্টব্য।

৩৬˙১ এই ছত্রের গোড়ায় কয়েকটি অক্ষর অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

৩৭˙১ এর পর এই বাক্য ও বাক্যাংশগুলি আছে :

তারে দেহ গো আনি

একবার বল সখি ভালবাস মোরে

এ ভালবাসায় যদি

এ ছাড়াও আর একটি বাক্য লেখা হয়েছিল :

কেমনে শুধিব বল তোমার এ ঋণ

লেখক বাক্যটি লিখে 'তোমার এ ঋণ' এইটুকু রেখে বাকীটা কেটে দিয়েছিলেন। এই ছত্রগুলি যে পরবর্তী কবিতার পূর্বাভাস তা সহজেই বোঝা যায়।

৩৭˙২ পৃথ্বি। পাণ্ডুলিপির বানান। ২৯˙৩ দ্রষ্টব্য

৩৮˙১ প্রথমে কালিতে লেখা হয়েছিল :

(ওরে) দিবস চলে গেল সন্ধ্যা হয়ে এল,

তার পর পেনসিলে কেটে '(ওরে)'কে '(ঐ)', 'দিবস'কে 'সময়' এবং 'সন্ধ্যা'কে 'আঁধার' করা হয়েছে।

৩৮˙২ প্রথমে কালিতে লেখা হয়েছিল : পথ দেহ ব'লে পথ দেহ ব'লে

পেনসিলে কেটে করা হয়েছে : পথ বলে দাও পথ বলে দাও

মালতীপুঁথির দুটি বর্জিত পৃষ্ঠা।

মালতীপুঁথির ১ক থেকে ৩৮খ পর্যন্ত মোট ছিয়াত্তর পৃষ্ঠার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই ছিয়াত্তর পৃষ্ঠার মধ্যে ১খ, ২৬ক এবং ৩৮খ এই তিনটি পৃষ্ঠায় কোনো লেখা নেই। লিখিত বাহাত্তর পৃষ্ঠার মধ্যে একাত্তর পৃষ্ঠা মুদ্রিত হল। বাকী রইল ১ক এবং ২৬খ। ১ক পৃষ্ঠায় আছে নাগরী লিপিতে লেখা একটি সংস্কৃত অনুশীলনী। এর কথা অন্যত্র বলেছি। ২৬ক পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু ইংরেজিতে লেখা বালক রবীন্দ্রনাথের একটি সাপ্তাহিক পঠনপঞ্জী। এর প্রসঙ্গও যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। মালতীপুঁথির অন্য কয়েকটি পৃষ্ঠার আলোকচিত্র-সহ রবীন্দ্রছাত্রজীবনের এই দুটি চিত্তাকর্ষক এবং মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদানের আলোকচিত্র মুদ্রিত হল।

মালতীপুঁথি

পাণ্ডুলিপি-পরিচয়

প্রবোধচন্দ্র সেন

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের অন্তর্গত নিদর্শসদনে (বর্তমানে 'রবীন্দ্রসদন' নামে পরিচিত) রক্ষিত ২৩১-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিটি পরিচিত হয়েছে 'মালতীপুঁথি' নামে। দিল্লির লেডি আরউইন স্কুলের তদানীন্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী মালতী সেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেনের হাত দিয়ে এই মূল্যবান্ পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রভবনকে উপহার দেন ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে।[১] শ্রীমতী মালতী সেনের প্রদত্ত উপহার হিসাবেই এটি 'মালতীপুঁথি' নামে পরিচিত হয়েছে। শ্রীমতী মালতী সেনের কাছ থেকে এই পুঁথিটির ইতিহাস যা জানা গিয়েছে তা এই। শ্রীমতী মালতী সেনের জীবনের প্রথম ভাগ কাটে লাহোরে। তাঁর ভ্রাতা স্বর্গত সুধীন্দ্রকুমার সেন (মৃত্যু ১৯১৯) ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একজন অনুরাগী পাঠক এবং তাঁকে কেন্দ্র করে তাঁদের লাহোরের বাড়িতে একটি সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রও গড়ে উঠেছিল। সুধীন্দ্রকুমারের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে তাঁর সাহিত্যসংগ্রহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কৃত হয়। এটি ঠিক কখন আবিষ্কৃত হয় তা জানা যায় নি। শ্রীমতী মালতী সেন জানিয়েছেন, আনুমানিক ১৯৩৬ সালে তাঁরা লাহোর ত্যাগ করে অন্যত্র যান। বোধ করি লাহোর ত্যাগের সময়েই এই পুঁথিটি তাঁর নজরে আসে। সম্ভবতঃ এজন্যই তিনি এটিকে 'লাহোর-পুঁথি' নাম দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। অতঃপর ১৯৪২ সালে সিমলায় অবস্থানকালে তিনি এই পুঁথিটি শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেনের হাতে দেন।[২] এটি কিভাবে সুধীন্দ্রকুমারের হাতে গিয়েছিল তা শ্রীমতী মালতী সেনের কাছ থেকে বা অন্য কোনো সূত্র থেকে এখনও জানা যায় নি।

এই পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রভবনে আসার অল্পকাল পরেই "রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা" নামে একটি প্রবন্ধে এটির একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছিলাম। সেটুকু এখানে উদ্‌ধৃত করা প্রয়োজন।—

"অত্যন্ত সৌভাগ্যক্রমে ও অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে রবীন্দ্রভবনে ইদানীং একটি পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়েছে, যেটিকে আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন বলে নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হয়। পাণ্ডুলিপিখানি স্পষ্টতঃই একখানি বৃহৎ বাঁধানো খাতা ছিল। কিন্তু এখন সেটির সেলাই খুলে গিয়েছে এবং খোলা পাতাগুলিও অত্যন্ত জীর্ণদশা প্রাপ্ত হয়েছে। এক দিকের শক্ত রঙিন মলাটও পাওয়া গিয়েছে। অন্য দিকের মলাট ও কতকগুলি পাতা পাওয়া যায় নি। এই আশ্চর্য ও মূল্যবান্

---

১ *Visva-Bharati News, 1943 February, p. 96.*

২ **রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত শ্রীমতী মালতী সেনের পত্রসংগ্রহ।**

পাণ্ডুলিপিখানির পূর্ণ পরিচয় ভবিষ্যতে দেওয়া যাবে।[৩] এ স্থলে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এই বাঁধানো খাতাখানি পূর্বোক্ত বাঁধানো লেট্‌স ডায়ারি না হলেও তার কাছাকাছি সময়ের, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের তেরো-চোদ্দ বৎসর বয়সের লেখা এই খাতাখানিতে পাওয়া গিয়েছে।"

— বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাখ, পৃ ৬৫৪

এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথের তেরো-চোদ্দ বৎসর বয়সের রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'কুমারসম্ভব' অনুবাদের কথা উল্লিখিত হয়েছিল, আর এই অনুবাদের তারিখ অনুমিত হয়েছিল ১৮৭৪ সালের শেষার্ধ। এ বিষয়ে যথাস্থানে আরও একটু আলোচনা করা যাবে। পরবর্তী কালে আরও কয়েকটি প্রবন্ধে এই পাণ্ডুলিপিটির কোনো কোনো বিষয় সম্বন্ধে আংশিকভাবে আলোচনা করেছি। যথাস্থানে তাও উল্লিখিত হবে। কিন্তু 'পূর্ণ পরিচয়' দেবার সুযোগ হয় নি। নির্দিষ্ট সময়পরিধির মধ্যে রচিত বলে বর্তমান প্রবন্ধেও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হবে না। শুধু এটির রচনাকাল ও এর অন্তর্গত প্রধান রচনাগুলির আনুপূর্বিক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টিত হব। আশা করি তার থেকেই এই পাণ্ডুলিপিটির গুরুত্ব নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হবে।

এই পুঁথিতে প্রাপ্ত রচনাগুলির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে এটির বহিরঙ্গের আর-একটু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। এই পুঁথিটি এখনও রবীন্দ্রভবনের ২৩১-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি নামে পরিচিত। এই পুঁথিটি যে সময়ে রবীন্দ্রভবনে আসে তখনই এটির বাঁধাই ও সেলাই খুলে গিয়েছিল এবং খোলা পাতাগুলি অত্যন্ত জীর্ণ ও ভঙ্গুর দশা প্রাপ্ত হয়েছিল। তাই পরবর্তী কালে এর পাতাগুলিকে অভঙ্গুর স্বচ্ছ পত্রাবরণে আচ্ছাদিত ও একত্র গ্রথিত করে নূতন মলাট দিয়ে বাঁধিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু প্রথমাবধি যথেষ্ট সতর্কতার অভাবে পাতাগুলির পৌর্বাপর্য ঠিকমতো রক্ষিত হয় নি। তা ছাড়া এর কতকগুলি পাতাও তখন থেকেই পাওয়া যায় নি। আর অনেকগুলির ধার কিছুকিছু ভেঙে যাওয়াতে স্থানে স্থানে লিখিত লাইনের পার্শ্ববর্তী অংশ লুপ্ত হয়ে গেছে। লেখাগুলিও কালের প্রভাবে অল্পাধিক পরিমাণে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, এই পুঁথির সব পাঠই কবির অভিপ্রেত শেষ পাঠ নয়, প্রাথমিক রচনার খসড়া মাত্র। ফলে নানা স্থানেই কাটাকুটি আছে প্রচুর পরিমাণে; সংশোধিত পাঠগুলি সব ক্ষেত্রে যথাস্থানে লিখিত হয় নি, আশেপাশে নানা স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত। এসব কারণে পুঁথিখানির সব পাঠ যথাযথভাবে অর্থাৎ সংশয়াতীতভাবে উদ্ধার করা সহজসাধ্য নয়। ১৩৫০ সালের বৈশাখ-সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় এই পুঁথিখানির একটি অংশ ('কুমারসম্ভব') প্রকাশিত হয় বর্তমান লেখকের সম্পাদনায়। এই অংশটিকে পাণ্ডুলিপির যথাসম্ভব অবিকল মুদ্রিত প্রতিরূপ করবার চেষ্টা করা গিয়েছিল। এই মুদ্রিত অংশটি ও বর্তমান লেখককৃত তার পাদটীকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এই পুঁথির যথাযথ পাঠোদ্ধারের দুঃসাধ্যতা প্রতিপন্ন হবে। এই পুঁথির সামগ্রিক পাঠপ্রকাশের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা

৩ পাতাগুলির অতিমাত্র জীর্ণতার জন্যই তৎকালে পূর্ণতর পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয় নি। সামান্য হস্তক্ষেপেও পাতাগুলি ভেঙে যাচ্ছিল।

এখানেই। আর, রবীন্দ্রসাহিত্যজিজ্ঞাসু পাঠক তথা গবেষকের সহায়তাকল্পে সমগ্র পুঁথিটির যান্ত্রিক প্রতিলিপি প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাও এখানেই। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত তথ্যসমূহের নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটিমাত্র পৃষ্ঠার যান্ত্রিক প্রতিলিপি যথাস্থানে মুদ্রিত হল। আশা করি এর থেকেও এরূপ প্রতিলিপি প্রকাশের গুরুত্ব প্রতিপন্ন হবে।

সর্বশেষে বলা উচিত যে, পুঁথিখানি যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে তাতে তার মোট পত্রসংখ্যা ৩৮ এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৬। রবীন্দ্রভবনে আসার পরে পুঁথিটির প্রতি পৃষ্ঠায় পেন্‌সিল দিয়ে পৃষ্ঠাঙ্ক বসানো হয় ইংরেজিতে। তৎকালে অনবধানতাবশতঃ দশম ও একাদশ পত্রের প্রথম পিঠে একই সংখ্যা 19 বসানো হয় এবং দশম পত্রের দ্বিতীয় পিঠ খালি থেকে যায়। পরে দ্বিতীয় 19-কে করা হয় 19 A, প্রথম 19-এর উলটো দিক্‌টা এখনও পৃষ্ঠাঙ্কহীনই রয়ে গেছে। এভাবে দুই পৃষ্ঠা গণনায় বাদ যাওয়াতে শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক হয়েছে 74। তা ছাড়া 42, 50 ও 68-এর স্থলে ভুলবশতঃ যথাক্রমে 41, 49 ও 67 লেখা হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে মোট পৃষ্ঠাঙ্ক অপরিবর্তিতই রয়েছে। বর্তমান আলোচনায় পুঁথির এই পৃষ্ঠাঙ্কই অনুসৃত হল বাংলা লিপিতে। 2, 30, প্রথম 49 এবং 74-চিহ্নিত পৃষ্ঠাগুলি বাদে এই পুঁথির সব পৃষ্ঠাতেই কিছু-না-কিছু লেখা আছে। প্রায় সবই কালিতে লেখা, মাঝে মাঝে পেন্‌সিলের লেখাও আছে। কবিতাগুলি অনেক স্থলেই ভারতী প্রভৃতি পত্রিকার ন্যায় দুই স্তম্ভে লেখা। অন্যত্র এক স্তম্ভ। বর্তমান প্রবন্ধে উদ্ধৃতি-পরিচয়প্রসঙ্গে যথাস্থানে পৃষ্ঠাঙ্কের সঙ্গে স্তম্ভসংস্থানও উল্লিখিত হল। যেসব পৃষ্ঠায় একাধিক স্তম্ভ নেই, সেগুলির ক্ষেত্রে স্তম্ভপ্রসঙ্গ অনুল্লিখিত রইল। নূতন করে বাঁধানো অবস্থায় এর মলাটের মাপ ৯½ × ৬¾ ইঞ্চি এবং ভিতরের স্বচ্ছাবরণ-দেওয়া পাতার মাপ ৮½ × ৫½ ইঞ্চি।

২

এই গেল পুঁথিটির ইতিহাস ও বহিরঙ্গের বিবরণ। অতঃপর এটির রচনাকাল সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা প্রয়োজন। এই কালনির্ণয় উপলক্ষে প্রথম কর্তব্য এর অন্তর্গত রচনাগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া। এ প্রসঙ্গে প্রথম স্মরণীয় বিষয় এই যে, এর অনেকগুলি রচনাই বিভিন্ন সময়ে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং পরে বিভিন্ন গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে। সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে স্থান পাবার সময়ে এগুলি অনেকাংশে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। সেগুলির প্রাথমিক রূপ পাওয়া যায় এই পুঁথিতে। এটাই এই পুঁথিটির গুরুত্বলাভের অন্যতম প্রধান হেতু। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, কল্পনা ও শিক্ষারীতির বিবর্তন উপলব্ধির পক্ষে এই প্রাথমিক রূপের সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয় অত্যাবশ্যক। কিন্তু সে পরিচয় গভীর গবেষণা-, শ্রম- ও সময়- সাপেক্ষ। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য পুঁথিটির মোটামুটি পরিচয় দেওয়া। সে কাজের পক্ষে উক্তপ্রকার গবেষণা নিষ্প্রয়োজন।

বলা অনাবশ্যক যে, এই পুঁথিটির কালসীমা নিরূপণ করার পক্ষে একটি প্রধান কর্তব্য এর অন্তর্গত রচনাগুলির সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া। কিন্তু সে বিবরণদান মালতীপুঁথির সম্পাদন ও প্রকাশনের অঙ্গ বলেই গণ্য। বর্তমান আলোচনায় নিষ্প্রয়োজনবোধে ও পুনরুক্তিভয়ে সে কাজ

থেকে নিরস্ত থাকা গেল। তথাপি পুঁথিটির কালনির্ণয়ের প্রয়োজনে এ স্থলে কয়েকটিমাত্র লেখার কিছু পরিচয় দেওয়া হল।

পুঁথিখানির কালনির্ণয়প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষণীয় বিষয় এর দ্বিতীয় ৪৯-সংখ্যক পৃষ্ঠায় লিখিত সাপ্তাহিক পাঠক্রমের একটি তালিকা (ইংরেজিতে লেখা)। এই তালিকা থেকে মনে হয়, এই পুঁথিখানিতে লেখা আরম্ভ হয় রবীন্দ্রনাথের পঠদ্দশাকালে। এই তালিকা থেকে আরও বোঝা যায় যে, তৎকালে তাঁর শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল এই কয়টি বিষয়—ইংরেজি (গদ্যপাঠ ও ব্যাকরণ), গণিত (জ্যামিতি, বীজগণিত ও পাটীগণিত), ভূগোল, এবং সংস্কৃত। পাঠক্রমটিতে স্পষ্টই দেখা যায় ইংরেজি ও সংস্কৃত শিক্ষার উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এই পাঠক্রমে বাংলাশিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই নেই, এটা বিশেষভাবে লক্ষ করবার বিষয়। বাংলাশিক্ষার অবসানপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"আমরা ইস্কুলে তখন ছাত্রবৃত্তি-ক্লাসের এক ক্লাস নীচে বাংলা পড়িতেছি। বাড়িতে আমরা সে ক্লাসের বাংলা পাঠ্য ছাড়াইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছি। বাড়িতে আমরা অক্ষয়কুমার দত্তের পদার্থবিদ্যা শেষ করিয়াছি, মেঘনাদবধও পড়া হইয়া গিয়াছে।…এই সময়ে আমাদের নর্মাল স্কুলের পালা হঠাৎ শেষ হইয়া গেল। তাহার একটু ইতিহাস আছে।"

—'জীবনস্মৃতি', বাংলাশিক্ষার অবসান

সে ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে মহর্ষি রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ তিন সহপাঠীকে ডেকে বললেন, "আজ হইতে তোমাদের আর বাংলা পড়িবার দরকার নাই"।

নর্মাল স্কুল তথা বাংলাশিক্ষার পালা এভাবে হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। এর থেকে অন্ততঃ এটুকু বোঝা যায় যে, মালতীপুঁথির পাঠক্রমটি নর্মাল স্কুল -ত্যাগের পরবর্তী কালের। নর্মাল স্কুল ছেড়ে তিনি ভরতি হলেন বেঙ্গল একাডেমি -নামক ফিরিঙ্গি স্কুলে (১৮৭২)। নর্মাল স্কুলে পড়বার সময়েই (আনুমানিক ১৮৬৮-৭২) রবীন্দ্রনাথের কবিতারচনার সূত্রপাত হয়। তখন তিনি কবিতা লিখতেন একটি নীল কাগজের খাতায়। এই 'নীলখাতা'টিই তাঁর প্রথম 'কাব্যগ্রন্থ'। বেঙ্গল একাডেমিতে প্রবেশের পরে তাঁর কাব্যচর্চা চলতে থাকে একটি বাঁধানো নূতন খাতায়। জীবনস্মৃতির বর্ণনা অনুসারে এটি পরিচিত হয়েছে 'লেটস্ ডায়ারি' নামে। এই ডায়ারি খাতাটিই তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। বেঙ্গল একাডেমিতে পড়বার সময়েই রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয় (১৮৭৩ ফেব্রুআরি) এবং তার পরেই তিনি পিতার সঙ্গে হিমালয়যাত্রা করেন। পথে কিছুকাল শান্তিনিকেতনেও বাস করেন। এই সময়েই অর্থাৎ এই প্রথম শান্তিনিকেতন-বাসকালেই তিনি ওই লেটস্ ডায়ারিতে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে একটি 'বীররসাত্মক' কাব্য লেখেন। ১৮৯৪ অক্টোবর ২৩ তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একখানি পত্র থেকে জানা যায় যে, এই বীররসাত্মক কাব্যখানি লিখিত হয়েছিল পেন্‌সিলে, কালিতে নয়। উক্ত পত্র থেকে এই কাব্য সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা জানা যায়। তা এই।—

"সেটা লিখতে দিন সাতেক লেগেছিল। কোথায় সে খাতা এবং সে কবিতা! তার একটা লাইনও মনে নেই। কেবল মনে আছে বড়দাদা সেই কবিতাটা পছন্দ করেছিলেন।"

—'ছিন্নপত্রাবলী' (১৯৬০), পৃ ৩৬৩-৬৪

এসব তথ্য থেকে অনুমান করা যায়, এই 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যের রচনাকাল ১৮৭৩ ফেব্রুআরি-মার্চ।

'লেটস্ ডায়ারি'-নামক দ্বিতীয় খাতাখানি কখন শেষ হল এবং তৃতীয় খাতায় কবিতারচনা কখন আরম্ভ হল তা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করবার উপায় নেই। আমাদের মনে হয়, এই মালতীপুঁথিখানিই সেই তৃতীয় খাতা, অর্থাৎ নীলখাতা ও লেটস্ ডায়ারির কনিষ্ঠা 'সহোদরা'। যেসব তথ্যপ্রমাণের উপরে এই অনুমানের প্রতিষ্ঠা, অতঃপর সংক্ষেপে তারই পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হব।

৩

বেঙ্গল একাডেমিতে পড়বার পালাটা (১৮৭২-৭৪) দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, আর লেটস্ ডায়ারিখানারও রচনা-সম্ভারে ভরে উঠতে বেশি সময় লাগে নি বলে মনে হয়। বেঙ্গল একাডেমির পালা শেষ করে রবীন্দ্রনাথ ভরতি হলেন সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে (১৮৭৪ জানুআরি)। এই ইস্কুলেও বেশি দিন পড়া হল না। কিন্তু 'ঘরের পড়া' চলল আরও কিছুকাল। পূর্বোক্ত সাপ্তাহিক পাঠক্রমটি এই 'ঘরের পড়া' যুগেরই পাঠক্রম বলে মনে হয়। কারণ এটিতে সংস্কৃতশিক্ষার উপরে যতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, বেঙ্গল একাডেমি বা সেণ্ট জেভিয়ার্সের মতো ইস্কুলে তা প্রত্যাশিত নয়। পক্ষান্তরে হিমালয়ে বাসকালে মহর্ষির শিক্ষাব্যবস্থায় ও পরবর্তী কালে ঘরের পড়ায় সংস্কৃতশিক্ষাকে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় 'জীবনস্মৃতি' থেকেই। তা ছাড়া, ওই পাঠক্রমে দেখা যায় শনিবারের পাঠব্যবস্থা অন্যান্য দিনের সমানই, কিছুমাত্র লঘু নয়। এটাও খ্রীস্টানপরিচালিত উক্ত দুই ইস্কুলের পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

এই পাঠক্রমটি যে 'ঘরের পড়া' যুগের অন্তর্গত, তার কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া যায় এই পুঁথিখানিতে। এই পুঁথিখানি যে শুধু ছাত্র রবীন্দ্রনাথের পাঠাভ্যাসের পরিচয়ই বহন করছে তা নয়। এটিতে কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার নিদর্শনই আছে সব চেয়ে বেশি এবং এগুলিই এর গুরুত্বের প্রধান হেতু। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক শিল্পচর্চারও (প্রধানতঃ মানুষের মুখ আঁকার, তাও কালি-কলমের যোগে) কিছু নিদর্শন আছে এটিতে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পচর্চার ইতিহাস রচনার পক্ষে এই পুঁথির ছবিগুলি উপেক্ষণীয় নয় বলেই মনে করি। তা ছাড়া, প্ল্যানচেট-চর্চা (পৃ ৫৩) প্রভৃতি আরও এমন অনেক বিষয় আছে এই বিচিত্র পুঁথিটিতে যার ফলে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন জীবন ও চিন্তাধারা অনেকাংশেই এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। সে কাজ ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রইল। এই পুঁথিটি সম্বন্ধে আরও একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, এটি হচ্ছে আসলে একটি খসড়া খাতা, বহু বিচিত্র বিষয়ের ভাণ্ডার। তার সবগুলির প্রাথমিক এবং অনেকাংশে এলোমেলো রূপই পাওয়া যায় এটিতে; তাই কাটাকুটিরও অভাব নেই। লেখাগুলির সুসংস্কৃত পরিচ্ছন্ন রূপ নেই এটিতে।

এবার কালনির্ণয়প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। পুঁথিটির ৪০-সংখ্যক পৃষ্ঠায় একটি খণ্ডিত গদ্যরচনাংশ

আছে। মনে হয় ইংরেজিশিক্ষার অঙ্গ হিসাবে বালক রবীন্দ্রনাথকে কিছুকিছু গদ্যানুবাদও করানো হত, এটি তারই একটি নিদর্শন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা উচিত, ইরেজি কবিতার পদ্যানুবাদের বহু নিদর্শন আছে এই পুঁথিটিতে। যা হক, উক্ত গদ্যানুবাদটির মধ্যে "১৮৭৩ খৃঃ অঃ" তারিখটি পাওয়া গিয়েছে। তাতে সহজেই বোঝা যায়, এই অনুবাদের তারিখ ১৮৭৩ সালের পূর্ববর্তী নয়। পরের পৃষ্ঠাতেই (অর্থাৎ প্রথম ৪১-সংখ্যক পৃষ্ঠায়) আরও একটি অনুবাদ আছে। অনুবাদের পূর্বে মূল ইংরেজি অংশটুকুও লিখিত আছে। এই অংশ-দুটি রবীন্দ্রজিজ্ঞাসুদের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যসূচক। তাই এ-দুটি সমগ্রভাবেই উদ্‌ধৃত করা গেল।—

"People here grumble and say that the heart of the poet in মেঘনাদ is with the Rakshas! And that is the real truth. I despise Ram and his ra [bble], but the idea of রাবণ elevates and kindles my imaginat[ion]. He was a grand fellow.

এখানকার লোকেরা অসন্তোষের সহিত বলিয়া থাকে যে, মেঘনাদবধ কাব্যে কবির মনের টান রাক্ষসদের প্রতি। বাস্তবিক তাহাই বটে। আমি রাম এবং তাহার অনুচরদের ঘৃণা করি। কিন্তু রাবণের চরিত্র চিন্তা করিলে আমার কল্পনা প্রজ্বলিত ও উন্নত হইয়া উঠে। রাবণ লোকটা খুব জমকালো ছিল।"

—মালতীপুঁথি, পৃ প্রথম-৪১

এই অনুবাদটুকুর মধ্যে বালক রবীন্দ্রনাথের শুধু শিক্ষার ধারা নয়, তাঁর ভাষার অধিকার এবং প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শুধু অনুবাদ নয়, এই অংশটুকুর ঠিক পূর্বেই মেঘনাদবধ কাব্যের একটু খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ আলোচনাও লক্ষিতব্য। সব মিলিয়ে এই অনুমান হয় যে, এই আলোচনা ও অনুবাদ 'ঘরের পড়া' যুগেরই (অর্থাৎ পূর্বোক্ত ১৮৭৩ সালের পরবর্তী কালেরই) কাজ।

এই অনুমানের পক্ষে আরও দু-একটি তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজন। 'ঘরের পড়া' প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতিতে আছে—

"রামসর্বস্ব পণ্ডিতমহাশয়ের প্রতি আমাদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিয়া করিয়া শকুন্তলা পড়াইতেন।"

এই তথ্যদুটির কিছু প্রমাণ আছে মালতীপুঁথিতে। এই পুঁথির প্রথম পৃষ্ঠাতেই আছে একটি সংস্কৃত রচনাচর্চার নিদর্শন। সবটুকুই নাগরী লিপিতে লেখা। তাতে কিছুকিছু লিপিগত ত্রুটিও আছে। আর ব্যাকরণগত ত্রুটি আছে প্রায় সর্বত্রই। তার নিদর্শনস্বরূপ এর প্রথম তিনটি বাক্য এখানে উদ্‌ধৃত করা গেল।—

"कस्यचित् वृकस्य गले अस्थिः विद्धरभूत्। इतस्ततः धावमानो रधीरः स वृकः पुरस्कारस्य लोभं दर्शयित्वा प्राणियः (स्त) तस्य यन्त्रणां शामयितुमुवाच। काचित् दीर्घग्रीवा सारसी प्रक्रुद्धा सन् तस्य कण्ठात् (द्) अस्थिं मुमोच।"

বলা বাহুল্য, এই তিনটি বাক্যেও ব্যাকরণগত ভুলের অভাব নেই। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান, বুদ্ধি ও কল্পনা যথেষ্ট পরিণতি লাভ করেছিল। তাঁর পক্ষে এই নীরস ব্যাকরণ ও তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি

মালতীপুঁথি : পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা ।/১ক

আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক ছিল না। পরবর্তী কালে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে তিনি ইংরেজিশিক্ষা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, অনুরূপ পদ্ধতির সংস্কৃতশিক্ষার পক্ষেও তা প্রযোজ্য। তাঁর নিজের শিক্ষাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। সুতরাং রামসর্বস্ব পণ্ডিত যে 'অনিচ্ছুক' ছাত্রকে ব্যাকরণ শেখাবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়েছিলেন, সেটা কিছু বিচিত্র নয়। বস্তুতঃ মালতীপুঁথিতেও রবীন্দ্রনাথের এই পদ্ধতির সংস্কৃতশিক্ষার দ্বিতীয় নিদর্শন নেই।

রামসর্বস্ব পণ্ডিত যে এই ব্যাকরণবিমুখ ছাত্রটিকে অর্থ করে করে শকুন্তলা পড়িয়েছিলেন, তারও কিছু নিদর্শন আছে এই পুঁথিটিতে। এটিতে একটি রচনা আছে যার আরম্ভাংশ এইরূপ।—

"ভালবাসে যারে তার চিতাভস্মপানে
প্রেমিক যেমন চায় কাতর নয়ানে
তেমনি যে তোমাপানে নাহি চায় গ্রীস্
তাহার হৃদয়মন পাষাণ কুলিশ।"

—মালতীপুঁথি, পৃ ৪ দ্বিতীয় স্তম্ভ

এটি আসলে কবি বায়রনের একটি ইংরেজি রচনার পদ্যানুবাদ। মূল ইংরেজির প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করা গেল। এটুকু থেকেই অনুবাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও উৎকর্ষ নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হবে।—

"Cold is the heart, fair Greece! that looks on thee,
Nor feels as lovers o'er the dust they loved."

—*Childe Harold's Pilgrimage, Canto II. 15. 1-2*

এ রকম আরও ইংরেজি কবিতার পদ্যানুবাদ আছে এই মালতীপুঁথিতে।[১] সেগুলির পরিচয় দেওয়া আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয় এই যে, এই পদ্যানুবাদটির ডান পাশে কাত করে ছোটো অক্ষরে নিম্নলিখিত চার পংক্তি লেখা আছে। এর কিছুকিছু অংশ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ওই চারটি পংক্তি এখানে যথাযথভাবে উদ্ধৃত হল। অনুমিত অংশ বন্ধনীবদ্ধ করা গেল, বাকিটুকু বাদ রইল।—

"[শরীর] সে ধীরে ২ যাইতেছে আগে
[অধীর] হৃদয় কিন্তু চায় পিছু বাগে
. . . . যায় যবে তরী
. . . . আগে ধায় ফিরি ২।"

—মালতীপুঁথি, পৃ ৪ দ্বিতীয় স্তম্ভ

বলা বাহুল্য, 'ভালবাসে যারে তার' ইত্যাদি রচনার পাশেই এই চার পংক্তি লেখার কারণ হচ্ছে দুটি রচনার ভাবগত (আংশিক) সাদৃশ্য। শেষোক্ত চার পংক্তি রবীন্দ্রনাথের নিজের রচিত। কিন্তু

১ দ্রষ্টব্য: লেখকের 'ভোরের পাখি' প্রবন্ধ, 'শতবার্ষিক জয়ন্তী-উৎসর্গ' গ্রন্থ (১৩৬৮), পৃ ৩৪৯ ; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম খণ্ড (১৩৬৭), পৃ ৭৭ ও পাদটীকা ১।

তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তি-দুটি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। তাই তাঁকে ওই দুটি পংক্তি নূতন করে লিখতে হয়েছিল নিম্নলিখিত রূপে।—

"ধ্বজা লয়ে গেলে যথা প্রতিকূল বাতে
অংশুক তাহার মুখ ফিরায় পশ্চাতে।"

—মালতীপুঁথি, পৃ ৬ দ্বিতীয় স্তম্ভ

এই পংক্তি-দুটি স্থান পেয়েছে কুমারসম্ভব তৃতীয় সর্গের পদ্যানুবাদের (পৃ ৫-৬) ঠিক পরেই। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আলোচ্যমান চারটি পংক্তি কালিদাসের একটি শ্লোকের অনুবাদ। শ্লোকটি এই।—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং
ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ
প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥"

—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, প্রথম অঙ্ক, শেষ শ্লোক

রামসর্বস্ব পণ্ডিতের কাছে শকুন্তলা পড়া যে নিষ্ফল হয় নি, এটা তার অন্যতম প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা উচিত যে, এই অনুবাদটুকু পরবর্তী কালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বিচ্ছেদ' নামে। তার পূর্ণরূপটি এই।—

"শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে,
অধীর হৃদয় কিন্তু চায় পিছু বাগে,
ধ্বজা লয়ে গেলে যথা প্রতিকূল বাতে,
পতাকা তাহার মুখ ফিরায় পশ্চাতে।"

—ভারতী ১২৮৪ মাঘ, পৃ ৩২৫

'অংশুক' শব্দের স্থলে 'পতাকা'—এটুকু বাদে মালতীপুঁথির পাঠ ও ভারতীর পাঠ অবিকল এক। মালতীপুঁথিতে প্রাপ্ত কুমারসম্ভব তৃতীয় সর্গের পদ্যানুবাদও কিছু পরিমার্জিত রূপে প্রকাশিত হয় ভারতী পত্রিকার উক্ত মাঘ-সংখ্যাতেই। অনুবাদের নাম দেওয়া হয় 'মদনভস্ম'। সুতরাং মালতীপুঁথিখানি যে ১২৮৪ সালের প্রথম ভাগেও (অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৭৮ সালের প্রথম ভাগেও) রবীন্দ্রনাথের অধিকারে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আরও পরবর্তী কালেও যে এটি তাঁর কাছে ছিল, যথাস্থানে তা দেখানো যাবে।

জীবনস্মৃতি থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলা পড়েছিলেন রামসর্বস্ব পণ্ডিতের কাছে, আর কুমারসম্ভব পড়েছিলেন জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে। তারই ফল এই কাব্যের তৃতীয় সর্গের পদ্যানুবাদ। এই অনুবাদ সম্পর্কে পূর্বে নানা প্রসঙ্গে একাধিক বার আলোচনা করতে হয়েছে।[১] এ স্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

১ 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা', বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাখ; 'ভোরের পাখি' প্রবন্ধ, 'শতবার্ষিক জয়ন্তী-উৎসর্গ' গ্রন্থ (১৯৬১)।

শকুন্তলা ও কুমারসম্ভব কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় হয় 'ঘরের পড়া' যুগে। মালতীপুঁথিতে প্রাপ্ত ওই দুটি কাব্যের আংশিক অনুবাদ ওই প্রথম পরিচয়েরই ফল, সুতরাং 'ঘরের পড়া' যুগেরই অন্তর্গত। এই ঘরের পড়া শুরু হয় সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে প্রবেশের অল্পকাল পরেই, আনুমানিক ১৮৭৪ সালে। সুতরাং কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার পূর্বোক্ত অনুবাদ-দুটিকেও ১৮৭৪ সালের অন্তর্গত বলে অনুমান করলে আশা করি খুব ভুল হবে না। এই ১৮৭৪ সালকেই মালতীপুঁথির রচনা-কালের ঊর্ধ্বসীমা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই পুঁথির অন্যত্র ১৮৭৩ সালের উল্লেখ আছে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তাও এই অনুমানের প্রতিকূল নয়।

'ঘরের পড়া' যুগের আরও একটি কাজের উল্লেখ করা প্রয়োজন। পূর্বোক্ত সাপ্তাহিক পাঠক্রমে ভারতীয় ইতিহাস পাঠের নির্দেশ আছে। এই নির্দেশপালনেরও একটি নিদর্শন পাওয়া যায় মালতীপুঁথিতে। এই পুঁথিতে (পৃ ৩২) 'ঝান্সীর রানী' নামে একটি খণ্ডিত প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটির ভাষা ও রচনাপ্রণালীর প্রতি একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায়, এটি ইতিহাসশিক্ষার অঙ্গ হিসাবে রচিত এবং সে শিক্ষার বাহন ছিল কোনো ইংরেজি ইতিহাসপুস্তক। রচনাটির অনেক স্থলেই ইংরেজি বাক্‌পদ্ধতির অনুসরণ সুস্পষ্ট। এটিও পরবর্তী কালে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপে ভারতী পত্রিকায় (১২৮৪ অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধেও অন্যত্র[১] বিশদভাবে আলোচনা করেছি। এ স্থলে অধিকতর আলোচনা অনাবশ্যক।

৪

এবার মালতীপুঁথির রচনাকালের নিম্নতম সীমানির্ণয়ের প্রয়াস করা যাক। মালতীপুঁথির কয়েকটি স্থানে তারিখ লেখা আছে। কালক্রম অনুসারে সেগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া গেল।—

১। মালতীপুঁথির ৫৪-সংখ্যক পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তম্ভের উপরে 'শৈশবসংগীত' নামে একটি কবিতার শিরোনামের ডান পাশে লেখা আছে—"বোটে লিখিয়াছি— মঙ্গলবার ২৪ আশ্বিন ১৮৭৭"।[২]

যতদূর স্মরণ হচ্ছে এটাই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম তারিখ-দেওয়া কবিতা। বাংলা মাসের সঙ্গে ইংরেজি সালের উল্লেখটাও লক্ষণীয়। তারিখ লেখার এই রীতি রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল অনুসরণ করেছিলেন। 'মানসী' কাব্যের সময়েও (১৮৮৭-৯০) এই রীতি অনুসৃত হতে দেখি। 'সোনার তরী'তে (১৮৯৪) এই রীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। যা হক, উক্ত 'শৈশবসংগীত' রচনার তারিখটার পূর্ণ বাংলা ও ইংরেজি রূপ হচ্ছে যথাক্রমে ২৪ আশ্বিন ১২৮৪ ও ৯ অক্টোবর ১৮৭৭।

এই সময়টা ছিল ভারতী পত্রিকার যুগ। কিন্তু এই রচনাটি ভারতীতে (কিংবা অন্য কোনো সাময়িক পত্রে) প্রকাশিত হয় নি। রচনার প্রায় সাত বৎসর পরে এটি 'শৈশবসংগীত' গ্রন্থে (১৮৮৪) সংকলিত হয় 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' নামে। সংকলনকালে রচনাটি যথারীতি পরিমার্জিত ও সুসংস্কৃত হয়। 'শৈশবসংগীত' কবিতাটির শেষাংশ আছে মালতীপুঁথির ৫৭-সংখ্যক পৃষ্ঠায়। গ্রন্থে গ্রহণকালে এই

১ দ্রষ্টব্য : লেখকের 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ (১৯৬২), 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তা' প্রবন্ধ, পৃ ২৭৮-৮১।

২ 'মঙ্গলবার/২৪ আশ্বিন/১৮৭৭', এই অংশটা স্থানাভাববশতঃ একটু কাত-করা তিন ছত্রে লেখা।

অংশের প্রথম দশটি লাইন বাদে বাকি সবটুকুই বর্জিত হয়। কেন হয় তা পরে যথাস্থানে দেখাতে চেষ্টা করা যাবে।

রবীন্দ্রনাথের মনোজীবন তথা সাহিত্যজীবনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপলব্ধির পক্ষে এই কবিতাটির গুরুত্ব কম নয়। সে গুরুত্বের কিছু পরিচয় যথাস্থানে দেওয়া যাবে। এখানে তার কোনো কোনো অংশ উদ্‌ধৃত করা গেল। উদ্‌ধৃতিটিতে পুঁথির পাঠই যথাসম্ভব অনুসৃত হল। কাগজের জীর্ণতাবশতঃ পাতার নীচের দিকের যে অংশটুকু ছিন্ন বা অস্পষ্ট হয়ে গেছে (অর্থাৎ পড়া যায় নি), সেটুকু 'শৈশবসংগীত' গ্রন্থ থেকে উদ্‌ধৃত হল এবং আরম্ভে ও শেষে দুটি তারকাচিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট হল।—

"শৈশবসঙ্গীত। বোটে লিখিয়াছি
মঙ্গলবার ২৪ আশ্বিন ১৮৭৭

কেমন গো আমাদের ছোট এ কুটীরখানি,
স্মুখে নদীটি যায় চলি ;
মাথার উপরে তার বট অশথের ছায়া
সামনে বকুলগাছগুলি।
... ...
ওগো কল্পনা বালা, কত স্থখে ছেলেবেলা
এইখানে করেছি যাপন,
সেদিন পড়িলে মনে প্রাণ যেন কেঁদে উঠে,
হু হু কোরে উঠে শূণ্য মন।
... ...
*হা দেবি, তেমনি যদি থাকিতাম চিরকাল,
না ফুরাত সেই ছেলেবেলা,
হৃদয় তেমনি ভাবে করিত গো থল থল,
মরমেতে তরঙ্গের খেলা !*
... ...
এতদিন পরে আজ, অয়ি গো কল্পনা দেবী,
কি হল আমার দুরদশা,
অতীতে স্থখের স্মৃতি, বর্তমানে দুখজ্বালা,
ভবিষ্যতে দারুণ দুরাশা।
যেন রে আমারি ঘোর মনের আঁধার ছায়া
ঢাকিয়াছে সমস্ত ধরণী,

এই যে বাতাস বহে আমারি মর্মের যেন
দুখনিশ্বাসের প্রতিধ্বনি।
যেন রে এ জীবনের আঁধার সমুদ্রে আমি
ভাসায়ে দিয়াছি জীর্ণ তরি,
এসেছি যেখান হতে, অস্ফুট সে নীল তট
এখনো রয়েছে দৃষ্টি ভরি।
... ...
যেতেছি যেখানে ভাসি, সেদিকে চাহিয়া দেখি,
কিছুই ত না পাই উদ্দেশ।
আঁধার তরঙ্গরাশি সমুদ্রদিগন্তে মিশে
উনমত্ত অকূল অশেষ।
ক্ষুদ্র জীর্ণ ভগ্ন তরি একাকী যাইবে ভাসি,
যত দিনে ডুবিয়া না যায়,
হুহু করি ববে বায়ু, গর্জিবে উন্মত্ত ঊর্মি
ঝকমকি বিদ্যুতশিখায়।"

—শৈশবসঙ্গীত, মালতীপুঁথি, পৃ ৫৪ প্রথম স্তম্ভ এবং ৫৭ প্রথম স্তম্ভ ; এবং
অতীত ও ভবিষ্যৎ, 'শৈশব-সঙ্গীত', রবীন্দ্ররচনাবলী অচলিতসংগ্রহ ১, পৃ ৪৫১-৫৩

পুঁথিতে (পৃ ৫৭) এর পরে আরও অনেকখানি লেখা আছে। গ্রন্থে গ্রহণকালে এর পরের সবটুকুই বর্জিত হয়েছে।

কবিতাটি বোটে লেখা, কিন্তু কোন্ স্থানে তার উল্লেখ নেই। সে যা-ই হক, এটিতে যে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মানসিক অবস্থা অতি স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। অতীতের সুখস্মৃতি, বর্তমানের মনোবেদনা ও ভবিষ্যতের নৈরাশ্যে তাঁর হৃদয়মন তখন আচ্ছন্ন, পীড়িত। ইস্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়েছেন, ঘরের পড়াতেও বিশেষ ফল হচ্ছে না, অভিভাবকেরাও তাঁর সম্বন্ধে নিরাশ হয়েছেন, সর্বোপরি নিজেও বুঝতে পারছেন তাঁর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়—এই কবিতাটিতে কবির সেই সময়কার অবসন্ন চিত্তের বেদনা অতি করুণভাবে ফুটে উঠেছে। জীবনস্মৃতির নিম্নলিখিত অংশ-দুটিতে সম্ভবতঃ কবির এই সময়কার পরিবেশ ও মনোভাবের কথাই প্রকাশ পেয়েছে।—

"সেণ্ট জেবিয়ার্সে আমাদের ভরতি করিয়া দেওয়া হইল, সেখানেও কোনো ফল হইল না।

দাদারা মাঝে মাঝে এক-আধ বার চেষ্টা করিয়া আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন। আমাকে ভর্ৎসনা করাও ছাড়িয়া দিলেন। একদিন বড়দিদি কহিলেন, 'আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম, বড়ো হইলে রবি মানুষের মতো হইবে, কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল'। আমি বেশ বুঝিতাম, ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে।" —'জীবনস্মৃতি', প্রত্যাবর্তন

"ইস্কুলের বন্ধন নানা চেষ্টায় ছেদন করিলাম, বাড়িতেও শিক্ষকদিগকে আমল দিলাম না।…

বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনো দিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার না আর-কাহারও মনে রহিল। কাজেই কোনো কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম। সে লেখাও তেমনি।…উহার মধ্যে আমার যেটুকু সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ।"

—'জীবনস্মৃতি', সাহিত্যের সঙ্গী

এই দুটি অংশ পরস্পরের পরিপূরক। উক্ত 'কবিতার খাতা'-টিই আলোচ্যমান মালতীপুঁথি। এই খাতার কবিতাগুলিতেই কবির মনের 'অশান্তি' ও ভিতরকার 'দুরন্ত আক্ষেপ' প্রকাশ পেয়েছে জ্বলন্ত ভাষায়। এই 'শৈশবসংগীত' কবিতাটিই এই অশান্তি ও আক্ষেপের অন্যতম প্রধান নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অভিভাবকদের সব পরিকল্পনাই তাঁর একনিষ্ঠ কাব্যসাধনার প্রতিকূল ছিল। আর এটাই তাঁর চিত্তকে পীড়িত করত সব চেয়ে বেশি। 'শৈশবসংগীত' কবিতাটির উদ্ধৃত অংশটুকুতেই এই বেদনার আভাস স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। সম্ভবতঃ এই সময়েই তাঁকে বিলাতে পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করে আনবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। তাতে তাঁর কবিজীবনের অবসান ঘটবার আশঙ্কা আরও আসন্ন হয়ে দেখা দিল। কবিজীবনের এই অবসান-আশঙ্কার কথাই প্রকাশ পেয়েছে এই 'শৈশবসংগীত' কবিতাটির প্রায় অব্যবহিত পরবর্তী 'কবিকাহিনী' কাব্যটিতে। একটু পরেই ওই কাব্য থেকে যে অংশটুকু উদ্ধৃত করা যাবে, আশা করি তার থেকেই এ কথার সত্যতা অনুমান করা যাবে। কবির মৃত্যু অর্থাৎ কবিজীবনের অবসানই ওই কাব্যটির উপজীব্য বিষয়। বস্তুতঃ 'শৈশবসংগীত' (নামান্তরে 'অতীত ও ভবিষ্যৎ') কবিতাটিতে যা প্রকাশ পেয়েছে লিরিকসংগীত- বা গীতিকবিতা-রূপে, 'কবিকাহিনী'তে তাই প্রকাশ পেয়েছে আখ্যানরূপে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, 'শৈশবসংগীত' ও 'কবিকাহিনী'র রচনা-কালের ব্যবধান মাত্র ছয় দিন।

২। 'কবিকাহিনী' কাব্যখানির প্রাথমিক লিখিত রূপের আদ্যন্ত সবটুকুই পাওয়া যায় এই পুঁথিটিতে। কিন্তু তার বিভিন্ন অংশ পুঁথিটির (বর্তমান অবস্থায়) বিভিন্ন পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। কাব্যখানির রচনারম্ভের ও রচনাসমাপ্তির তারিখও দেওয়া আছে যথাস্থানে। তার প্রথমাংশটুকু (পৃ ৫৭ দ্বিতীয় স্তম্ভ) এ রকম।—

"বাড়িতে
১লা কার্তিক মঙ্গলবার

শুন কলপনা বালা, ছিল কোন কবি
বিজন কুটীরে একা ছেলেবেলা হোতে
তোমার অমৃতপানে আছিল মজিয়া।
তোমার বীণার ধ্বনি ঘুমায়ে ঘুমায়ে
শুনিত, দেখিত কত সুখের স্বপন।"

আর শেষাংশটুকু (পৃ ৬০ প্রথম স্তম্ভ) এ রকম।—

"[একদিন] হিমাদ্রির নিশীথবায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া।
... ...
কাছে বসি বিহগেরা গাইত গো গান
তটিনী তাহার সাথে মিশাইত তান!
কবির অন্তিমশয্যা-শিয়রের কাছে
কানন সৃজিত হল লতাগুল্মগাছে!
আজিও তটিনী সেথা যায় গো বহিয়া
বাতাস কত কি কথা যায় গো কহিয়া।

১২ই কার্তিক শনিবার
৪ দিন লিখি নাই।"

এই কাব্যখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় প্রথম বৎসরের ভারতী পত্রিকার শেষ চার সংখ্যায় (১২৮৪ পৌষ-চৈত্র)। অতঃপর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালের ৫ নভেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রার (১৮৭৮ সেপ্‌টেম্বর ২০) পরে। মালতীপুঁথির পাঠ ভারতীতে তথা মুদ্রিত গ্রন্থে কিছুকিছু পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়। কাব্যারম্ভের 'বিজন কুটীরে একা' মুদ্রিত গ্রন্থে হয়েছে 'বিজন কুটীর-তলে'। আর মালতীপুঁথির শেষ চার লাইন মুদ্রিত গ্রন্থে একেবারেই বর্জিত হয়েছে। রচনারম্ভ এবং রচনাসমাপ্তির তারিখ-দুটিও অনাবশ্যক বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের তথা মালতীপুঁথির ইতিহাস বিবৃতির পক্ষে ওই তারিখ-দুটি গুরুত্বহীন নয়।

ভারতীতে প্রকাশকালের সঙ্গে সংগতি রেখে হিসাব করলে সহজেই এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কবি-কাহিনীর রচনাকাল (১লা কার্তিক মঙ্গলবার থেকে ১২ই কার্তিক শনিবার) ও সাময়িক পত্রে প্রকাশকালের (১২৮৪ পৌষ-চৈত্র) ব্যবধান খুব কম। ১২৮৪ সালের ১লা কার্তিক ও ১২ই কার্তিক যথাক্রমে মঙ্গলবার ও শনিবারই বটে।

এই হিসাবে কবিকাহিনী রচনার আরম্ভ ও সমাপ্তির তারিখ দাঁড়ায় নিম্নলিখিত রূপ।—

আরম্ভ— ১২৮৪ কার্তিক ১ ॥ ইং ১৮৭৭ অক্‌টোবর ১৬, মঙ্গলবার
সমাপ্তি— ১২৮৪ কার্তিক ১২ ॥ ইং ১৮৭৭ অক্‌টোবর ২৭, শনিবার

রচনারম্ভের তারিখটির ঠিক উপরেই লেখা আছে 'বাড়িতে'। তাতে অনুমান হয় কবিকাহিনী রচিত হয় কলকাতায় স্বগৃহে। তার কয়েক দিন মাত্র পূর্বে 'শৈশবসংগীত' রচিত হয়েছিল 'বোটে'।

রচনাসমাপ্তির তারিখের নীচে লেখা আছে '৪ দিন লিখি নাই'। কবির এই মন্তব্যটুকুর তাৎপর্য এই যে, কবিকাহিনীর রচনাকাল মোট ১২ দিনের (১-১২ কার্তিক) মধ্যে ৪ দিন লেখা স্থগিত ছিল। সুতরাং

দেখা যাচ্ছে কবিকাহিনী লিখতে কবির লেগেছিল সবশুদ্ধ আট দিন। 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' লিখতে 'দিন সাতেক' লেগেছিল, সে কথা কবির পত্র থেকেই জানা গিয়েছে। সুতরাং কবিকাহিনী লিখতে যে মোট আট দিন লেগেছিল, এটা খুব বিচিত্র বা অপ্রত্যাশিত নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মালতীপুঁথির রচনাকাল ঘরের পড়ার যুগ থেকে ক্রমে ভারতীর যুগেও প্রসারিত হয়েছিল। এটাই হচ্ছে আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয়।

৩। কবিকাহিনীর শেষাংশের (পৃ ৬০) ঠিক নীচেই অন্য একটি ছোটো কবিতা লিখিত আছে। এটি প্রথমে লিখিত হয়েছিল পেন্‌সিলে, পরে অনেক অংশের উপরেই যদৃচ্ছাক্রমে কালি বুলানো আছে। এই কবিতাটির উপরে লেখা আছে, 'শনিবার— অগ্রহায়ণ ১৮৭৭'। এই তারিখটাও পেন্‌সিলে লেখা, তার উপরে কালি বুলানো হয় নি। কবিতাটির প্রথম লাইনের উপরেও কালি বুলানো হয় নি। তাতে মনে হয় উক্ত তারিখটা এই কবিতাটিরই রচনার তারিখ। কিন্তু তারিখটা অসম্পূর্ণ। অগ্রহায়ণ মাসের কোন্‌ দিন তা লেখা নেই। তার জায়গায় আছে একটি লম্বা রেখা (ড্যাশ)। মনে হয় বাংলা তারিখটা মনে ছিল না বলে ওই জায়গাটা ফাঁক রাখা হয়েছিল। ১৮৭৭ অর্থাৎ বাংলা ১২৮৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শনিবার ছিল চারটি— ৩, ১০, ১৭ ও ২৪ তারিখে। ইংরেজি তারিখ যথাক্রমে নভেম্বর ১৭, ২৪ এবং ডিসেম্বর ১ ও ৮। কবিতাটি এই চার দিনের কোনো এক দিনে রচিত হয়ে থাকবে। এটির প্রথম কয়েক পংক্তি এই।—

"পাষাণ হৃদয়ে কেন সঁপিনু হৃদয় ?
মর্মভেদী যন্ত্রণায় ফিরেও যে নাহি চায়
বুক ফেটে গেলেও যে কথা নাহি কয়,
প্রাণ দিয়ে সাধিলেও পায়ে ধরে কাঁদিলেও
এক তিল এক বিন্দু দয়া নাহি হয়,
হেরিলে গো অশ্রুরাশি বরষে ঘৃণার হাসি,
বিরক্তির তিরষ্কার তীব্র বিষময়।"

—মালতীপুঁথি, পৃ ৬০ প্রথম স্তম্ভ

'কবিকাহিনী'র পূর্ববর্তী 'শৈশবসংগীত' ও পরবর্তী এই রচনা, দুটিই বিষাদবেদনার পরিচায়ক। কবিকাহিনী রচিত হয়েছিল এই মনোবেদনার পরিবেশের মধ্যেই।

৪। মালতীপুঁথির ৫৬-সংখ্যক পৃষ্ঠায় 'হে কবিতা, হে কল্পনা' ইত্যাদি রচনাটির নীচে বাঁ দিকে ইংরেজি ও বাংলায় কাত করে লেখা আছে—

"Ahmedabad
1878 July 6th
আষাঢ় ২৩শে— শনিবার"

বাংলা ও ইংরেজি তারিখের মধ্যে সংগতি আছে। ১৮৭৮ সালের ৭ই জুলাই শনিবারই ছিল। বলা বাহুল্য, বাংলা সালটা হবে ১২৮৫। মনে রাখা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ বিলাতযাত্রা করেন ১৮৭৮ সেপ্‌টেম্বর ২০ তারিখে। এই কবিতাটি তার মাত্র আড়াই মাস পূর্বে রচিত। বিলাতযাত্রার প্রস্তুতি হিসাবে বিলাতি শিক্ষায় তালিম লাভের জন্যই তাঁকে কিছুকাল আমেদাবাদে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে বাস করতে হয়েছিল। এক দিকে বিলাতযাত্রার উদ্‌যোগ ও অপর দিকে ভারতীয় সাধনা, দুই-ই চলছিল সমানভাবে। যথাস্থানে এটির আরও কিছু পরিচয় দেওয়া যাবে।

৫। এই পুঁথিতে 'সারস্বত সমাজ'-এর প্রথম অধিবেশনের প্রতিবেদনলিপির একটি খসড়াও স্থান পেয়েছে। এটির প্রথম অংশটুকু এই।—

"সারস্বত সমাজ

১২৮৯ শালে শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবারে ২রা তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি ৬ নম্বর ভবনে সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়।

ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।"

—মালতীপুঁথি, পৃ ২৮

এই অধিবেশনেই রবীন্দ্রনাথ সারস্বত সমাজের অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত হন (পুঁথি, পৃ ২৯)। মালতীপুঁথিতে প্রাপ্ত এই প্রতিবেদনটি স্পষ্টতঃই রবীন্দ্রনাথের লিখিত। এই প্রতিবেদন থেকে এ কথাও সহজেই বোঝা যায় যে, প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে এই সমাজের একটি করে অধিবেশন হবে বলে স্থির করা হয়েছিল।

প্রথমেই বলা দরকার যে, ১২৮৯ সালে শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবার ছিল ১লা তারিখ, '২রা' নয়। ২রা তারিখ ছিল সোমবার। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিবেদনটি প্রথম অধিবেশনের পরেই লিখে রাখেন নি, লিখেছিলেন বেশ কিছু দিন পরে, হয়তো দ্বিতীয় অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে। সম্ভবতঃ এটাই এই তারিখভ্রান্তির হেতু। ইংরেজি তারিখ অনুসরণের নিত্য অভ্যাসও তার সহায়তা করে থাকতে পারে। উক্ত খসড়া প্রতিবেদনে মাসের তারিখের চেয়ে 'প্রথম রবিবারে' কথাটার উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, ১২৮৯ সালে ১লা শ্রাবণ (ইংরেজি ১৮৮২ জুলাই ১৬) রবিবারেই সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল, দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছিল পরের মাসের প্রথম রবিবারে অর্থাৎ ১২৮৯ ভাদ্র ৫ (ইং ১৮৮২ অগস্ট ২০) তারিখে, আর এই তারিখের (দ্বিতীয়) অধিবেশনেই উক্ত প্রতিবেদনটি পড়া হয়েছিল।

আমেদাবাদের পরে কিছুদিন বোম্বাইবাস। এর পরে রবীন্দ্রনাথ বিলাতযাত্রা করেন ১৮৭৮ সেপ্‌টেম্বর ২০ তারিখে। প্রায় দেড় বৎসর বিলাতবাসের পরে দেশে ফিরে আসেন ১৮৮০ সালের ফেব্রুআরি মাসে। দেশে ফেরার পরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনে এক নূতন পর্ব দেখা দেয়। ১৮৮১ সালেই বাল্মীকিপ্রতিভা, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড ও য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র, একে একে এই চারখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৮২ সালের

প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয় 'সন্ধ্যাসংগীত'। সারস্বত সমাজের উক্ত প্রতিবেদনটি তারও পরবর্তী। এই সময়েই 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসটি ভারতী পত্রিকার বারো সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল (১২৮৮ কার্তিক - ১২৮৯ আশ্বিন)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মালতীপুঁথির রচনাকাল ঘরের পড়ার সময় থেকে অন্ততঃ বউঠাকুরানীর হাট প্রকাশের সময় পর্যন্ত প্রসারিত। বস্তুতঃ এই উপন্যাসের 'উপহার' কবিতার প্রাথমিক রূপটিও পাওয়া গিয়েছে এই পুঁথিতে (১৯-সংখ্যক পৃষ্ঠার উলটো পিঠে)। এই পুঁথির পাঠ ও বউঠাকুরানীর হাট গ্রন্থের পাঠ অবিকল এক নয়। গ্রন্থের পাঠ অনেকাংশেই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত। ভারতীতে প্রকাশকালে বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের পুরোভাগে এই 'উপহার' কবিতাটি ছিল না। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়েই (১৮৮৩ জানুআরি) এটি কিছু পরিমার্জিতরূপে উপন্যাসটির পুরোভাগে স্থান পায় 'উপহার' নামে। কবিতাটির রচনাকাল নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায় নি। যদি এটি বউঠাকুরানীর হাটের 'উপহার' হিসাবেই রচিত হয়ে থাকে, তবে মালতীপুঁথির রচনাকালকে ১৮৮২ সালের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত টেনে আনতে হয়।

৫

অতএব মোটামুটিভাবে বলা যায়, ঘরের পড়ার যুগ (১৮৭৪) থেকে বউঠাকুরানীর হাট গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব (১৮৮২) পর্যন্ত নয় বৎসর ধরে কবির রচনার কাজ চলছিল এই পুঁথিখানিতে। এই প্রসঙ্গে দুটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন।—

এক। কবির এই সময়কার সব রচনাই যে এই পুঁথিতে লিখিত হয়েছিল তা নয়। তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী অবিশ্রান্ত রচনা এই পুঁথিখানির ক্ষুদ্র আয়তনের পক্ষে ধারণ করা সম্ভবই ছিল না। কাজেই কোনো সন্দেহ নেই যে, মালতীপুঁথির সঙ্গে সঙ্গে অন্য পুঁথিতেও তাঁর লেখা চলছিল। এই সমকালীন পুঁথিগুলির মধ্যে কোনো-কোনোটি (যেমন ভগ্নহৃদয়ের পাণ্ডুলিপি) সংগ্রহ করা গেছে, বাকিগুলির সন্ধান পাওয়া যায় নি।

দুই। মালতীপুঁথির সমকালে (১৮৭৪-৮৩) যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল সেগুলি সবই যে এক-একটি স্বতন্ত্র খাতায় রচিত হয়েছিল তাও নয়। একই গ্রন্থের বিভিন্ন রচনা নানা পাণ্ডুলিপিতে ছড়ানো ছিল। তার ফলে একই পুঁথিতে নানা গ্রন্থের কিছুকিছু রচনা একত্র সঞ্চিত হচ্ছিল। মালতীপুঁথিই তার অন্যতম নিদর্শন। এই পুঁথিতে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির রচনা পাওয়া গিয়েছে। এগুলি সবই রচনার প্রাথমিক খসড়া রূপ, পরিমার্জিত পূর্ণরূপ নয়।—

১। শৈশবসংগীত। রচনাকাল ১৮৭৪-৭৯, প্রকাশ ১৮৮৪। এই গ্রন্থের ফুলবালা, অতীত ও ভবিষ্যৎ, প্রতিশোধ, লীলা, অপ্সরাপ্রেম, ভগ্নতরী প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার (আংশিক বা পূর্ণ) খসড়া রূপ লিখিত আছে এই পুঁথিতে। জীবনস্মৃতি থেকে জানা যায় 'ভগ্নতরী' কবিতাটি রচিত হয়েছিল কবির বিলাতবাসকালে (১৮৭৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৮০ ফেব্রুআরি)।

২। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। রচনা অনেকাংশে শৈশবসংগীতের সমকালীন, প্রকাশ ১৮৮৪। এই গ্রন্থের একটিমাত্র কবিতা (১২-সংখ্যক) আছে এই পুঁথিতে (পৃ ২৪)। এটি সম্ভবতঃ কোনো সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় নি। একেবারেই গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। গ্রন্থে গ্রহণকালে এর অনেকগুলি পংক্তি বর্জিত এবং কতকগুলি পংক্তি পরিমার্জিত হয়েছে।

৩। ভগ্নহৃদয়। প্রকাশ ১৮৮১। এই নাট্যকাব্যখানির রচনাকাল সম্বন্ধে কবির উক্তি এই।—

"বিলাতে আর-একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি। ভগ্নহৃদয় নামে ইহা ছাপানো হইয়াছিল।···

'ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো'।"

—'জীবনস্মৃতি', ভগ্নহৃদয়

এই কাব্যে আছে মোট চৌত্রিশটি সর্গ। তার প্রথম ছয় সর্গ ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (১২৮৭ কার্তিক-ফাল্গুন)।

এই কাব্যের প্রথম, পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম, দশম, দ্বাদশ, উনত্রিংশ, চতুস্ত্রিংশ প্রভৃতি বিভিন্ন সর্গের অনেক অংশই এই মালতীপুঁথিতে পাওয়া গেছে। এই অংশগুলি পুঁথির নানা স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে।

এ স্থানে বলা প্রয়োজন যে, ভগ্নহৃদয়ের একটি স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপিও রক্ষিত আছে রবীন্দ্রভবনে। মালতীপুঁথিতে যা আছে অবিন্যস্ত খসড়ারূপে, তারই অপেক্ষাকৃত সুবিন্যস্ত ও পরিমার্জিত রূপ আছে এই পাণ্ডুলিপিটিতে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' ইত্যাদি গানটির প্রাথমিক খসড়াটিও পাওয়া গিয়েছে এই পুঁথিতেই (পৃ ২৬)। এই পুঁথিতে এর প্রথম দুটি পংক্তি প্রথমে লেখা হয়েছিল এ রকম।—

"তুমি যদি হও মোর সংসারের ধ্রুবতারা — তা হোলে কখনো আর হব নাক' পথহারা।"

—মালতীপুঁথি, পৃ ২৬

পরে এই লাইনের দুই অংশের উপরে অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে দুটি আংশিক পাঠান্তর লিখিত হয়, কিন্তু মূলপাঠের অনভীষ্ট অংশদুটি অকর্তিতই থেকে যায়। তবু বোঝা যায় ওই দুটি পদ্যপংক্তিকে এক লাইনে না রেখে দুই লাইনে বিন্যস্ত করলে কবির অভিপ্রেত শেষ পাঠ দাঁড়াবে এ রকম।—

"তোমারেই করিয়াছি সংসারের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক' পথহারা।"

'সংসারের' স্থলে 'জীবনের' হয়েছে ভারতী পত্রিকায় (১২৮৮ কার্তিক)।

এই গানটি ভারতীতে প্রকাশিত হয় 'ভগ্নহৃদয়'এর 'উপহার' রূপে। ভগ্নহৃদয় যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন এই গানটি বর্জিত হয় ও তংস্থলে অন্য একটি রচনা 'উপহার' রূপে মুদ্রিত হয়। এই গানটি

পরে ব্রহ্মসংগীত রূপে স্বীকৃত হয়।[১] কিন্তু গীতবিতানে এটি স্থান পেয়েছে 'প্রেম' পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে (১২১-সংখ্যক গান)।

'ভগ্নহৃদয়'এর 'উপহার'-কবিতা নির্বাচন বিষয়ে আরও একটি জ্ঞাতব্য তথ্য আছে এই পুঁথিটিতে। এটিতে 'উপহারগীতি' নামে একটি রচনা আছে। তার প্রথম চার লাইন এই।—

"ছেলেবেলা হোতে বালা, যত গাঁথিয়াছি মালা
যত বনফুল আমি তুলেছি যতনে
ছুটিয়া তোমারি কোলে, ধরিয়া তোমারি গলে
পরায়ে দিয়াছি সখি তোমারি চরণে।"

—মালতীপুঁথি, পৃ ৫৭ দ্বিতীয় স্তম্ভ

শিরোনামের পাশেই লেখা আছে—'ভগ্নহৃদয়ের উপরে'।[২] মনে হয় এই কবিতাটিই প্রথমে 'ভগ্নহৃদয়'এর 'উপহার'-কবিতা রূপে নির্বাচিত হয়েছিল। পরে অবশ্য এর পরিবর্তে নির্বাচিত হয় 'তোমারেই করিয়াছি' ইত্যাদি গানটি। এই 'উপহারগীতি' রচনাটির নীচে লেখা আছে 'Les Poetes হইতে অনুবাদিত'। পুঁথিতে এটি লিখিত আছে 'শৈশবসংগীত' কবিতাটির (রচনাকাল ১২৮৪ আশ্বিন ২৪) ঠিক পরে এবং 'কবিকাহিনী'র (রচনারম্ভ ১২৮৪ কার্তিক ১) অব্যবহিত পূর্বে। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, এই অনুবাদ-কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১২৮৪ সালে আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহে।

৪। রুদ্রচণ্ড। প্রকাশ ১৮৮১। এই কাব্যনাটিকাখানি 'ভগ্নহৃদয়'এর সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয়। এই নাটিকাটিতে গান আছে মাত্র দুটি। দুটিই তৃতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত। সে দুটি এই।—

এক। বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল।
দুই। তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল।

দ্বিতীয় গানটি অষ্টম দৃশ্যে পুনরুক্ত হয়েছে। আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয় এই যে, এই দুটি গানেরই খসড়া আছে মালতীপুঁথিতে— প্রথমটি ১৫-১৬-সংখ্যক পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয়টির প্রথমাংশ ১৬-সংখ্যক পৃষ্ঠায় ও শেষাংশ ১৩-সংখ্যক পৃষ্ঠায়।

৫। য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র। প্রকাশ ১৮৮১। এই গ্রন্থের পঞ্চম পত্রে সংস্কৃত শিখরিণী ছন্দে রচিত একটি কবিতা আছে। তার প্রথম শ্লোকটি এই।—

"বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্যগৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগবিহগপ্রাণ দৌড়ে।

---

১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম খণ্ড (১৩৬৭ পৌষ), পৃ ৮০ এবং ১১১ ও পাদটীকা ১।

২ মালতীপুঁথির বর্তমান বাঁধানো অবস্থায় পাতার কোণ ভেঙে যাওয়ায় 'হৃদয়ের উপরে' অংশটুকু লুপ্ত হয়ে গেছে, শুধু 'ভগ্ন'-টুকু অবশিষ্ট রয়েছে। পাণ্ডুলিপি-প্রাপ্তির সময়ে আমি নিজে তার পূর্ণরূপটি দেখেছি। তখন পুঁথিখানি নকল করিয়েও রেখেছিলাম। সে নকল এখনও আছে। তাতেও ওই মন্তব্যের পূর্ণরূপটি পাওয়া যায়।

স্বদেশে কাঁদে সে, গুরুজনবশে কিচ্ছু হয় না—
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি-পিরহনে মান রয় না।"

এই পঞ্চম পত্রটি প্রকাশিত হয় ভারতী পত্রিকার ১২৮৬ আশ্বিন-সংখ্যায়। ওই পত্রে এই কবিতাটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"দেশ থেকে আমার কোনো মান্য বন্ধু শিখরিণী ছন্দে একটা কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেইটে তোমাকে না শুনিয়ে পারছি নে।"

অন্য নানা সূত্র[১] থেকে জানা যায়, উক্ত 'মান্য বন্ধু' হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ।

আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয় এই যে, দ্বিজেন্দ্রনাথের এই কৌতুকরচনাটি সমগ্রভাবেই লিখিত আছে মালতীপুঁথিতে (পৃ ৫১)। বোঝা যাচ্ছে বিলাতবাসকালেও এই পুঁথিটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল এবং তখনই তিনি বড়োদাদার এই কৌতুককবিতাটি এই বিচিত্র খসড়া খাতাটিতে নকল করে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন।

৬। বউঠাকুরানীর হাট। প্রকাশ ১৮৮৩। এই গ্রন্থের 'উপহার' কবিতাটির প্রাথমিক রূপও পাওয়া গিয়েছে এই মালতীপুঁথিতেই, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এ স্থলে অধিকতর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

৭। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নবরত্নমালা' (১৯০৭)। এই গ্রন্থের ভূমিকায় সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'ইহাতে সংস্কৃতের যে-সকল অনুবাদ আছে তন্মধ্যে আমার নিজের ছাড়া কতকগুলি শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের কৃত'। এই গ্রন্থে তুকারামের অনেকগুলি অভঙ্গের পদ্যানুবাদও আছে। এই অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের হাত ছিল কিনা সে বিষয়ে গ্রন্থকার নীরব। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনীকার মনে করেন এই পদ্যানুবাদ রবীন্দ্রনাথেরই। তিনি বলেন—

"সত্যেন্দ্রনাথ তুকারামের অভঙ্গ মারাঠা হইতে বুঝাইয়া দেন, রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন। বহু বৎসর পরে 'নবরত্নমালা'র মধ্যে সেই অনুবাদের কয়েকটি স্থান পাইয়াছিল।

…রবীন্দ্রসদনের মালতীপুঁথির মধ্যে কয়েকটি পাতায় তুকারামের অভঙ্গের অনুবাদ আছে। নবরত্নমালার ভাষার সহিত সামান্য পার্থক্য কোনো কোনো স্থানে দেখা যায়।"

—'রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম খণ্ড (১৩৬৭), পৃ ৮০ এবং পাদটীকা ৩

এই অনুবাদগুলি আসলে রবীন্দ্রনাথের কৃত না হতেও পারে। 'বিলাতে পালাতে' ইত্যাদি দ্বিজেন্দ্রকৃত কৌতুকরচনাটি তিনি যেভাবে মালতীপুঁথিতে নকল করে রেখেছিলেন, সত্যেন্দ্রকৃত অভঙ্গ-অনুবাদগুলিও হয়তো সেভাবেই নকল করে নিয়েছিলেন। স্বকৃত অনুবাদই হক আর নকলই হক, সেগুলি যে ১৮৭৮ সালে আমেদাবাদে বাসকালে লেখা হয়েছিল তাতে বোধ করি সন্দেহ নেই। আমেদাবাদের পরে বোম্বাইবাসকালেরও কিছুকিছু রচনা আছে মালতীপুঁথিতে। অনাবশ্যকবোধে সেগুলির পরিচয়-প্রসঙ্গ থেকে বিরত থাকা গেল।

---

১ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৬২ সংস্করণ), পৃ ২২১ এবং ৩০৪

৬

এখানে আমেদাবাদে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি স্বকীয় রচনার কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এটির রচনার তারিখ ১৮৭৮ জুলাই ৬। মালতীপুঁথির কালক্রমপ্রসঙ্গে পূর্বেই এটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই রচনাটির কিছু অংশ উদ্‌ধৃত করা প্রয়োজন।—

"হে কবিতা, হে কল্পনা,
জাগাও জাগাও দেবি উঠাও আমারে দীনহীন,
ঢাল এ হৃদয়মাঝে জ্বলন্ত-অনলময় বল!
দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন
নির্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন বল।
… … …
নির্জীব হৃদয় মোর পড়িতেছে ভূমিতে লুটায়ে,
এস দেবি এস, মোরে রাখ এ মূর্ছার ঘোরে,
বলহীন হৃদয়েরে দাও দেবি দাও গো উঠায়ে।
দাও দেবি সে ক্ষমতা, ওগো দেবি, শিখাও সে মায়া,
যাহাতে জ্বলন্ত দগ্ধ নিরানন্দ মরুমাঝে থাকি
হৃদয় উপরে পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া,
বাহিরের রৌদ্র হোতে মাতৃস্নেহে আবরিয়া রাখি।
… … …
অজ্ঞাত পৃথিবীতলে অকর্মণ্য অনাথ অজ্ঞান
উঠাও উঠাও মোরে, করহ নূতন প্রাণদান।
পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব, যুঝিব দিনরাত,
কালের প্রস্তরপটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম;
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিব না এ শরীর পাত,
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্মেরি অনুষ্ঠান,
অগম্য উন্নতিপথে পৃথ্বিতরে গঠিব সোপান।
তাই বলি দেবি,
সংসারের ভগ্নোদ্যম অবসন্ন দুর্বল পথিকে
কর গো জীবনদান তোমার ও অমৃতনিষেকে ॥১॥

Ahmedabad
1878 July 6th
আষাঢ় ২৩শে — শনিবার"

—মালতীপুঁথি, পৃ ৫৬

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে এই রচনাটির তাৎপর্য অপরিসীম। সে বিশ্লেষণ আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।

রবীন্দ্রজীবনীকার বলেন, "আমার মনে হয় ইহাও ইংরেজি হইতে অনুবাদ"।[১] এই অনুমান ঠিক নয়। সজনীকান্ত দাস দেখিয়েছেন, এই রচনাটি ১২৯২ চৈত্র-সংখ্যা 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'অবসাদ' নামে।[২] অন্যান্য সব রচনার ন্যায় পত্রিকায় প্রকাশকালে এটিরও কিছুকিছু সংস্কার করা হয়।

কিন্তু সজনীকান্ত তাঁর 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি' প্রবন্ধে এটির রচনাকাল সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন—

"কবিতাটির শেষে 'বালক'-রচিত বলিয়া উল্লেখ আছে এবং এই উল্লেখ যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকৃত তাহাতে সংশয় নাই। কারণ, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী নামে সম্পাদক থাকিলেও আসলে রবীন্দ্রনাথই সম্পাদক, পরিচালক ও কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তাই আমাদের মনে হয় মালতীপুঁথির প্রভাতবাবুকর্তৃক প্রদত্ত তারিখে কিছু ভুল আছে। ১৮৭৮ সনের ৬ই জুলাই তারিখে লিখিত কবিতা ১৮৮৬ মার্চ মাসে পত্রস্থ করিয়া তাহাকে বালকের লেখা বলিয়া জাহির অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ করিবেন না। পৌনে পঁচিশ বৎসরের যুবক সোওয়া সতেরো বৎসরের যুবাকে 'বালক' বলিয়া অবজ্ঞা করিতেই পারেন না।"

—'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য', পৃ ১০৬-০৭

সজনীকান্তের এই যুক্তি দুর্বলতামুক্ত নয়। পঁচিশ বৎসরের মানুষকে 'যুবক' বলা হয় বটে, কিন্তু সতেরো বৎসরের মানুষকে সাধারণতঃ 'বালক'ই বলা হয়, 'যুবা' বলা হয় না। কবিতাটিকে 'বালকরচিত' বলার মধ্যে 'জাহির' করা বা 'অবজ্ঞা' প্রকাশের প্রশ্নই আসে না।

১৮৮৪ সালে প্রকাশিত 'শৈশবসংগীত' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

"এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম, সুতরাং ইহাকে ঠিক শৈশবসংগীত বলা যায় কিনা সন্দেহ।...বাল্যকালের লেখার উপর কেমন-একটু বিশেষ মায়া থাকে যাহাতে কতকটা অন্ধ করিয়া রাখে।"

এটি লেখা রবীন্দ্রনাথের তেইশ বৎসর বয়সে। শৈশবসংগীতের অন্ততঃ একটি রচনা ('ভগ্নতরী') আঠারো বৎসর বয়সে লেখা, বিলাতে ১৮৭৯ সালে। তেইশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ আঠারো বৎসর বয়সের রচনাকে 'বাল্য'কালের রচনা বলতে দ্বিধা করেন নি। শৈশবসংগীতের এই 'ভূমিকা'য় জাহির করা বা অবজ্ঞাপ্রকাশের সুরও নেই। সুতরাং পঁচিশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সতেরো বৎসর বয়সের রচনাকে ('অবসাদ' কবিতাটি 'ভগ্নতরী'র এক বৎসর আগে লেখা) 'বালক'-রচিত বলা অপ্রত্যাশিত নয়, অসমীচীনও নয়। আঠারো বৎসর বয়সের রচনাকে 'শৈশব'-সংগীত বলা না গেলেও 'বাল্য'-রচনা বলা যায় নিশ্চয়ই।

---

১ 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম খণ্ড (১৩৬৭), পৃ ৮১ পাদটীকা ১।

২ 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭), পৃ ১০৬।

এই কবিতাটির রচনাকাল সম্বন্ধে সজনীকান্ত তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বলেছেন—

"আমার অনুমান এই কবিতার রচনাকাল আরও অন্ততঃ চার-পাঁচ বৎসর পূর্বে, কবিতাটি 'অভিলাষ' কবিতার সমসাময়িক হওয়াই সম্ভব। রবীন্দ্রকাব্যমহীরুহের সদ্যজাত দ্বিদল অঙ্কুর—'অভিলাষ' ও 'অবসাদ'।"

—'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য', পৃ ১০৮

অতঃপর তিনি এই দুই কবিতার সমকালীনতার পক্ষে অনেক যুক্তি উত্থাপন করেছেন। 'অবসাদ' কবিতাটির কালনির্ণয় ও তার সমর্থক যুক্তি, কোনোটাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রথমেই 'অভিলাষ' কবিতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। সে ব্যাখ্যাও সমর্থনযোগ্য নয়। যথার্থ ব্যাখ্যা অন্যরূপ বলেই আমাদের ধারণা। এই কবিতাটির যথার্থ তাৎপর্য অন্যত্র[১] বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি। 'অভিলাষ' কবিতার তাৎপর্য যদি অন্যরূপ বলে স্বীকার্য হয়, তা হলে 'অবসাদ' কবিতাটিকে তার পরিপূরক বলে গ্রহণ করাও সমীচীন হবে না।

'অবসাদ' কবিতাটিতে, বিশেষতঃ 'অকর্মণ্য অনাথ অজ্ঞান', 'সংসারের ভগ্নোদ্যম অবসন্ন দুর্বল পথিক' ইত্যাদি বর্ণনায়—হৃদয়ের যে বেদনা ও অশান্তি প্রকাশ পেয়েছে, তা সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল ত্যাগ (অনুমান ১৮৭৬) ও ঘরের পড়ার পরবর্তী যুগের (১৮৭৭-৭৮) পক্ষেই প্রযোজ্য, 'অভিলাষ' রচনার সময়ের (১৮৭৪) পক্ষে নয়।

বস্তুতঃ এই 'অবসাদ' কবিতাটি (১৮৭৮ জুলাই ৬) পূর্বোক্ত 'শৈশবসংগীত' ও 'কবিকাহিনী' রচনা-দুটির (দুটিই রচিত ১৮৭৭ অক্‌টোবর মাসে) সঙ্গে একই ভাবসূত্রে গ্রথিত। সময়ের দিক্ থেকেও এটি ওই দুটি রচনার থেকে বেশি দূরবর্তী নয়। বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই তিনটি রচনারই সম্বোধনপাত্রী ও আশ্রয়স্থল 'কল্পনাবালা' বা 'কল্পনাদেবী'। কবির নিজের উক্তি ('কোনো কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম') থেকেও জানা যায়, এ সময়কার অন্তহীন নৈরাশ্যের মধ্যে কাব্যচর্চাকেই তিনি একমাত্র আশ্রয়স্থল বলে গ্রহণ করেছিলেন। শৈশবসংগীত, কবিকাহিনী ও অবসাদ, এই তিনটি রচনাই যে একই 'কবিতার খাতা'য় পাওয়া গিয়েছে, সে কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'শৈশবসংগীত' কবিতাটির আলোচনার উপসংহারে বিলাতযাত্রাপ্রসঙ্গে যে মন্তব্য করা হয়েছে, 'অবসাদ' কবিতাটি সম্বন্ধে তা অধিকতর, অন্ততঃ সমভাবে প্রযোজ্য।

এই তিনটি রচনা একই ভাবসূত্রে গ্রথিত, কিন্তু কিছু পার্থক্যও আছে। শৈশবসংগীত ও অবসাদ, এই দুই কবিতায় কবিচিত্তের বেদনা ও বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে প্রত্যক্ষভাবে ও তীব্র ভাষায়। তাই এ-দুটি তিনি তৎকালে ভারতী বা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করা সমীচীন মনে করেন নি। কবিকাহিনীতে সে বেদনা ও নৈরাশ্য আখ্যায়িকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন। তাই তা প্রকাশ করার বাধা ছিল না। 'শৈশবসংগীত' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলেছেন, "আমি যাহার বিশেষ কিছু-না-কিছু গুণ না দেখিতে পাইয়াছি তাহা ছাপাই নাই"। তাতেই বোঝা যাচ্ছে, তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সের সব রচনাই

---

১ দ্রষ্টব্য : লেখকের 'ভোরের পাখি' প্রবন্ধ, 'শতবার্ষিক জয়ন্তী-উৎসর্গ' গ্রন্থ (১৯৬১)।

ওই গ্রন্থে নির্বিচারে গৃহীত হয় নি। অর্থাৎ কিছুকিছু রচনা আংশিক বা সমগ্রভাবেই বর্জিত হয়েছিল। 'শৈশবসংগীত' (নামান্তরে 'অতীত ও ভবিষ্যং') কবিতাটিতে ব্যক্তিগত দুঃখবেদনার কথা অতি প্রত্যক্ষভাবেই সুগোচর। তাই এটি ভারতীতে প্রকাশিত হয় নি। পরবর্তী কালের (১৮৮৪) বিচারে দেখা গেল এই অতিপ্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত দুঃখবেদনা নিরাবরণে প্রকাশ পেয়েছে কবিতাটির শেষাংশে, প্রথমাংশে সে বেদনা বহুলপরিমাণেই কাব্যিক ও আলংকারিক আবরণে প্রচ্ছন্ন, ফলে এই অংশটুকু সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনুপভোগ্য না হতেও পারে। এই বিবেচনায় শৈশবসংগীত গ্রন্থে কবিতাটির শেষাংশ বর্জিত ও প্রথমাংশ গৃহীত হল 'অতীত ও ভবিষ্যং' নামে। কিন্তু 'অবসাদ' কবিতাটির সম্পর্কে এই যুক্তি প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হয় নি, তাই এটি 'শৈশবসংগীত' গ্রন্থে স্থান পেল না। আরও পরবর্তী কালে এই কবিতাটি বালকের রচনা হিসাবে অমার্জনীয় এবং বালকপাঠকের অনুপযোগী না হতেও পারে, এই বোধে এটিকে 'বালক' পত্রিকায় স্থান দেন 'বালকরচিত' পরিচয়েই। কিন্তু কোনো কাব্যগ্রন্থে স্থান দেন নি, এমন কি 'কড়ি ও কোমল' বা 'শিশু' গ্রন্থেও না। ও দুই গ্রন্থের বিষয়বস্তু বা ভাবাদর্শের সঙ্গে এই কবিতাটির মিল নেই, রচনাভঙ্গিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

'অবসাদ' কবিতাটির একটি বিশিষ্ট গুণ আছে যা 'শৈশবসংগীত' কবিতায় বা 'কবিকাহিনী'তে নেই। সেটি হচ্ছে সংকল্পশক্তির প্রকাশ। বস্তুত: 'অবসাদ' নাম দেওয়াতে কবিতাটির প্রতি সুবিচার করা হয়েছে বলে মনে করি না। 'সংকল্প' নাম দিলেই অধিকতর সমীচীন হত। হৃদয়মনের গাঢ়তম অবসাদ পরিণামে কঠিনতম সংকল্পে রূপান্তরিত হয়েছে এই কবিতাটিতে। তাই তাঁর লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছে এই কঠিন সংকল্পবাণী—'কালের প্রস্তরপটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম'। এই সংকল্পবাক্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনব্রত ও সাহিত্যসাধনার নিগূঢ় মর্মকথা। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করবেন। রবীন্দ্রজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর এই জীবনসত্য বারে বারেই আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর নানা রচনায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কল্পনা' কাব্যের 'অশেষ' কবিতাটির কথা উল্লেখ করা যায়। এই কবিতাটিও 'কল্পনা'-দেবীকে সম্বোধন করেই লেখা। এই কবিতাটির

"হবে, হবে, হবে জয়,
হে দেবী, করি নে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বান বাণী
সফল করিব রানী,
হে মহিমাময়ী॥"

ইত্যাদি উক্তির কথা স্মরণ করলেই 'অবসাদ' কবিতাটির সহিত এর সাধর্ম্য উপলব্ধি করা যাবে।

এই 'অবসাদ' কবিতাটির আর-এক গুণ এর ভাষার বলিষ্ঠতা এবং আঠারো মাত্রার দীর্ঘ পরিসরের মধ্যে এর মিল ও ছন্দের অকুণ্ঠিত মুক্তগতি। এই ভাষাগত বলিষ্ঠতা ও ছন্দোগত মুক্তগতি কবিতাটির

ভাবগত কঠিন সংকল্পবদ্ধতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে। এ দিক্ থেকেও এটির সঙ্গে শৈশব-সংগীত বা কবিকাহিনীর কোনো তুলনা হয় না।

৭

অতঃপর আর-একটি কবিতার একটু পরিচয় দিয়েই মালতীপুঁথির পরিচয়প্রসঙ্গ শেষ করব। পুঁথিটির বর্তমান রূপে এটি তার প্রথম কবিতা। অন্য অনেক রচনার ন্যায় এটিরও কোনো শিরোনাম দেওয়া নেই। কিন্তু উপরে লেখা আছে 'প্রথম সর্গ'। এর থেকেই বোঝা যায় কোনো নাতিক্ষুদ্র কাব্যের অঙ্গ হিসাবেই এটি রচিত এবং সে কাব্যটি একটি আখ্যানকাব্য। এই অসমাপ্ত রচনাটি কোথাও প্রকাশিত হয় নি এবং এর সম্বন্ধে কবির কোনো উক্তিও জানা নেই। তবু এটির সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা যেতে পারে।

প্রথম সর্গের যে অংশটুকু পাওয়া গিয়েছে তার সবটুকুই কোনো কবির খেদোক্তি। মনে হয় যেন এই কবিই পরিকল্পিত কাব্যটির নায়ক। কবির খেদের কারণ দুটি। এক, প্রকৃতির মাধুর্য, পল্লীজীবনের স্নেহপ্রীতি ও 'হৃদয়ের স্বাধীনতা' থেকে বঞ্চিত হয়ে 'গর্বিত নগরের' কোলাহল ও 'হৃদয়বিহীন প্রাসাদ' ও ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের মধ্যে তিনি নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। দুই, 'অমিয়া' নামে কোনো বালিকাকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন জননী বা ভগ্নীর মতো, তার সে ভালোবাসা থেকেও তিনি বঞ্চিত হয়েছেন চিরকালের মতো, কেননা অমিয়া সম্ভবতঃ আর ইহলোকে নেই।—

"কেহই আশ্রয় যবে ছিল না, অমিয়া,
জননী, ভগ্নীর মত বেসেছিলে ভাল,
সে কি আর এ জনমে পারিব ভূলিতে ?"

—মালতীপুঁথি, পৃ ৩ দ্বিতীয় স্তম্ভ

এই দুটি তথ্যের সঙ্গে 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকাটির (১৮৮১) কাহিনীগত সাদৃশ্যের কথা স্বভাবতঃই মনে পড়ে। এই কাব্যনাটিকাটির নায়কও একজন কবি, হস্তিনাপতি পৃথ্বীরাজের সভাসদ্ চাঁদকবি। এই চাঁদকবিও নগরবাসী, হস্তিনার রাজপ্রাসাদে ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের মধ্যে লালিত। এই কবি ভালোবাসত একটি বালিকাকে, তারও নাম 'অমিয়া'। চাঁদকবি ও অমিয়ার যে প্রীতি, তাও ভাইবোনেরই প্রীতি। এই প্রীতিই নাটিকাটির কেন্দ্রকথা। অমিয়ার মৃত্যু ও চাঁদকবির আক্ষেপোক্তিতেই নাট্যকাহিনীর সমাপ্তি। আর আমাদের আলোচ্য রচনাটির আরম্ভ অমিয়াবিয়োগে কবির আক্ষেপোক্তিতে।

মালতীপুঁথির প্রথম রচনা ও রুদ্রচণ্ড নাটিকার মধ্যে এই যে ভাবাদর্শ ও কাহিনীগত সাদৃশ্য, তা আকস্মিক বলে মনে হয় না। এর মধ্যে কার্যকারণগত সম্বন্ধ আছে বলেই অনুমান করি। এই সাদৃশ্যের হেতু কি হতে পারে, বিচার করে দেখা যাক।

রুদ্রচণ্ড নাটিকার আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার বলেন—

"রুদ্রচণ্ডের মুদ্রণকাল জানি, কিন্তু তাহার রচনাকাল সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি বা তাঁহার অন্য কোনো রচনার মধ্যে এই গ্রন্থের নামমাত্র করেন নাই। ইহার দুইটিমাত্র গান।

···আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বোলপুর আসিয়া 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে যে কাব্য রচনা করেন (১৮৭৩ মার্চ), এই রুদ্রচণ্ড তাহারই নাট্যরূপ। নাটকের ভাষা অত্যন্ত অপরিণত। আমাদের মনে হয় [দ্বিতীয়বার] বিলাত যাইবার [১২৮৮ বৈশাখ] পূর্বে তাড়াতাড়িতে নূতন কিছু সৃষ্টিপ্রেরণার অভাবে পুরাতন রচনাটাকে নূতন কলেবরে সাজাইয়া 'জ্যোতিদাদা'কে উপহার দিলেন।"

—'রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম খণ্ড (১৩৬৭), পৃ ১০৩

রুদ্রচণ্ড নাটিকা 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যেরই নাট্যরূপ, এই অভিমত স্বীকৃতিযোগ্য বটে, কিন্তু সর্বতোভাবে নয়। 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যটি ছিল 'বীররসাত্মক', এ কথা কবি নিজেই বলেছেন একাধিকবার। কিন্তু রুদ্রচণ্ড নাটিকা বীররসাত্মক রচনা নয়, করুণরসাত্মক। ধরে নেওয়া যায়, 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যের কেন্দ্রস্থলে ছিল বীর নায়ক পৃথ্বীরাজ স্বয়ং। কিন্তু রুদ্রচণ্ডে পৃথ্বীরাজের কোনো ভূমিকাই নেই। পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পটভূমিকাতেই রুদ্রচণ্ডের নাট্যকাহিনী রচিত বটে, কিন্তু সে পরাজয়কে রাখা হয়েছে নেপথ্যে, প্রত্যক্ষগোচর করা হয় নি। তাই মনে হয়, 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যের কোনো পার্শ্বকাহিনী নিয়ে ওই নাটিকাটি রচিত হয়েছিল, যেমন পরবর্তী কালে মগধের রাজ-বিপ্লবের নেপথ্যভূমিকার উপরে রচিত হয়েছিল 'নটীর পূজা' নাটিকা। আর ওই পার্শ্বকাহিনীর নায়ক-নায়িকা হল চাঁদকবি ও অমিয়া।

তবে কি মালতীপুঁথির প্রথম রচনাটি 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যেরই প্রথম সর্গ? তা হতে পারে না। কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন ('ছিন্নপত্রাবলী' ও 'জীবনস্মৃতি') যে, 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' লিখিত হয়েছিল 'লেট্স্ ডায়ারি'-নামক খাতাটিতে এবং তার সবটাই লেখা হয়েছিল ওই খাতাতে। তা ছাড়া ওটা লেখা হয়েছিল পেন্সিলে। কিন্তু মালতীপুঁথির 'প্রথম সর্গ'-শীর্ষক কাব্যাংশটা লেখা কালিতে। সব কথা ভেবে মনে হয়, লেট্স্ ডায়ারিতে লেখা কাব্যটা বড়োদাদার পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত স্বয়ং কবির মনকে তৃপ্ত করতে পারে নি, তাই তিনি নূতন করে লিখতে শুরু করেছিলেন এই মালতীপুঁথিতে, কিন্তু এবারও তৃপ্ত হতে না পেরে লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ মালতীপুঁথির এই 'প্রথম সর্গ'টা হচ্ছে সম্ভবত: 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যের কবিকৃত দ্বিতীয় সংস্করণের অসমাপ্ত অংশ।

বহুকাল পূর্বে 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা' প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলাম—

"আমার মনে হয়, 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়'ও তৎকালীন মহাকাব্যের আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দেই রচিত হয়েছিল।"

—বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাখ, পৃ ৬৫৫

মালতীপুঁথির 'প্রথম সর্গ'-শীর্ষক রচনাটিও রবীন্দ্রনাথের তৎকাল-অনুসৃত অমিত্রাক্ষর রীতিতেই রচিত। এই তথ্যটুকুর দ্বারাও এই রচনাটি যে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যের সংস্করণ বা রূপান্তর, আমাদের এই

অনুমান সমর্থিত হয়। এ প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণ করা যেতে পারে যে, রুদ্রচণ্ড নাটিকাটিও (প্রথম দুটি অংশ এবং দুটি গান বাদে) সর্বাংশেই এই অমিত্রাক্ষর রীতিতে রচিত।

'প্রথম সর্গ'-শীর্ষক কাব্যাংশটির রচনাকাল সম্বন্ধেও কিছু অনুমান করা যেতে পারে। পৃথ্বীরাজের বীরত্বকাহিনী যে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার কল্পনাকে বেশ কিছুকাল উদ্দীপ্ত করে রেখেছিল তার কিছু প্রমাণ আছে। 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' (১৮৭৩ মার্চ) ছাড়াও আরও অন্তত: দুটি রচনায় পৃথ্বীরাজপ্রসঙ্গ পাওয়া যায়। দুটি কবিতাই হিন্দুমেলায় পঠিত হয়। প্রথমটিতে (১৮৭৫ ফেব্রুআরি) আছে—

"দেখেছি সেদিন যবে পৃথ্বীরাজ
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ,
সমরে সাধিয়া পুরুষের কাজ
আশ্রয় নিলেন কৃতান্তকোলে।"

দ্বিতীয়টি রচিত লর্ড লিটনের দিল্লি-দরবার (১৮৭৭ জানুআরি ১) প্রসঙ্গে। সেটিতে আছে—

"এসেছিল যবে মহম্মদ ঘোরি
স্বর্গরসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয়-ধ্বজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগেনি,
তখনো একত্রে ভারত মেলেনি,
আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে
বন্ধনশৃঙ্খলে করিতে পূজা।"

কিন্তু তৎকালীন অন্তঃসারশূন্য বীররস ও স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের চিত্ত অচিরকালের মধ্যেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তার বহু প্রমাণ আছে তাঁর তখনকার রচনাসমূহে।[১] ওই সময়ে তাঁর ব্যক্তিজীবনে যে নৈরাশ্য ও অশান্তির বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, তাও এই মতিপরিবর্তনের অন্যতম হেতু বলে গণ্য হতে পারে। পূর্বে বলেছি 'শৈশবসংগীত' (নামান্তরে 'অতীত ও ভবিষ্যৎ') এবং 'কবিকাহিনী', এই দুটি রচনাই কবিহৃদয়ের এই অশান্ত যুগের লেখা। উক্ত 'প্রথম সর্গ'টিও এই সময়েরই রচনা বলে মনে হয়। ওই দুটি রচনার ন্যায় এটিতেও কবিহৃদয়ের বাসনাবেদনাই সবকিছুকে যেন ছাপিয়ে উঠেছে। রুদ্রচণ্ডের নাট্যাবরণের মধ্যেও এই মনোভাব অনতিপ্রচ্ছন্ন ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে চাঁদকবির জীবনে। 'প্রথম সর্গে'র সঙ্গে উক্ত দুটি রচনার ভাব ও ভাষাগত সাদৃশ্যটাও উল্লেখযোগ্য। 'প্রথম সর্গে'র প্রথম কয়েক পংক্তি এই।—

"হা বিধাতা, ছেলেবেলা হতেই এমন
দুর্বল হৃদয় লয়ে লভেছি জনম,

১ দ্রষ্টব্য : লেখকের 'অগ্রদূত' প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ বৈশাখ-আষাঢ়, পৃ ৪০৮-১৪।

আশ্রয় না পেলে কিছু হৃদয় আমার
অবসন্ন হোয়ে পড়ে লতিকার মত।
স্নেহ-আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ না হইলে
কাঁদে ভূমিতলে পোড়ে হোয়ে ম্রিয়মান।"

—মালতীপুঁথি, পৃ ৩ প্রথম স্তম্ভ

এর সঙ্গে তুলনীয় 'শৈশবসংগীত' কবিতার নিম্নলিখিত অংশটুকু।—

"কিন্তু কি করিব বল, কি চাও কি দিব আমি,
তোমাদের আমোদ গো এক তিল বাড়াতে,
হৃদয়ে এমন জ্বালা, কি কোরে হাসিব বল,
কিছুতে বিষণ্ণভাব পারি না যে তাড়াতে।
... ...
ব্যথায় পাইয়া ব্যথা যদি গো শুধাতে কথা,
অশ্রুজলে মিশাইতে যদি অশ্রুজল,
আদরে স্নেহের স্বরে একটি কহিতে কথা,
অনেক নিভিত তবু এ হৃদি-অনল।"

—মালতীপুঁথি, পৃ ৫৭ প্রথম স্তম্ভ

এই দুই অংশেই বিষাদবেদনা ও স্নেহপিপাসা সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। অতঃপর 'প্রথম সর্গে'র

"দরিদ্র গ্রামের সেই ভাঙ্গাচোরা পথ,
গৃহস্থের ছোটখাট নিভৃত কুটীর
যেখানে কোথা বা আছে তৃণ রাশি রাশি,
কোথা বা গাছের তলে বাঁধা আছে গাভী
অযত্নে চিবায় কভু গাছের পল্লব।"

—মালতীপুঁথি, পৃ ৩ প্রথম স্তম্ভ

এই অংশের সঙ্গে 'শৈশবসংগীত'এর নিম্নলিখিত অংশের ভাব ও ভাষাগত সাদৃশ্য লক্ষিতব্য।—

"কেমন গো আমাদের ছোট এ কুটীরখানি ;···
ভাঙ্গাচোরা বেড়াগুলি, উঠেছে লতিকা তায়···
ওদিকে পড়িয়া মাঠ, দূরে দুচারিটি গরু
চিবায় নবীন তৃণদল।"

—মালতীপুঁথি, পৃ ৫৪ প্রথম স্তম্ভ

বাহুল্যভয়ে দ্বিতীয় উদ্‌ধৃতিটিকে কিছু সংক্ষিপ্ত করা গেল। তবে এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, 'শৈশবসংগীত' গ্রন্থের (১৮৮৪) 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' কবিতায় 'দূরে দু-চারিটি গরু' অংশে 'গরু' বদলে 'গাভী' করা হয়েছে। তাতে 'প্রথম সর্গে'র সঙ্গে সাদৃশ্যটা আরও পরিস্ফুট হয়েছে।

সব বিষয় বিচার করে আমার মনে হয়, এই 'প্রথম সর্গ' পৃথ্বীরাজের পরাজয় কাব্যেরই নূতন সংস্করণ, কিন্তু লিখে তৃপ্ত হন নি বলে কবি এটা সমাপ্ত করেন নি। এ সময়ে কবির মনে বীররসের প্রতি আগ্রহ আর ছিল না। সম্ভবতঃ কবির পরিকল্পনায় বীররসের অংশকে গৌণ স্থান দিয়ে কিংবা বর্জন করে কাব্যটিতে করুণরসকে প্রাধান্য দেবার অভিপ্রায় ছিল। বোধ হয় এজন্যই পরবর্তী কালে রুদ্রচণ্ড নাটিকায় বীররসকে একেবারে বর্জন করে করুণরসকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। রচনাকাল সম্বন্ধে মনে হয় 'প্রথম সর্গ' ও 'শৈশবসংগীত' (১২৮৪ আশ্বিন ২৪। ১৮৭৭ অক্টোবর ৯) কাছাকাছি সময়েরই রচনা; আরও সূক্ষ্ম তুলনায় মনে হয় এ দুটির মধ্যে 'প্রথম সর্গ'ই কিছু পূর্ববর্তী।

৮

উপসংহার

আমরা দেখলাম, নীলখাতা ও লেট্‌স্ ডায়ারির পরে যে তৃতীয় খাতা রবীন্দ্রনাথের কবিতারচনার আশ্রয় বা বাহন হয়ে উঠেছিল, এই মালতীপুঁথি সেই তৃতীয় খাতা। ইস্কুলের বন্ধনচ্ছেদনের পর থেকে এই খাতাখানিই হয়েছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন। জীবনস্মৃতির 'সাহিত্যের সঙ্গী' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ যে 'কবিতার খাতা'র কথা উল্লেখ করেছেন, এই মালতীপুঁথিই সেই কবিতার খাতা। এটিতে তাঁর তখনকার অশান্ত মনের আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে নানা রচনায়। তাঁর কৈশোরপর্বের অনেক রচনাই স্থান পেয়েছে এই পুঁথিটিতে—শৈশবসংগীত, কবিকাহিনী, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। 'শৈশব-সংগীত' কাব্যটি তিনি উৎসর্গ করেন তাঁর নূতন বউঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীকে। এই বউঠাকুরানীই ছিলেন তাঁর 'সাহিত্যের সঙ্গী'। এই কাব্যের 'উপহার'-পত্রে তিনি লিখেছেন—

"এ কবিতাগুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে।"

তাঁর সাহিত্যের সঙ্গী নূতন বউঠাকুরানীর[১] কাছে বসে যে-খাতায় এই কবিতাগুলি লিখতেন ও যে-খাতা থেকে শোনাতেন, এই মালতীপুঁথিই সেই খাতা। 'বহুকাল হইল' বলার উদ্দেশ্য এই যে, এর অনেকগুলি কবিতাই লিখিত হয়েছিল দীর্ঘকাল পূর্বে অতি অল্প বয়সে। কেননা, 'শৈশবসংগীত' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে কবির 'তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি'। সুতরাং মোটামুটিভাবে বলা যায়, মালতীপুঁথির রচনাকালের ঊর্ধ্বসীমা ১৮৭৪ সালের পূর্ববর্তী নয়, হয়তো অল্প কিছু পরবর্তী। আর বোধ করি বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের 'উপহার' কবিতাটি রচনার সময়কে (১৮৮২) তার নিম্নসীমা

---

১ মালতীপুঁথিতেও (পৃ ৫৩) এই বউঠাকুরানীর উল্লেখ আছে প্ল্যানচেটচর্চার প্রশ্নোত্তরপ্রসঙ্গে। একটি প্রশ্নে আছে— "ন বৌঠান কি যাবেন ?" প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, এই প্ল্যানচেটচর্চার সমগ্রটাই লেখা পেন্‌সিলে।

বলে আপাততঃ গ্রহণ করা যায়। তার পরেও যে এই পুঁথিটি আরও কিছুকাল রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারে ছিল তা মনে করা যায়। কারণ 'শৈশবসংগীত' প্রকাশকালে (১৮৮৪) 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' কবিতাটি এবং 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশের সময়ে (১৮৮৪) ১২-সংখ্যক রচনাটি এই পুঁথি থেকেই গৃহীত হয়েছিল। তার পরেও 'বালক' পত্রিকায় 'অবসাদ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল (১২৯২ চৈত্র) এই পুঁথি থেকেই। সুতরাং ১৮৮৬ সালেও এই পুঁথিটি রবীন্দ্রনাথের হাতছাড়া হয় নি। অতঃপর কবে এটি তাঁর হাতছাড়া হয়, তা এখনও নির্ণয় করা যায় নি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, এই পুঁথিটির 'জ্যেষ্ঠা সহোদরা' লেট্‌স্ ডায়ারিটি মালতীপুঁথির 'প্রথম সর্গ' রচনার কাল (১৮৭৭), এমন কি রুদ্রচণ্ড রচনার কাল (১৮৮১) পর্যন্তও রবীন্দ্রনাথের অধিকারে ছিল বলেই মনে হয়। তার পরে এটি কবে যে অন্তর্হিত হল তা তিনিও বলতে পারেন নি।

মালতীপুঁথির রচনাকালে এটিই যে রবীন্দ্রনাথের অদ্বিতীয় 'সাহিত্যের সঙ্গী' অর্থাৎ একমাত্র রচনার খাতা ছিল তা মনে করবার হেতু নেই। এটির সঙ্গে সঙ্গে অন্য খাতাতেও তাঁর রচনার কাজ চলছিল, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 'সাহিত্যের সঙ্গী' কথাটা ব্যবহার করা হল ইচ্ছে করেই। কারণ এই পুঁথিটি দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন স্থানে কবির সঙ্গে সঙ্গেই থাকত। কলকাতায় ('দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি ৬ নম্বর ভবনে') তো ছিলই, আমেদাবাদে মেজদাদার বাড়িতেও ছিল, বোম্বাইবাসকালেও ছিল, এমন কি বিলাতে বড়োদাদার কৌতুককবিতার নকল রাখা ও 'ভগ্নতরী' রচনার কালেও এটি তার সঙ্গ ছাড়ে নি। এমন যে রচনার খাতা, তাকে 'সাহিত্যের সঙ্গী' বলা অনুচিত নয়।

মালতীপুঁথির এই পরিচয়ে এখনও অনেক অপূর্ণতা (হয়তো কিছু ত্রুটিবিচ্যুতিও) রয়ে গেল। সুতরাং ভবিষ্যতে সুযোগমতো এই পুঁথিপরিচয়ের পূর্ণতাবিধানের তথা ত্রুটিমোচনের অবকাশও রইল।

২৬ অগ্রহায়ণ ১৩৭১

রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী কাব্যখানির জনপ্রিয়তা সার্বভৌমিক। এই জনপ্রিয়তার অনেক কারণ। রচনার সৌষ্ঠব ও কাহিনীর আকর্ষণ তন্মধ্যে প্রধান। আরও একটি কারণ, কাব্যখানি বাল্যকালেই ছেলেমেয়েদের হাতে পৌঁছয়। তরুণ মন পূর্বসংস্কারমুক্ত, নূতন সংস্কার তখনো দাগ কাটে নি, এমন সময় এই একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য হাতে পৌঁছে যে কেবল তাদের মনোহরণ করে নেয় তা নয়, বাল্যজীবনের মধুর স্মৃতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কাব্যখানির স্মৃতি ও মাধুর্য পরবর্তী জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকে। কম পক্ষে আজ চল্লিশ বছর ধরে বাঙালি ছেলেমেয়েদের জীবনে কাব্যের তথা অনেকাংশে ভারতেতিহাসের প্রথম ধারণা সৃষ্টি ক'রে চলেছে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম এই শ্রেষ্ঠ কাব্যখানি। এ গেল হিসাব-নিকাশে লাভের অঙ্ক, ক্ষতির অঙ্কেও কিছু জমা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের আর সমস্ত কাব্য নিয়েই সমালোচকগণ আলোচনা করেছেন, তাদের অন্ধিসন্ধি ঘেঁটে রবীন্দ্রপ্রতিভার নাড়ীনক্ষত্র নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এ কাব্যখানির দিকে তেমন ভাবে কারো নজর পড়ে নি বললেই চলে। কেন? প্রথম কারণ কাব্যখানির সহজবোধ্যতা। স্বচ্ছ জল গভীর নয় মানুষের জন্মগত সংস্কার, ওর মধ্যে আর খুঁজবার আছে কি? দ্বিতীয় কারণ বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক রূপে ওর খ্যাতি। বিদ্যালয়ে পাঠ্য হলেই বইয়ের যেন জাত যায়, পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাকে গবেষণার অযোগ্য মনে ক'রে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন। প্রধানত এই দুটি কারণেই কথা ও কাহিনী কাব্যখানি সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে।

আজকার প্রবন্ধে কথা ও কাহিনীর অন্তর্গত কথাকাব্যের রসবিচার করবার ইচ্ছা আমাদের নেই। যদিচ রসবিচারই কাব্য-আলোচনার শেষ লক্ষ্য এবং রসের উৎকর্ষের উপরেই কাব্যের স্থায়ী নির্ভর, তবে অন্য প্রকার বিচারও সম্ভব। তুলনায় গৌণ হলেও সে বিচারের মূল্য কম নয়। অন্য নামের অভাবে তাকে বস্তুবিচার বলা যেতে পারে। আজ কথাকাব্যের বস্তুবিচার আমাদের লক্ষ্য।

আর অধিক অগ্রসর হওয়ার আগে বস্তুবিচার শব্দটির তাৎপর্য পরিষ্কার করে নেওয়া আবশ্যক। কথা ও কাহিনীর অন্তর্গত কথা কাব্যের কবিতাগুলির বস্তু উপনিষদ, পুরাণ ও ইতিহাস থেকে সংগৃহীত। মূল কাহিনী বা বস্তু কবির অভিপ্রায় ও আদর্শ-অনুসারে রূপান্তরিত হয়েছে তাঁর হাতে। ধরে নিলে অন্যায় হবে না যে, মূল কাহিনীর অনেকগুলিই মূল কবি বা ইতিহাসবেত্তার হাতে তাঁদের অভিপ্রায় ও আদর্শ-অনুসারে রূপান্তরিত হয়েছিল। প্রকৃত ঘটনা কি ঘটেছিল আমরা জানি না, জানি যা মূল কবি জানিয়েছেন। ঐ জানার মধ্যে রয়ে গিয়েছে প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে লেখকদের অভিপ্রায়। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম খাটে। ঐতিহাসিক যতই নিরপেক্ষ হোন তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর কালের ব্যক্তিত্বকে ছাড়িয়ে বেশি দূর উঠতে পারেন না। এই দুই প্রকার ব্যক্তিত্বের

অগোচর ও সগোচর মিশলে গড়ে ওঠে তাঁর লিখিত ইতিহাস। ঐতিহাসিক গীবন অষ্টাদশ শতকের সংশয়বাদের আবহাওয়ায় বসে রোমসাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস লিখেছিলেন বলেই তা এক বিশিষ্ট মূর্তি নিয়েছে। তিনি মেকলের কালে বসে ঐ ইতিহাস লিখলে ঘটনার ধ্রুবত্ব সত্ত্বেও তাঁর ইতিহাসের রস নিশ্চয় ভিন্ন হত। রবীন্দ্রকাব্য থেকেই একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। কথা কাব্যের বন্দীবীর রচনাটির সময় ১৮৯৯ সাল আর শেষসপ্তকের অন্তর্গত তেত্রিশ-সংখ্যক শিখ কবিতাটির রচনাকাল তার অনেক পরে, ১৯৩৫ সাল (শেষসপ্তক কাব্য প্রকাশের সময়), মাঝখানে ছত্রিশ বছরের ব্যবধান। দুটি কবিতারই মূল ঘটনা বা বস্তু ইতিহাসের একই বিশেষ পর্ব থেকে গৃহীত। তবু দুয়ে যে রসের প্রভেদ দেখতে পাই তার কারণ ইতিমধ্যে কালের ব্যক্তিত্বের বদল হয়েছে, সেই সঙ্গে কবির ব্যক্তিত্বেরও। আবার কালের বদলে রসের বদল হয় নি এমন কবিতাও আছে কথা কাব্যে। পূজারিনী ও পরিশোধ দুটি কবিতাই ১৮৯৯ সালে লিখিত, যথাক্রমে এদের রূপান্তর নটীর পূজা (১৯২৬ সালে) ও শ্যামা (১৯৩৯ সালে) অনেক পরে লিখিত। দুই জায়গাতেই নাটকের অনুরোধে রূপের বদল হয়েছে, রসের বদল হয় নি। খুব সম্ভব এখানে বস্তুর মধ্যে এমন-কিছু ধ্রুবত্ব আছে যা কালের ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করতে সমর্থ। বদলের ক্ষেত্রেও যেমন কবির পরিচয় আছে, অবদলের ক্ষেত্রেও তেমনি আছে। কাব্যের মধ্যে থেকে কবির পরিচয় সংগ্রহ শিক্ষাপ্রদ ও কৌতূহলজনক আলোচনা। এইভাবে সংগৃহীত পরিচয় তাঁর পরিজ্ঞাত জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে মিলবে, অনেক সময়ে মিলবে না। "কবির জীবনচরিতে" কবিকে সন্ধান করতে যে নিষেধাজ্ঞা তিনি প্রচার করেছেন তা কেউ শোনে নি, শুনবে এমন ভরসাও দেখি না, তবে ঐ নিষেধাজ্ঞার পরিপূরক ভাবে কবিকে কাব্যের মধ্যেও সন্ধান আবশ্যক। আর এই দুই রকম সন্ধানের ফল হচ্ছে গিয়ে কবির যথার্থ জীবনচরিত। এ ক্ষেত্রে যে-উদ্দেশ্যে আমরা কথা কাব্যের বস্তুবিচারে উদ্যত হয়েছি তা ঐ কাব্যের মধ্যে কবির পরিচয় অর্থাৎ তাঁর অভিপ্রায় ও আদর্শের পরিচয় সংগ্রহ। "কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।" এই ঋষিবাক্য সর্বদা মনে রেখে এ কাজে অগ্রসর হতে হবে।

কথা কাব্যে চব্বিশটি কবিতা আছে, মুখপাতের কথা কও কবিতাটি ছেড়ে দিলে চব্বিশটি। কবিতাগুলির মূল কাহিনী বা বস্তু প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বা ইতিহাসগ্রন্থ থেকে গৃহীত। উপনিষদ থেকে গৃহীত একটি, ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে গৃহীত তিনটি, বৌদ্ধ পুরাণ থেকে গৃহীত আটটি, রাজপুত ইতিহাস থেকে গৃহীত ছয়টি, শিখ ইতিহাস থেকে গৃহীত চারটি এবং মারাঠা ইতিহাস থেকে গৃহীত দুটি মূল কাহিনী বা বস্তু। কাহিনী খণ্ডের অন্তর্গত নিষ্ফল উপহার কবিতাটির বস্তু শিখ ইতিহাস থেকে গৃহীত, রসের ও রক্তের বিচারে কবিতাটির স্থান কথা খণ্ডে হওয়া উচিত, কেন যে কাহিনী খণ্ডে হল জানি না। গুরুগোবিন্দ ও নিষ্ফল উপহার দুটি কবিতাই মূলে মানসী কাব্যের অন্তর্গত, গুরুগোবিন্দ কথা খণ্ডে স্থান পেয়েছে, অন্যটিরও স্বাভাবিক স্থান সেখানে। অধিক অগ্রসর হওয়ার আগে কবিতাগুলিকে পরিশিষ্টে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দিলাম, প্রয়োজনবোধ করলে কৌতূহলী পাঠক দেখতে পারেন। কাহিনী খণ্ডের নিষ্ফল

উপহারকে ধরলে চব্বিশের জায়গায় পঁচিশটি হবে। বস্তুবিচার উপলক্ষে বস্তুসাম্যে কবিতাটির আলোচনা কথা কাব্যের সঙ্গে সেরে নেব আমরা।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন জাগে। বৈদিককাল থেকে শুরু করে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগকে স্পর্শ করে আধুনিক যুগের সীমান্ত পর্যন্ত চলে এসেছেন কবি। কিন্তু সাতশো বছরের পাঠান ও মোগল পর্ব সম্বন্ধে তিনি নীরব। কোনো কোনো কবিতায়, যেমন মানী কবিতায়, মোগল-শাসনের উল্লেখ আছে, তবে তা নিতান্ত উল্লেখ মাত্র। সাতশো বছরের সুদীর্ঘ পর্বটা তিনি এড়িয়ে গেলেন কেন, কিম্বা পর্বটা তাঁকে এড়িয়ে গেল কেন ? প্রকৃত উত্তর কি জানি না, তবে খুব সম্ভব শব্দের ও অর্থের বিচারে এই নীরবতার রহস্য ভেদ সম্ভব। মোগলযুগের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য ফার্সি শব্দের আবশ্যক। যে কারণেই হোক ফার্সি শব্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা অনীহা ভাব ছিল। এই হল শব্দের বিচার। অর্থের বিচার একটু গভীর। মোগল-শাসনের তাৎপর্য বা অর্থ সম্বন্ধে, ভারতের ইতিহাসে তার প্রয়োজন ও সার্থকতা সম্বন্ধে খুব সম্ভব তিনি অনুকূল মত পোষণ করতেন না, এ শাসন জাতিসত্তার পরিপোষক নয় বলেই হয় তো তিনি মনে করতেন। এই সঙ্গে যখন দেখতে পাই যে, রাজপুত মারাঠা ও শিখ শক্তি যারা মোগল-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, লড়াই করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করে ফেলে জাতীয় সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে তাদের সম্বন্ধে কবির প্রশংসার অন্ত নাই— তখন এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়।

আরও একটি প্রশ্ন— বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর নীরবতার কারণ কি ? খুব সম্ভব তিনি যখন লিখছিলেন, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস তখন পরিজ্ঞাত ছিল না। যেটুকু পরিজ্ঞাত ছিল সে বিষয়ে তাঁর ধারণা প্রতাপাদিত্য চরিত্র অঙ্কন থেকেই বুঝতে পারা যাবে। স্বদেশী আমলের প্রতাপাদিত্য আর তার পূর্ববর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অঙ্কিত প্রতাপাদিত্য চরিত্রের মধ্যে এখন প্রমাণ হয়েছে যে শেষেরটাই ইতিহাস-সম্মত। তবে বাঙালি পাঠক খুশি হয় নি প্রায়শ্চিত্ত নাটকে। এই উপেক্ষিত নাটকখানি থেকে উদ্ধার পেয়ে এবং মুক্তধারা নাটকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ধনঞ্জয় বৈরাগী বাঙালির মনে গৌরবের আসন লাভ করেছে। যাই হোক কথা কাব্যে মোগল ইতিহাস ও বাঙলার ইতিহাসের বস্তুর অভাব লক্ষ্য করবার ও ভাববার বিষয়।

আরও একটি অনতিগৌণ বিষয়ের জন্য পাদটীকার উপরে নির্ভর অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার বিদ্যুৎগতির একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ কথাকাব্য। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি উচ্চ কোটির কবিতার প্রণয়ন সত্যাই বিস্ময়জনক। সাধারণভাবে রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে বর্তমান প্রসঙ্গে— এই ধরণের বিচার আবশ্যক আছে। বিস্তারিত বিবরণ পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

২

ব্রাহ্মণ কবিতাটির বস্তু বা মূল আখ্যায়িকা ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ড থেকে গৃহীত। মূল আখ্যায়িকা প্রথমে উদ্ধার করে দিচ্ছি, তার পরে ব্রাহ্মণ কবিতাটির সঙ্গে মিলিয়ে আলোচনা করা যাবে।

একদা সত্যকাম জাবাল জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে পূজনীয়ে, আমি ব্রহ্মচর্যাবলম্বনে (গুরুগৃহে) বাস করিতে চাই ; (সুতরাং) জিজ্ঞাসা করি, আমি কোন্ গোত্রীয় ?' জবালা তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি কোন্ গোত্রীয়, তাহা আমি জানি না। বহুকর্মব্যাপৃতা ও বহুপরিচর্যানিরতা (বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে) আমি তোমায় যৌবনে পাইয়াছিলাম ; সুতরাং তুমি যে কোন্ গোত্রীয়, তাহা জানিতে পারি নাই। তবে আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম, সুতরাং তুমি সত্যকাম জাবাল বলিয়াই পরিচয় দিও।' তিনি হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট গিয়া বলিলেন, 'আমি ভবৎসমীপে ব্রহ্মচর্য-বাস করিব ; মহাশয়কে আচার্যরূপে পাইতে চাই।' গৌতম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সৌম্য, তুমি কোন্ গোত্রীয় ?' তিনি বলিলেন, 'মহাশয়, আমি কোন্ গোত্রীয়, তাহা জানি না। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, বহুকর্মব্যাপৃতা ও পরিচারণশীলা আমি তোমায় যৌবনে পাইয়াছিলাম ; সুতরাং তুমি যে কোন্ গোত্রীয়, তাহা জানিতে পারি নাই। তবে আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম। সুতরাং মহাশয়, আমি সত্যকাম জবালা।' (আচার্য) সত্যকামকে বলিলেন, 'এইরূপ বাক্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরে বলিতে পারে না। হে সোম্য, সমিধ আহরণ কর, আমি তোমায় উপনীত করিব ; কারণ তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হও নাই।'…[১]

নিরলঙ্কার এই আখ্যায়িকাকে রবীন্দ্রনাথ 'শ্রেষ্ঠ কাব্যের' সম্মান দিয়েছেন। তিনি বলছেন, "আপনারা সকলেই অবগত আছেন, জবালাপুত্র সত্যকামের কাহিনী অবলম্বন ক'রে আমি একটি কবিতা রচনা করেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গল্পটি সহজ গদ্যের ভাষায় পড়েছিলাম, তখন তাকে সত্যিকার কাব্য বলে মেনে নিতে একটুও বাধে নি। উপাখ্যান মাত্র— কাব্যবিচারক একে বাহিরের দিকে তাকিয়ে কাব্যের পর্যায়ে স্থান দিতে অসম্মত হতে পারেন ; কারণ এ তো অনুষ্টুভ, ত্রিষ্টুভ বা মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হয় নি। আমি বলি, হয় নি বলেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হতে পেরেছে, অপর কোনো আকস্মিক কারণে নয়। এই সত্যকামের গল্পটি যদি ছন্দে বেঁধে রচনা করা হত তবে হালকা হয়ে যেত।"[২]

কবির এই অকারণ আত্মনিগ্রহের কারণ সহজে অনুমেয় নয়। ছন্দে রচিত ব্রাহ্মণ কবিতাটি কিছুমাত্র হাল্কা হয় নি বরঞ্চ কোনো কোনো অংশে মূলের চেয়ে স্পৃহনীয়তর হয়ে উঠেছে। মূলে আছে সত্যকাম গোড়াতেই গোত্ররহস্য জেনে নিয়ে ঋষির আশ্রমে যাত্রা করেছে, ব্রাহ্মণ কবিতায় গোত্ররহস্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমবারে সত্যকাম গোত্র বলতে পারে নি, ফিরে এসে জেনে নিয়েছে, দ্বিতীয়বারে গিয়ে জানিয়েছে। গোত্র না জেনে আসা যে উচিত হয় নি, এই গ্লানি নিয়ে ফিরে এল সত্যকাম, কিন্তু তখন জানত না যে গুরুতর গ্লানি তার জন্যে অপেক্ষা করছে। পরদিন গিয়ে সত্যকাম প্রকৃত ঘটনা জানালো গৌতমকে। গোত্র সম্বন্ধে মাতা ও পুত্রের সত্যনিষ্ঠা কবিতাটির প্রাণ। কাজেই এই ঘটনাটি কিছু বিস্তারিত হওয়ায় তার উপরে কল্পনার আলো বেশি পড়বার সুযোগ পেয়েছে।

---

১ উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা।

২ গদ্যকাব্য, সাহিত্যের স্বরূপ, ২য় সংস্করণ।

আখ্যায়িকাকার এ ভাবে লিখবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি, কেননা সে যুগে কোনো বালক গোত্র না জেনে নিয়ে গুরুগৃহে যাত্রা করবে না। এ যুগের কবি সে যুগের সংস্কারে বদ্ধ নন, বিশেষ তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে মাতা, পুত্র এবং প্রসঙ্গতঃ ঋষির সত্যনিষ্ঠা প্রদর্শন, সেই জন্যেই গোত্ররহস্যের উপরে কিছু বেশি আলো নিক্ষেপ করতে হয়েছে।

তবে কিনা উপনিষদের সরল নিরলঙ্কার আখ্যায়িকার সঙ্গে এ যুগের ছন্দোবদ্ধ কবিতার যে তুলনা কবি করেছেন তা সমীচীন মনে হয় না। উপনিষদের আখ্যায়িকাকার সৌন্দর্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে রসাত্মক বাক্য রচনা করেন নি, অহেতুকতা তাঁর লক্ষ্য নয়, তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা বা উপদেশদান তাঁর সচেতন লক্ষ্য ; এ কালের কাব্যের লক্ষ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ রকম ক্ষেত্রে প্রকাশের রীতিও স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। উপনিষদের রীতি সূত্রাত্মক, ওর সংহতির মধ্যে অলঙ্কারের স্থান কোথায় ? এ কালের কাব্য ডালপালা মেলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে নেয়— যদি-বা ওর মূলে কোনো তত্ত্ব থাকে তবে তা মূলের মতোই গুপ্ত থাকতে বাধ্য। এ হেন অবস্থায় তুলনা করলে অবিচার অবশ্যম্ভাবী, এখানে অবশ্য অবিচারটা কবির আত্মপক্ষে ঘটেছে।

৩

কথা কাব্যে বৌদ্ধপুরাণ থেকে গৃহীত বস্তু অবলম্বনে কবিতার সংখ্যা আটটি, সবচেয়ে বেশি। এ কেবল আকস্মিক মনে হয় না। বুদ্ধকে মানব-অভিব্যক্তির শ্রেষ্ঠ পুরুষ মনে করেন রবীন্দ্রনাথ।[৩] বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এ যুগে তিনি নূতন চেতনা এনেছেন, কাজেই বৌদ্ধপুরাণ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ স্বাভাবিক। আর খুব সম্ভব এই কারণেই এ বিষয়ে লিখিত কবিতার সংখ্যা সব চেয়ে বেশি।

মূল্যপ্রাপ্তি কবিতাটির বস্তু অবদানশতক থেকে গৃহীত। সে বস্তু এইরূপ :

> যখন প্রভু জেতবনে ভ্রমন করিতেছিলেন, শ্রাবস্তীর এক মালী রাজাকে উপহার দিবার উদ্দেশ্যে একটি বিরাট পদ্মফুল আনিয়াছিল। একজন ভক্ত তাহার মূল্য জানিতে চাহিল। ঠিক সেই সময়েই আসিলেন অনাথপিণ্ডদ এবং তাহার দ্বিগুণ মূল্য দিতে চাহিলেন। অবশেষে, পরস্পরের দরাদরিতে তাহার মূল্য এক শো গুণ বৃদ্ধি পাইল। তখন মালী বুদ্ধ সম্পর্কে খোঁজ করিল এবং অনাথপিণ্ডদের মুখে তাঁহার মহাশক্তির পরিচয় শুনিয়া সে ভগবান বুদ্ধকে ফুলটি উপহার দিল। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মফুলটি একটি বিরাট (গাড়ির) চক্রের আকার ধারণ করিল এবং বুদ্ধের মাথার উপর ঘিরিয়া রহিল। মালী ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং মহাজ্ঞানের জন্য উপদেশ ভিক্ষা করিল।

মোটের উপরে বস্তুকে অনুসরণ করেই কবিতাটি লিখিত, তবে যেখানে কবি পরিবর্তন করেছেন সেখানে উজ্জলতর হয়ে উঠেছে। কবিতায় গল্পটি শীতের, অকালের পদ্ম না হলে কিনবার জন্য এত

---

৩ 'বুদ্ধদেব' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দরাদরি কেন হবে ? মূলে আছে দরাদরি একজন তীর্থিক ও অনাথপিণ্ডদের মধ্যে, সাধুপুরুষদের এ হেন আকিঞ্চন শোভন নয়, তাই কবি কল্পনা করেছেন একজন পথিক ও রাজার মধ্যে দরাদরি চলছে। সুদাস নামটিও কবি-কর্তৃক প্রদত্ত। সবশেষের পরিবর্তনটুকুই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। মূলে আছে পদ্মটি বুদ্ধের মাথার উপরে উঠে বিরাট চাকার আকার ধারণ করল, মালীর যেন তাই দেখে তথাগতের মহিমা সম্বন্ধে চৈতন্য হল, তখন সে মহাজ্ঞান ভিক্ষা করল।[৪] পুরাণকার এরকম অতিপ্রাকৃত ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু এ যুগের কবির পক্ষে এরকম কল্পনা সম্ভব নয়, আবশ্যকও নেই, কারণ এ যুগ অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী না হয়েও মহাপুরুষের বিভূতি সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ করতে সক্ষম। বুদ্ধ

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন-প্রশান্ত-মনে
নিরঞ্জন আনন্দমুরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর'পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।

এই কি যথেষ্ট নয় ? বুদ্ধ যখন মালীর প্রার্থনা জানতে চাইলেন সে বলল, "প্রভু, আর কিছু নহে, চরণের ধুলি এক কণা।" মহাজ্ঞানভিক্ষাও ভিক্ষা বই নয়, তার মধ্যেও অহং-এর লীলা, মালীর পরিবর্তন তার চাইতেও বেশি হল, সমস্ত প্রার্থনা ভুলিয়ে দিয়েছে অমৃতরাশিবর্ষণে। মূলে আছে যে, মালী অনাথ-পিণ্ডদের মুখে বুদ্ধের মহাশক্তির কথা অবগত হয়েছিল, কাজেই কতকটা প্রস্তুত ছিল, কবিতায় এসব নেই, সে ভেবেছিল বুদ্ধকে ফুলটি দিলে "আরো পাব কত।" কাজেই বুদ্ধসন্দর্শনে মালীর পরিবর্তন মূলের চেয়ে কবিতাটিতে গুরুতর। মূলবস্তু ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে লিখিত ; মূল্যপ্রাপ্তি কাব্য ; উল্লিখিত পরিবর্তন-সমূহের ফলে প্রচারের কাব্যত্ব লাভ ঘটেছে। এইসব পরিবর্তনের মধ্যে আসল কথাটা হচ্ছে এ যুগের সেই দৃষ্টি যা প্রত্যয়তঃ অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস পোষণ না করেও মানুষের মহত্ত্বকে স্বীকার করতে সমর্থ।

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা কবিতাটির বস্তু আরও সংক্ষিপ্ত, আরও অকিঞ্চিৎকর।

রাজ্যের জনসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত অনাথপিণ্ডদ রাজার নিকট হইতে ভগবানের জন্য ভিক্ষা করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। হস্তীর পৃষ্ঠে চড়িয়া গমন করিতে করিতে তিনি প্রতিবেশীদের নিকট হইতে বহুমূল্য অলঙ্কার প্রভৃতি ভিক্ষারূপে পাইলেন। একটি ঝোপের আড়াল হইতে এক দরিদ্র রমণী তাহার একমাত্র সম্বল দেহের আচ্ছাদন (বস্ত্র) খানি হস্তীর উপর ছুঁড়িয়া দিল। অনাথপিণ্ডদ তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে মূল্যবান ভূষণে ভূষিত করিলেন। সেই রমণী তখন ভগবানের নিকট গমন করিয়া সত্যজ্ঞান বা প্রজ্ঞালাভ করিল।[৫]

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা কবিতাটি যার মনে আছে— কার না আছে— তিনি অনায়াসে বুঝতে পারবেন প্রতিভার

৪ **অবদানশতক, পৃ ২০** (*The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal,* Ed. Rajendralal Mitra.)।

৫ **অবদানশতক, পৃ ৩৩,** S. B. L. N.

স্পর্শে লোহা সোনা এবং প্রচার কাব্য হয়ে উঠেছে। সেই দরিদ্র রমণীকে মূল্যবান ভূষণে সজ্জিত করে বুদ্ধের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং তার প্রজ্ঞালাভ প্রচারের পক্ষে আবশ্যক হতে পারে, কাব্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কবিতাটির স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি কবি যেখানে থেমেছেন—

চলিলা সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর
সঁপিতে বুদ্ধের চরণনখর-আলোকে।

তারপরে সেই দরিদ্রা রমণী প্রজ্ঞালাভ করল, বা কি করে লোকালয়ে ফিরে গেল, কাব্যের পক্ষে তা অবান্তর।

এবারে সামান্য ক্ষতি কবিতাটির বিষয়বস্তু বা বস্তু দেখা যাক।

যখন ভগবান কুলমাষদম্য-তে (Kulmāshadamya) ছিলেন, মাকণ্ডিক (Mākandika) নামে একজন ঋষি তাঁহার কন্যা অনুপমাকে বিবাহের জন্য ভগবানের কাছে সমর্পণ করিয়াছিল, কিন্তু ভগবান তাহা গ্রহণ করেন নাই। তখন এক বৃদ্ধ মেয়েটিকে গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল, কিন্তু পিতা তাহার সহিত বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইল। ভগবান বলিলেন, "তাকে যে এই প্রথমবার গ্রহণ করতে অস্বীকার করলাম, তা নয়।" এবং পরবর্তী কাহিনীটি বর্ণনা করিলেন।

পূর্বে এক কর্মকার তাহার কন্যাকে (তাহার শিল্পে) সর্বাপেক্ষা দক্ষ কর্মীর হাতে সমর্পণ করিতে মনস্থ করেন। একটি তরুণ সেই কর্মকারের কাছে কাজ শিখিয়া বিশেষ দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল— সে প্রভুর নিকট তাহার কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলে প্রত্যাখ্যাত হইল। ভগবানই ছিলেন সেই যুবক এবং সেই কর্মকার মাকণ্ডিক।

কেন সেই বৃদ্ধের অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহার কারণ ব্যাখ্যা করিবার জন্য ভগবান একটি কাহিনী বলিলেন···। কাহিনীতে শোনা যায়, প্রত্যাখ্যান করিবার পর মাকণ্ডিক কৌশাম্বীতে গমন করিয়া রাজা উদয়নকে স্বীয় কন্যা দান করেন এবং নিজেই রাজার প্রধান মন্ত্রী হন। একদা রাজা যখন শত্রুর সহিত যুদ্ধে গমন করেন, অনুপমা অন্দরমহলে আগুন লাগাইয়া দিল এবং সেই আগুনে প্রধানা মহিষী শ্যামাবতী সহ পাঁচ শত রাজমহিষী প্রাণ হারাইলেন। রাজা উদয়ন এই পাঁচশত স্ত্রীর কাহিনী জানিতে চাহিলে ভগবান বলিলেন, পূর্বে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পাঁচশত স্ত্রী ছিল। একদা তাহারা আমোদ-প্রমোদের জন্য উদ্যানে বেড়াইতে গিয়াছিল। নিকটবর্তী নদীতে স্নান করিবার পর তাহারা শীতবোধ করিল। তীরবর্তী এক কুটির দেখিয়া প্রধান রানী তাঁহার এক দাসীকে সেই কুটিরে অগ্নিসংযোগ করিতে আদেশ দিলেন। দাসী তাঁহাকে জানাইল যে, সেই কুটিরে একজন ঋষি বাস করেন। রানী তাহার কথায় কান তো দিলেনই না, বরং তাহাকে আদেশ পালন করিতে বলিলেন; অন্যান্য রানীরাও তাঁহাকে সমর্থন করিলেন। কুটির পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। কুটির হইতে বাহির হইয়া ঋষি আকাশে উঠিয়া যাইবার সময় তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। তখন তাঁহারা সকলে

বলিলেন যে, কৃত পাপের জন্য তাঁহারা যেন শাস্তি পান কিন্তু তার পর যেন প্রজ্ঞালাভ করেন। শ্যামাবতী এবং তাঁহার অনুচরীবৃন্দ ছিলেন সেই পূর্বকালের রমণীবৃন্দ।[৬]

উদ্ধৃত আখ্যায়িকার শেষাংশ অবলম্বনে সামান্য ক্ষতি কবিতাটি রচিত। আখ্যায়িকায় জাতক-কাহিনীর সমস্ত গুণ বর্তমান— প্রভুর পূর্বজন্মের বিবরণ, রানী অনুপমা কর্তৃক ঋষির গৃহদাহের পাপের জন্য শাস্তিপ্রার্থনা, পরে প্রজ্ঞাপ্রার্থনা এবং ঋষির অতিপ্রাকৃত আচরণ।

রবীন্দ্রনাথ শুধু গৃহদাহের ঘটনাটি রেখেছেন, কিন্তু সে গৃহ ঋষির নয়, দরিদ্র প্রজাদের। আর রানীকে শাস্তির জন্য নিয়তির উপরে নির্ভর করতে হয় নি, প্রজাদের নালিশের উত্তরে স্বয়ং রাজা দণ্ডের ভার গ্রহণ করেছেন, আর সে দণ্ড বড় নির্মম।

বৎসর-কাল দিলেম সময়,
তার পরে ফিরে আসিয়া
সভায় দাঁড়ায়ে করিয়া প্রণতি
সবার সমুখে জানাবে যুবতী
হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি
জীর্ণ কুটির নাশিয়া।

আখ্যায়িকায় রানীর নাম ছিল অনুপমা, কবিতায় হয়েছে করুণা, হয়তো বরুণা নদীর অনুরোধে, তা ছাড়া নামের অর্থের সঙ্গে আচরণের অসংগতি প্রদর্শনও হয়তো উদ্দেশ্য ছিল।

এসব পরিবর্তন অকিঞ্চিৎকর, আসল পরিবর্তন হয়েছে কবিতার মর্মে। একটি প্রচারধর্মী আখ্যায়িকা রূপান্তরিত হয়েছে মানবধর্মী কবিতায়, যার ফলে সেটি যুগমনের পক্ষে হৃদ্য হয়ে উঠেছে। জাতক বা প্রাচীনকালের কাহিনী নিয়ে কবিতা লিখতে গেলে এ যুগের কবির পক্ষে এ রকম পরিবর্তন অপরিহার্য, কারণ রসবাক্যে ও নীতিবাক্যে দুস্তর প্রভেদ।

অজ্ঞাত কৌণ্ডিল্য (Ajnāta Kaundilya) তিনবার এইসব মহৎ সত্য সম্বন্ধে ভাবিয়াছিলেন এবং তাঁহার দিব্যচক্ষু খুলিয়া গিয়াছিল। তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কোনো এক জন্মে ছিলেন কুম্ভকার; তিনি এক কঠিন রোগ হইতে প্রত্যেক বুদ্ধকে (Pratyeka Buddha) মুক্ত করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ইহার প্রতিদান স্বরূপ সুজাতার প্রথম ধর্মগ্রহণের সুযোগ পান।

অপর এক জন্মে অজ্ঞাত কৌণ্ডিল্য ছিলেন এক বণিক। তিনি মহানুভব উদারচিত্ত কোশল-নৃপতির আনুকুল্য লাভ করেন, যিনি কাশী-নৃপতির সহিত যুদ্ধের রক্তপাত এড়াইবার জন্য নিজের রাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে নির্বাসনে গিয়াছিলেন। দক্ষিণাপথে ভ্রমণ করিবার সময় একদিন তিনি জাহাজ-বিধ্বস্ত এক বণিকের দেখা পাইলেন; সেই নাবিক কোশল-নৃপতির কাছেই যাইতেছিল প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশায়। হতভাগ্য বণিক জানিত না যে, কোশল-নৃপতিই তাহার

---

৬ দিব্যাবদানমালা, শ্যামাবতীর কাহিনী, পৃ ৩১৩, S. B. L. N.

সম্মুখে এবং সেই নৃপতির অবস্থা তাহার মতোই বিপর্যস্ত। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাঁহার নিজের ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা জানাইয়া বলিলেন যে, দুঃস্থকে সাহায্য করিবার মতো তাঁহার আর কোনো সুযোগ নাই। হতভাগ্য বণিক তাহার শেষ আশা এমনি করিয়া ব্যর্থ হইতে দেখিয়া গভীর বেদনায় মুহ্যমান হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

কিন্তু মহৎ নৃপতির মনে হঠাৎ এক ঝলক আশার আলো দেখা দিল। তাঁহার মস্তকের উপর পুরস্কার ঘোষণার কথা মনে পড়িল। হতভাগ্য বণিকটি কিছু সুস্থ হইয়াছিল—তিনি তাহাকে কাশীরাজের নিকট তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য বলিলেন। আত্মত্যাগের মহিমা দেখিয়া কাশীরাজ বিস্মিত হইলেন; কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা দেখা দিল। বণিককে শুধুমাত্র প্রভূত অর্থই দিলেন না, কোশল-নৃপতিকেও সিংহাসন (রাজ্য) ফিরাইয়া দিলেন।[৭]

আখ্যায়িকা ও মস্তকবিক্রয় কবিতাটির মধ্যে প্রভেদ বেশি নয়, মূলের প্রায় সমস্ত অবিকৃত থাকিয়া কোশলরাজ ও কাশীরাজের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

উপগুপ্তের পিতা মথুরাগুপ্তের ইচ্ছা ছিল যে উপগুপ্ত শোণবাশীর (Śonavāśi) শিষ্য হইবেন। শোণবাশীর প্রতি উপগুপ্তের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বারনারী বাসবদত্তা উপগুপ্তের সুন্দর দেহকান্তি দেখিয়া তাঁহাকে কামনা করিয়াছিল এবং আহ্বান করিয়াছিল। উপগুপ্ত উত্তর দিয়াছিলেন, "একজন বারবণিতার কাছে যাবার এখন উপযুক্ত সময় নয়। আমি ঠিক সময়েই যাব।"

ইহার কিছুকাল পরে, অপর একজনের প্ররোচনায় বাসবদত্তা তাহার এক পৃষ্ঠপোষককে (paramour) বিষ দিয়া হত্যা করিল। তখন তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইলে সে মৃত্যুদণ্ডের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। রক্ষী তাহার নাক-কান, চুল, কাটিয়া দিল, এবং বস্ত্র কাড়িয়া লইল। একজন বারবণিতাকে দেখা দিবার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া উপগুপ্ত বাসবদত্তার সমুখে উপস্থিত হইলেন এবং নিজের ধর্মের প্রতি বাসবদত্তার বিশ্বাস জাগাইলেন। বাসবদত্তা মহৎ সান্ত্বনা লাভ করিল।[৮]

অভিসার কবিতাটি অতি প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। কবিতাটির দুটি ভাগ, প্রথম ভাগে বাসবদত্তা কর্তৃক উপগুপ্তকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ এবং উপগুপ্ত কর্তৃক সাময়িকভাবে প্রত্যাখ্যান—

সময় যেদিন আসিবে আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।

দ্বিতীয় ভাগে রোগগ্রস্ত ও মুমূর্ষু বাসবদত্তার কাছে উপগুপ্তের আগমন—

"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়"
শুধাইল নারী। সন্ন্যাসী কয়,

---

৭ অজ্ঞাত কৌণ্ডিল্যের কাহিনী, মহাবস্তু অবদান, পৃ ১৫৮-৫৯. S. B. L. N.

৮ বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা, উপগুপ্ত অবতার, পৃ ৬৭, S. B. L. N.

"আজি রজনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা।"

আখ্যায়িকাতেও দুটি ভাগ। প্রথম ভাগের শেষে বাসবদত্তার আহ্বানের উত্তরে উপগুপ্ত বলেছেন— "একজন বারবণিতার কাছে যাবার এখন উপযুক্ত সময় নয়। আমি ঠিক সময়েই যাব।" দ্বিতীয় ভাগের শেষে, "একজন বারবণিতাকে দেখা দিবার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া উপগুপ্ত বাসবদত্তার সমুখে উপস্থিত হইলেন এবং নিজের ধর্মের প্রতি বাসবদত্তার বিশ্বাস জাগাইলেন। বাসবদত্তা মহৎ সান্ত্বনা লাভ করিল।"

আখ্যায়িকা ও কবিতার দুই অংশে মোটের উপরে মেলে বটে কিন্তু মাঝখানে কিছু অমিল আছে। আখ্যায়িকায় বাসবদত্তার দুর্গতির মূলে রাজদণ্ড, আর কারাগারের রক্ষী কর্তৃক নাক কান চুল কেটে দিয়ে তার বিকলাঙ্গতা সাধন। এগুলো রবীন্দ্রনাথের কাছে অত্যন্ত রূঢ় মনে হয়েছে, কবিতায় তার দুর্গতির মূলে

নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায়
ভরে গেছে তার অঙ্গ।
রোগমসী-ঢালা কালী তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুরপরিখার
বাহিরে ফেলেছে করি পরিহার
বিষাক্ত তার সঙ্গ।

বসন্তরোগের আক্রমণ রাজদণ্ডের চেয়ে কম মারাত্মক নয়, তবু প্রভেদ আছে। রাজদণ্ডের মূলে বাসবদত্তা কর্তৃক নরহত্যা, বসন্তরোগের আক্রমণ স্বভাবের নিয়মে— বাসবদত্তার দায়িত্ব নাই, কাজেই পাঠকের শেষ সহানুভূতিটুকু সে হারায় না, আর সেই সহানুভূতির বহিঃপ্রকাশরূপে উপগুপ্তকে তার কাছে উপস্থিত হতে দেখে পাঠক স্বস্তিমিশ্রিত আনন্দ অনুভব করে। মূল বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে কবিতা-গুলোর আলোচনা করলে দেখা যাবে যে একদিকে যেমন রুচির স্থূলতা ও রূঢ়তাকে কবি পরিহার করেছেন, তেমনি পরিহার করেছেন ঘটনার অতিপ্রাকৃত রূপকে। দুয়ের মধ্যেই স্থূলতা আছে যা বিশ্বাসকে পীড়ন করে।

কবিতাটিতে ঘটনার গতির সঙ্গে তাল রক্ষা ক'রে প্রকৃতিকে চিত্রিত করা হয়েছে। উপগুপ্ত বাসবদত্তাকে বলেছিল যে এখন যেখানে চলেছ যাও, সময় হলে তোমার কাছে যাব। এই উক্তির মধ্যে একটি নিদারুণ irony ছিল, নিয়তি যেন গোপনে হেসেছিল। সেই নিষ্ঠুর নিদারুণ হাসি ঝঞ্ঝার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে পড়েছে—

সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎ-শিখায়
মেলিল বিপুল আস্য।

রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে,
প্রলয়শঙ্খ বাজিল বাতাসে,
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে
হাসিল অট্টহাস্য।

আবার যখন বাসবদত্তার রোগমসীঢালা কালী তনুখানি সন্ন্যাসী কোলে তুলে নিয়ে শুশ্রূষায় রত, তখন প্রকৃতিতে মধুর মিলনের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ—

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল,
যামিনী জোছনামত্তা।

কিন্তু কি আয়োজনে কি মিলিল। তবে বলা বাহুল্য এরকম প্রকৃতি ও মানুষের মেজাজে মিলিয়ে বুঝনি অর্বাচীন কালের কাব্যের লক্ষণ; প্রাচীন কাব্যের, বিশেষ ধর্মপ্রচার-কাব্যের লক্ষণ তো নয়ই।[*]

অনাথপিণ্ডদের সুপ্রিয়া নামে এক কন্যা ছিল। জন্মের অব্যবহিত পরেই সে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া একটি গাথা আবৃত্তি করিল; সেই গাথার মর্মার্থ হইল যে, বৌদ্ধদের প্রভূত উপহার দেওয়া এবং পবিত্র বৌদ্ধস্তুপের উপর চাঁপা ফুল ছড়াইয়া দেওয়া কর্তব্য। কন্যার অভিপ্রায় অনুযায়ী পিতা তাহাই করিলেন। পরে, একদা এক ভিক্ষুক তাহাদের গৃহে ভিক্ষা করিতে আসিল; সেই ভিক্ষুকের উপদেশ সুপ্রিয়ার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিল। তা ছাড়া, সে ছিল জাতিস্মর। তাহার সাত বৎসর বয়সে মাতাপিতা তাহাকে সন্ন্যাসিনী হইবার অনুমতি দিলে, ভগবানের আদেশে গৌতমী তাহাকে দীক্ষা দিলেন। শীঘ্রই দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ভগবান সুপ্রিয়ার সাহায্যের জন্য শিষ্যদের আদেশ দিলেন। সুপ্রিয়া নিজেই গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল এবং এইভাবে সে দুঃস্থদের কষ্ট দূর করিতে লাগিল। তিন মাস পরে ভগবান যখন শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহে ফিরিতেছিলেন, মাঝপথে এমন এক বনে উপস্থিত হইলেন, যেখানে কোনো রকম

---

৯ অতি দূর হতে আসিছে পবনে
বাঁশির মদির মন্দ্র।
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি নীরবে
হাসিছে পূর্ণচন্দ্র।

এই শ্লোকটি পড়লে কীটসের নিম্নলিখিত শ্লোকাংশ মনে পড়ে যায়

What little town by river or sea-shore,
Or mountain built with peaceful citadel,
Is emptied of this folk, this pious morn?

জ্যোৎস্নারাত্রি ও প্রভাতের ব্যবধান সত্ত্বেও উৎসবমত্ত নির্জন পুরীর মিল আকস্মিকতার ঊর্ধ্বে।

খাদ্য ছিল না। প্রভুর শিষ্যদের এই দুরবস্থার মধ্যে পড়িতে দেখিয়া সুপ্রিয়া ভিক্ষাপাত্রটি তুলিয়া প্রার্থনা করিল যে, যদি তাহার পূর্বকৃত কোনো সৎকাজ থাকে, তবে যেন এই ভিক্ষাপাত্রটি অমৃতে পূর্ণ হইয়া যায়। এইভাবে সে ভগবান এবং শিষ্যদের ক্ষুধা মিটাইল। তাহার সুকৃতির ফলে সে ইতিমধ্যেই অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিল। কেন সে অর্হৎ হইতে পারিয়াছিল, তাহার কারণ হিসাবে ভগবান বলিলেন, "পূর্বকালে ভগবান কাশ্যপের সময়ে বারাণসীতে এক দাসী তাহার প্রভুর জন্য মিষ্টান্ন লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু পথে কাশ্যপকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া প্রভুর জন্য নীত সেই মিষ্টান্ন তাঁহাকে দিল। ভগবান তাহাকে দীক্ষা দিলেন এবং পরে দশ হাজার বৎসর ধরিয়া সে বৌদ্ধদের ভিক্ষা দিয়াছে। সেই দাসীই এখন সুপ্রিয়া রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"[১০]

আখ্যায়িকার মাঝখানের অংশ অবলম্বনে নগরলক্ষ্মী কবিতাটি রচিত। প্রারম্ভের ও শেষাংশের অতিপ্রাকৃত অংশ বর্জিত। সর্বত্রই তাই। রবীন্দ্রনাথের কাছে বুদ্ধদেব মানবশ্রেষ্ঠ আর সেই অর্থেই তাঁর মহত্ত্ব। মহত্তমকে মহত্তর ক'রে তুলবার উদ্দেশ্যে অতিপ্রাকৃতের অবতারণার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন না। সুপ্রিয়া অবশ্য ভক্তিমতী সাধারণ মানবী, ভক্তিতেই তার ঐশ্বর্য, আর সেই অর্থেই তার মূল্য। এখানেও অতিপ্রাকৃতের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন বোধ করেছেন কবি।

ভগবানের নিকট হইতে সত্যজ্ঞান লাভ করিয়া রাজা বিম্বিসার ভগবানের নখ ও চুলের উপর তাঁহার উদ্যানে এক বিরাট স্তুপ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুরনারীবৃন্দ প্রতিদিন সেই স্থান পরিমার্জনা করিতেন। পিতাকে হত্যা করিয়া অজাতশত্রু যখন সিংহাসনে বসিলেন, তখন তিনি পুরনারীদের স্তুপ-পরিমার্জনা করিতে নিষেধ করিয়া আদেশ দিলেন যে, তাহা পালন না করিলে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। ক্রীতদাসী শ্রীমতী নিজের জীবন সম্বন্ধে আদৌ ভীত না হইয়া সেই স্তুপ ধৌত করিল, প্রদীপমালা জ্বালিয়া দিল। রাজা মহা রুষ্ট হইয়া তাহাকে হত্যার আদেশ দিলেন। তাহার মৃত্যুর পর সে দেবপুত্রী রূপে বেতসকুঞ্জে ভগবানের সামনে উপস্থিত হইল এবং প্রজ্ঞার আলোকে মানবের অমিত দুঃখ দূর করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিল ("Cleaning the mountain of human misery by the thunderbolt of knowledge", obtained all that is desirable.)[১১]

পূজারিনী কবিতাটির সারাংশ আড়াই অক্ষরে মূল আখ্যায়িকায় আছে, বিম্বিসার কর্তৃক বুদ্ধের পদনখকণার উপরে স্তূপ রচনা ও তার পরিমার্জনা, পিতৃঘাতী বিম্বিসার কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ ও স্তূপ পরিমার্জনা নিষেধ, রাজাদেশ অমান্যে মৃত্যুদণ্ড বিধান। শ্রীমতী কর্তৃক স্তূপার্চনা এবং রাজাদেশে তার মৃত্যু। আখ্যায়িকায় শ্রীমতীর ঘটনা একটি বিবৃতি মাত্র। কবিতায় শ্রীমতীর ভক্তি মুখ্য হয়ে উঠে আত্মবিসর্জনে স্পৃহনীয় পরিসমাপ্তি লাভ করেছে।

---

১০ সুপ্রিয়ার কাহিনী, কল্পদ্রুমাবদান, পৃ ২৯৬-৯৯, S.B.L.N.

১১ অবদানশতক, পৃ ৩৩, S.B.L.N.

পরবর্তীকালে এই কাহিনী অবলম্বনে নটীর পূজা নাটক রচিত। নাটক বলেই তার সঙ্গে অনেকটা গল্পাংশ জুড়ে দিতে হয়েছে, অনেক পাত্রপাত্রীও দেখা দিয়েছে; তৎসত্ত্বেও 'রাজবাড়ির নটী' শ্রীমতীই শ্রেষ্ঠ পাত্রী ও নায়িকা। কবিতায় শ্রীমতীর স্তূপার্চনা আত্মনিবেদনের নৃত্যে রূপান্তরিত। এই নৃত্যটিতেই নাটকের চরম উপসংহার। শুধু তাই নয়, এই নৃত্যটির মধ্যেই পরবর্তীকালে-লিখিত যাবতীয় রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের বীজ নিহিত। আর সেই কারণেই শ্রীমতীর পূজানৃত্য বিশেষ অর্থবাহী। তবে এসব অনেক পরবর্তীকালের ব্যাপার, কবিতাটি রচনার সময়ে "মহাকবির কল্পনাতে ছিল না এই ছবি"।

কেন বুদ্ধ তাঁহার পতিব্রতা স্ত্রী যশোধরাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত কাহিনীতে প্রদত্ত হইল :

অতীতকালে তক্ষশিলায় বজ্রসেন নামে এক অশ্ব-বিক্রেতা বাস করিত; একদা বারাণসীর এক মেলা হইতে ফিরিবার সময় তাহার সবগুলি অশ্বই অপহৃত হইল; সে নিজেও ভীষণভাবে আহত হইল। বারাণসীর শহরতলীতে যখন সে একটি ভগ্নগৃহে শয়ন করিয়াছিল, তখন সে নগরপাল কর্তৃক চোর সন্দেহে ধৃত হইল। তখন তাহাকে হত্যা করিবার আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু বারাণসীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বারনারী শ্যামা তাহার পুরুষোচিত অপূর্ব কান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইল। শ্যামা তাহাকে ভালোবাসিয়া ফেলিল এবং যে কোনো উপায়ে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য তাহার এক সহচরীকে অনুরোধ করিল। প্রভূত অর্থব্যয়ে সে বজ্রসেনকে মুক্ত করিল এবং শ্যামার প্রতি অনুরক্ত জনৈক বণিকপুত্র রাজার আদেশ পালন করিল। সেই হতভাগ্য বণিকপুত্র নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা না করিয়াই অপরাধীর সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর লইল এবং বধ্যভূমিতে ঘাতকবৃন্দ কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত হইল।

সেই রমণী (শ্যামা) যথার্থই বজ্রসেনের প্রতি অনুরক্তা ছিল। কিন্তু বণিকপুত্রের প্রতি তাহার এই অমানুষিক ব্যবহার বজ্রসেনের মনে গভীর অনুশোচনার সঞ্চার করিল। এইরূপ অপরাধের বিনিময়ে ক্রীত শ্যামার প্রেমে সে স্বামী হইতে পারিল না। একদা তাহারা নৌ-বিহারে বাহির হইয়া বজ্রসেন শ্যামাকে মদ্যপান করাইল; যখন সে প্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়িল, তখন সে তাহাকে হত্যা করিল এবং তাহার দেহ জলে ফেলিয়া দিল। বজ্রসেন যখন দেখিল যে, সে সত্যই মৃত, তখন সে তাহার দেহটি ঘাটের সিঁড়িতে রাখিয়া পলায়ন করিল। শ্যামার মাতা অদূরে ছিল; তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ছুটিয়া আসিল এবং অনেক পরিশ্রমের পর শ্যামার জীবন ফিরাইয়া আনিল। সুস্থ হইয়া শ্যামার প্রথম কর্তব্য হইল তক্ষশিলার এক ভিক্ষুণীকে বাহির করা, এবং সেই ভিক্ষুণীর মারফত বজ্রসেনকে বলিয়া পাঠাইল, সে যেন তাহার প্রেমের বন্ধনে ধরা দেয়। বুদ্ধই সেই বজ্রসেন এবং শ্যামা সেই যশোধারা।[১২ ১৩]

---

১২ বিশেষভাবে লক্ষণীয়, মূল কাহিনীতে উত্তীয়ের নাম নাই; বণিকপুত্ররূপে তাহার উল্লেখ আছে মাত্র। মহাবস্তু অবদানে অন্যত্র উত্তীয় নামটির উল্লেখ আছে (দ্রষ্টব্য ১১৫ পৃ)

"When the Lord lived at Gṛdhrakuta in Rājagṛha, Maudgalāyana chanced to meet a Suddhavāsa Devaputra. From him he learned of the great merits of one Uttiya, a banker, the disciple of Sarvāvibhu."

১৩ শ্যামা বজ্রসেনের কাহিনী, মহাবস্তু অবদান, পৃ ১৩৫, S. B. L. N.

কথা কাব্যের পরিশোধ কবিতাটি অবলম্বনে পরবর্তীকালে শ্যামা নৃত্যনাট্য রচিত হয়েছে। মূল কবিতা ও তার রূপান্তর সকলেরই সুপরিচিত। বজ্রসেনের চৌরাপবাদ ও নগরপাল কর্তৃক তার বন্দীদশা, শ্যামা কর্তৃক তাকে উদ্ধার, শ্যামার প্রেমমুগ্ধ এক বণিকপুত্রের চৌরাপবাদ গ্রহণ ও রাজদণ্ডে মৃত্যু, শ্যামা ও বজ্রসেনের পলায়ন, শ্যামার মুখে প্রকৃত ঘটনা শ্রবণে বজ্রসেন কর্তৃক শ্যামাকে হত্যা (অন্ততঃ তা-ই সে মনে করেছিল), এবং অবশেষে জ্ঞানলাভের পরে শ্যামার বজ্রসেনকে পুনরায় আহ্বান—এ পর্যন্ত মূল আখ্যায়িকার ধারা কবিতায় অনুসৃত হয়েছে। শুধু এইটুকুই যদি যথাশিল্প চিত্রিত হত তা হলেও কবিতাটি সার্থক হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু কবিতাটিতে আরও কিছু অতিরিক্ত আছে। প্রেম ও পাপ -বোধের মধ্যে দ্বন্দ্ব অতি সূক্ষ্ম সুনিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে কবিতাটিতে। নৃত্যনাট্যে এই চিত্র সূক্ষ্মতর, সুনিপুণতর তূলিকায় অঙ্কিত। প্রেম ও পাপের মধ্যে এমন নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রসাহিত্যে খুব বেশি নেই।

বজ্রসেনের অন্তিম কাতরোক্তি

জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।

দুর্বল মানবজীবনের এই হয়তো শেষ প্রার্থনা। পরিশোধ কবিতায় এ দ্বন্দ্ব অবশ্যই আছে তবে নৃত্যনাট্যে অধিকতর পরিস্ফুট করে দেখানো হয়েছে। পূর্বোক্ত আখ্যায়িকাগুলি বা বস্তুর সঙ্গে কবিতাগুলি মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রূপান্তর সাধনে একটি বিশেষ নিয়ম অনুসৃত হয়েছে। সে নিয়মটি কবির ভাষাতে প্রকাশ করলে দাঁড়ায়, "তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।" জাতককার ছিলেন ভক্ত, তিনি দেবতার নরলীলার মহিমা বর্ণনা করেছেন, আর এ যুগের কবি নরের দেবলীলা বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চোখে বুদ্ধ মানুষ, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ; তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠার জন্য অতিপ্রাকৃতের প্রয়োজন আছে তিনি মনে করেন না। তাঁর মহত্ত্বের প্রেরণায় মানুষও মহৎ হয়ে উঠেছে, "দীননারী এক ভূতলশয়ন,···অরণ্য-আড়ালে রহি কোনোমতে" একমাত্র বাস প্রভুর উদ্দেশে দান করতে পারে, ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা দূর করবার সাহস অর্জন করে, শ্রীমতী রাজদণ্ডের ভয় না ক'রে স্তূপপদমূলে আরতিদীপ জ্বালিয়ে দেয়। প্রকৃত মহত্ত্ব নিজের চার দিকে বিভূতি বিকিরণ করে, সেই আলোয় কত অন্ধকার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মহত্ত্বের সেই লীলাটি কবি কর্তৃক প্রদর্শিত হয়েছে। এটাই সাধারণ সূত্র। অবশ্য অনুষঙ্গরূপে আরও কিছু আছে। অতিপ্রাকৃতের মতো রুচিবিগর্হিত স্থূলতাও বর্জিত হয়েছে, যেমন বাসবদত্তার নাক কান কাটবার বিবরণ। দুইই স্থূল, অতিপ্রাকৃতও একপ্রকার স্থূলতা। রুচি ও ঘটনার স্থূলতা সম্বন্ধে রবীন্দ্র-কবিচরিত্র একান্ত স্পর্শকাতর।

জাতকবস্তুর আলোচনা শেষে এবারে আমরা আর এক শ্রেণীর কবিতা আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

৩

কথা কাব্যের অপমানবর, স্বামীলাভ ও স্পর্শমণি কবিতা তিনটির আখ্যায়িকা বা বস্তু ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে গৃহীত। এবার আমরা ঐতিহাসিককালের মধ্যযুগে এসে উপস্থিত হয়েছি, কবিতা তিনটির নায়ক কবির, তুলসীদাস ও সনাতন তিনজনেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। অবশ্য বুদ্ধদেবও ঐতিহাসিক ব্যক্তি, বস্তুতঃ তাঁকে দিয়েই ভারতে ঐতিহাসিক কালগণনার সূত্রপাত। কিন্তু জাতক-কাহিনীতে প্রাকৃতে ও অতিপ্রাকৃতে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে স্বভাবতই অনেকটা ইতিহাসের সীমানার বাইরে গিয়ে পড়েছে।

প্রথমে স্পর্শমণি কবিতাটির আলোচনা করা যাক; কারণ এখানে বস্তুতে ও কবিতায় মিল সবচেয়ে বেশি, কাজেই আলোচনার ক্ষেত্র সংকীর্ণ।

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন শ্রীজীব গোস্বামী।
হরিভক্তি মূর্ত্তির প্রকট নবভূমি।[১৪]

…তবে চলি গেল গোসাঞি শ্রীবৃন্দাবন॥
অলৌকিক অসম্ভব গোসাঞির প্রেম।
বৈরাগ্যের সীমা আর অপতিত নেম॥
মূর্ত্তিমান মহাতেজঃ সমুদ্র গম্ভীর।
শাস্ত্রান্তগা পৃথিবীর মধ্যে এক ধীর॥
প্রতিদিন এক এক বৃক্ষতলে বাস।
প্রতিদিন পরিক্রমা নাহিক আলস॥
বৃক্ষতলে থাকি সদা গ্রন্থানুশীলন।
অলক্ষে করেন পরিক্রমা বৃন্দাবন॥
এক লীলা গোসাঞির শুন চমৎকার।
যাহার শ্রবণে হয় ভব-নিধি পার॥
একদিন গোসাঞি স্নান করিতে যমুনা।
স্পর্শমণি পাইলেন যাতে হয় সোনা॥
মনে ভাবেন কোন দীন দরিদ্র দেখিয়া।
তারে দিব এখন কোথায় রাখি লইয়া॥
স্পর্শ না করিয়া খাপরেতে ধরি নিয়া।
কোন স্থানে রাখিল মৃত্তিকা আচ্ছাদিয়া॥
দৈবযোগে গৌড়দেশের এক ব্রাহ্মণ।
বর্দ্ধমানে মানকরেতে ভবন॥
জীবন তাহার নাম বহুত কুটুম্ব।
সুদরিদ্র কিছু মাত্র নাহি অবলম্ব॥
বিবেকী হইয়া কাশী পুরীতে যাইয়া।
অর্থাকাংক্ষী হইয়া বহু বৎসর ব্যাপিয়া॥
শিব আরাধন কৈল তীব্রব্রত করি।
প্রসন্ন হইয়া শিব কহে বিপ্রোপরি॥
বৃন্দাবনে যাহ তথা সনাতন নাম।
তাহার নিকটে গেলে পুরিবেক কাম॥
বহু ধন পাবে তথা যাবে দরিদ্রতা।
লোকেতে দুর্লভ যাহা সর্ব্ব দুঃখহর্ত্তা॥
আহা কিবা দয়াময় দেব মহেশ্বর।
গরল চাহিতে দিল অমৃত সাগর॥
শিবের অজ্ঞাতে বিপ্র ধনের আশাতে।
বৃন্দাবন ধাম তবে চলিলা ত্বরিতে॥
বিপ্রের সংসার ক্ষয় উন্মুখ সময়।
তাহা নাহি জানে ধন চিন্তয়ে হৃদয়॥
বিধাতা সদয় যবে হয় দুঃখিজনে।
গুগ্‌লি খুঁজিতে হস্তে মিলয়ে রতনে॥
কতদিনে বৃন্দাবন ধামে সনাতন।
নিকট হইল যাঞা সুকৃতি ব্রাহ্মণ॥
গোসাঞিরে গিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ করি।
আনন্দ আবেশে রহে করযোড় করি॥

---

১৪ চরিত্র শ্রীরূপ সনাতন, ভক্তমাল গ্রন্থ

গোসাঞি প্রণাম করি করি করযোড়।
পুছেন ব্রাহ্মণে মিষ্ট বাক্যে প্রিয়ংকর॥
কে তুমি ঠাকুর মহাশয় কিবা অর্থে।
আগমন করি কৃপা করি মোর সাথে॥
গোসাঞির নম্রতা সুমিষ্ট বাক্য শুনি।
দ্রবিল বিপ্রের চিত্ত চমৎকার গণি॥
বিপ্র কহে মহাশয় আমি সুদরিদ্র।
অর্থ লাগি ভজিলাম বহুকাল রুদ্র॥
কৃপা করি মহাদেব আদেশ করিলা।
তোমার চরণে মোরে আসিতে কহিলা॥
বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর স্থানে।
যাইলে পাইবে অর্থ ইথে নাহি আনে॥
গোসাঞি কহেন মুঞি অর্থ কোথা পাব।
মহাদেব মোর স্থানে কি হেতু পাঠাব॥
ভিক্ষাজীবী হঙ্ মোর অর্থ কোথা হয়।
ইহা শুনি ব্রাহ্মণের বিদরে হৃদয়॥
হা হা মোর ভাগ্যে কি ঈশ্বর প্রতারিল।
কিম্বা মুঞি স্বপনে কি প্রলাপ দেখিল॥
ব্রাহ্মণে কাতর দেখি দয়াল গোসাঞি।
আকাশ পাতাল ভাবি কূল নাহি পাই॥
দৈবাৎ পড়িল মনে মণির বৃত্তান্ত।
আশ্বাস করিয়া ব্রাহ্মণেরে করে শান্ত॥
হায় হায় ঠাকুর মোর স্মরণ হইল।
মিথ্যা নহে শ্রীমান মহাদেব যে কহিল॥
স্পর্শমণি লবে চল দেখাইয়ে দেই।
বিস্মিত হইল তেকারণে কহি নাই॥
ব্রাহ্মণেরে লইয়া যমুনাতীরে গিয়া।
বাম হস্ত তর্জ্জনি অঙ্গুলি হেলাইয়া॥
কহে এইখানে দেখ মৃত্তিকা খুদিয়া।
ব্রাহ্মণ খুদিয়া বলে না পাই খুঁজিয়া॥
গোসাঞিরে বোলে কোথা দেহ উঠাইয়া।
তেঁহো কহে না স্পর্শিব স্নান না করিয়া॥
পুনঃ তল্লাসিতে বিপ্র মণি যে পাইল।
গোসাঞিরে দণ্ডবৎ করিয়া চলিল॥
পথে চলি যায় বিপ্র ভাবে মনে মনে।
এ হেন পদার্থ গোসাঞি দিল কি কারণে॥
রাখিবার কায থাকুক স্পর্শ নাহি করে।
স্পর্শের থাকুক কায ঘৃণাতে না হেরে॥
আমার চরিত্র এই সেই বস্তু লাগি।
তপঃ করি ঈশ্বর সেবনে অনুরাগী॥
ছি ছি মোরে ধিক ধিক হেন তুচ্ছ বস্তু।
যাহার লাগিয়া মুঞি সদাই অসুস্থ॥
অতএব হেন বস্তু দূরে তেয়াগিয়া।
গোসাঞির চরণে স্মরণ লব গিয়া॥
তেঁহো যে রতন প্রাপ্ত হইয়া মজিল।
তাহাই লইব এই প্রতিজ্ঞা করিল॥
তাঁহার চরণে যাঞা শরণ লইব।
বিনিমূলে তাঁর পদে বিক্রীত হইব॥
এতেক ভাবিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া।
বটেশ্বর গ্রাম হৈতে গেলেন ফিরিয়া॥
গোসাঞির পদেতে পড়িয়া বিপ্রবর।
নিজ অভিলাষ যাহা করিল বিস্তার॥
এ তুচ্ছ রতনে মোর নাহি কিছু কাম।
কৃপা করি কর প্রভু মোরে আত্মসম॥
শরণ লইল তব অভয় চরণে।
কৃতার্থ করহ দিয়া কৃষ্ণ প্রেমধনে॥

আগেই বলা হয়েছে বস্তুতে ও কবিতায় প্রভেদ বেশি নাই, এমন-কি কবিতার "জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম, জিলা বর্ধমানে" আখ্যায়িকার "দৈবযোগে গৌড়দেশের এক ব্রাহ্মণ। বর্ধমানে মানকরেতে ভবন। জীবন তাহার নাম," —হুবহু এক। জীবনের দারিদ্র্য, শিবের কাছে ধন প্রার্থনা,

শিব কর্তৃক জীবনকে বৃন্দাবনে গিয়ে সনাতনের শরণ নেওয়ার আদেশ, শিবের আদেশ শ্রবণে সনাতনের দুশ্চিন্তা, অবশেষে স্পর্শমণি-প্রাপ্তির ঘটনা স্মরণ, জীবনের স্পর্শমণি লাভ, স্পর্শমণি প্রত্যাখান ও সনাতনের শরণ গ্রহণ— সর্বত্র কবি নিষ্ঠার সঙ্গে মূলকে অনুসরণ করেছেন।

"যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মানো না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে।" এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মানিক।

আর—

তেঁহো যে রতন প্রাপ্ত হইয়া মজিল।
তাহাই লইব এই প্রতিজ্ঞা করিল ॥···
এ তুচ্ছ রতনে মোর নাহি কিছু কাম।
কৃপা করি কর প্রভু মোরে আত্মসম ॥

দুয়ে কাব্যাংশ ছাড়া মর্মাংশে অমিল নাই। স্পর্শমণির গুণে দুইটিই সোনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

শ্রীমান্ তুলসীদাস জগতে বিখ্যাত।
অলৌকিক অদ্ভুত যাহার চরিত্র ॥[১৫]

স্বর্গার্থী হইয়া নানা কর্ম্ম যেই করে।
দীন হীন সেই জন ভ্রময়ে সংসারে ॥
মুমুক্ষু যে জ্ঞানযোগে করয়ে অবস্থান।
ক্লেশমাত্র তার সে হারায় প্রেমধন ॥
যোগির সে যোগসহ পরম বিরস।
ওরে মন সব ত্যজি হও মোর বশ ॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ তপ যতনে ত্যজহ।
আমার রসনা মাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ ॥
এক স্ত্রী স্বামির সহ সতী হইতে যায়।
সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করয় ॥
এই স্ত্রী এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম যে মানিয়া।
প্রাণান্তিক দেহে দণ্ড করে জানাইয়া ॥
স্বর্গভোগ ফল অতি তুচ্ছ না বুঝিয়া।
পরম যে ধর্ম্ম করি অন্তরে জানিয়া ॥

আত্যন্তিক ক্লেশ দেহ দগ্ধ যে করিয়া।
ফল্গু অর্থ পায় পরিণাম না বুঝিয়া ॥
সম্মুখে দারুণ কাল সংসার অনল।
ফল্গু সুখ লোভে জানি বুঝে তার ফল ॥
দয়াল হৃদয় সাধু এতেক চিন্তিয়া।
স্ত্রীর নিকটে গেলা করুণা করিয়া ॥
মহান্ত তুলসীদাস দেখিয়া যে নারী।
প্রণাম করিলা অতি ভক্তি ভাব করি ॥
সেই যে সুকৃতি তার সাক্ষাৎ ফলিল।
শুন তার কথা সাধু যে কৃপা করিল ॥
আগেতে নারীকে অতি প্রশংসা করিলা।
শেষে ক্রমে ২ তত্ত্ব কহিতে লাগিলা ॥
শুন দেখি মাতা তুমি সতী যে হইবে।
ইহাতে বা পরলোকে কি গতি পাইবে ॥
নারী কহে স্বামি সঙ্গে স্বর্গেতে যাইব।
চৌদ্দ মহেন্দ্রকাল বিষয় ভুঞ্জিব ॥

---

১৫ ভক্তমাল গ্রন্থ

সাধু কহে তাহার অন্তেতে কি হইবে।
তেঁহ কহে কর্ম্ম বশে যে হয় হইবে॥
সাধু কহে কর্ম্মক্ষয় ইথেত না হৈল।
দারুণ সংসার জ্বালা তাহাতে না গেল॥
যদি কহ বহুকাল সুখ আস্বাদন।
বহুজ্ঞান করিতেছে মোহের কারণ॥
লক্ষ লক্ষ ইন্দ্রপাত কালে হইতেছে।
চৌদ্দ ইন্দ্র ব্রহ্মার একদিনে যাইতেছে॥
স্বর্গ সেই স্বাভাবিক অনিত্য যে হয়।
সে থাকুক ব্রহ্মাণ্ড যে এহ নাশ যায়॥
জীব কত শত ব্রহ্মার আয়ুঃ যে পর্য্যন্ত।
ভ্রমণ করিছে কত নাহি হয় অন্ত॥
অতএব অল্প সুখ বিষয় লাগিয়া।
মিথ্যা মায়ামোহে মর দেহ জ্বালাইয়া॥
নারী কহে মহাশয় কর্ত্তব্য কি হয়।
জন্ম মৃত্যু মায়া মোহ কি করিলে যায়॥
সাধু কহে মাতা তব শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে কিছু কহি শুন তাহার উপায়॥
জীয়ন্ত শরীর পোড়াইয়া যাহা নহে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম আচরিয়া বেদে যাহা কহে॥
সুন্দর বিধানে করিলেও যে না হয়।
শ্রীরামচরণ শ্রেয়ঃ মাত্র সুখ পায়॥
রাম নাম মহামন্ত্র যে জন জপয়।
সেই ধন্য ২ সেই ত্রিলোক বিজয়॥
এক নামে কোটি মহাপাতক নাশিয়া।
জীবত মুকত হয় নির্ম্মল হইয়া॥
পুনঃ ২ সাধনেতে কি হয় না জানি।
চতুরবর্গ নাহি চায় অতি তুচ্ছ মানি॥
যে স্বর্গ লাগিয়া তুমি দেহ কৈলে পণ।
তার নাম শুনি তেঁহ কর্ণে হস্ত দেন॥

তাঁহার দর্শনে লোক পবিত্র হইয়া।
সেই রামচন্দ্র ভজে শরণ লইয়া॥
দেবগণ পিতৃগণ ধন্য ধন্য করে।
সর্ব্ব গুণ সহ বৈসে তাহার শরীরে॥

তথাহি পঞ্চমে। যস্যাস্তি ভর্গবত্যকিঞ্চিনা ইত্যাদি

তুমি দেহ পোড়াইছ ক্ষুদ্র ফল আশে।
সেই মহাফল পায় সুখে অনায়াসে॥
প্রেমভক্তি মহাফল সর্ব্ব ফলের ফল।
সর্ব্ব সুখময় সর্ব্ব শুভের মঙ্গল॥
নিত্য সুখ সেই তার নাহিক বিকাশ।
চিদানন্দ শ্রীবৈকুণ্ঠধামে হয় বাস॥
স্বর্গ যে অনিত্য তাহা দুঃখেতে মিশ্রিত।
হর্ষাদি মাৎসর্য্য ভয় বিচ্ছেদ বিব্রত॥
বৈকুণ্ঠ পরম ধাম নিত্য চিদানন্দ।
হর্ষ রাগ দ্বেষ মোহ নাহি মায়া গন্ধ॥
অতএব শ্রীরামপদে শরণ যে লয়।
তাহার মহিমা কিছু কহা নাহি যায়॥
এতেক শুনিয়া স্ত্রীর মন ফিরি গেল।
মোহ দূরে গেল চিত্ত প্রকাশ হইল॥
তবে মোর কি কর্ত্তব্য কহ মহাশয়।
কৃপা করি কর যাতে মোর হিত হয়॥
তবে সাধু রামমন্ত্র উপদেশ দিলা।
তাহার কৃপাতে তার মন ফিরি গেলা॥
তৎক্ষণাৎ প্রেমভক্তি উদয় হইল।
জন্ম অন্ধ জন যেন চক্ষুস্মন হৈল॥
শ্রীমান তুলসীদাস নিজ ভক্তিবলে।
শক্তি সঞ্চারণ কৈল ভাসে প্রেমজলে॥
কৃপা করি স্বামী তার বাঁচাইয়া দিলা।
তাঁহারেও রামচন্দ্র চরণে সঁপিলা॥

আখ্যায়িকায় ও স্বামীলাভ কবিতায় তুলনা করলে দেখা যাবে যে তুলসীদাস ও বিধবারমণীর চরিত্র

অঙ্কনে কবি মূলানুগতা রক্ষা করেছেন। তুলসীদাস বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, স্বর্গভোগের সুখ অত্যন্ত তুচ্ছ ; বুঝিয়েছেন যে, "পরমধর্ম" লাভ করলে স্বর্গলাভকে আর শ্রেয় মনে হয় না, কারণ স্বর্গভোগ যত দীর্ঘকালেরই হোক না কেন তার পরে আবার জন্মগ্রহণ করে কর্মপাশে ফিরে আসতে হবে। তার বদলে রমণী যদি রামনাম গ্রহণ করে তবে "প্রেমভক্তি মহাফল সর্বফলের ফল, সর্ব সুখময়, সর্ব শুভের মঙ্গল, নিত্য সুখ সেই তার নাহিক বিকাশ।" সাধুর উপদেশে রমণীর "মোহ দূরে গেল চিত্ত প্রকাশ হইল।" তখন সে শুধালো "তবে মোর কি কর্তব্য কহ মহাশয়, কৃপা করি কর যাতে মোর হিত হয়।" তুলসীদাসের উপদেশে "তাহার কৃপাতে তার মন ফিরি গেলা।" তখন তুলসীদাস "কৃপা করি স্বামী তার বাঁচাইয়া দিলা। তাঁহারেও রামচন্দ্র চরণে সঁপিলা।"

স্বামীকে পুনর্জীবন দান অতিপ্রাকৃত বলে কবিকর্তৃক বর্জিত হয়েছে। তার বদলে এ যুগের কবি স্বামীলাভকে অন্তরের উপলব্ধিরূপে চিত্রিত করেছেন। প্রতিবেশীরা

শুধাইল, পেলে স্বামী ? নারী হাসি বলে,
পেয়েছি তাঁহারে।
শুনি ব্যগ্র কহে তারা, কহো তবে কহো
আছে কোন্ ঘরে।
নারী কহে, রয়েছেন প্রভু অহরহ
আমারি অন্তরে।

কবিরজী জন্ম পূর্ব্বে যবনের ঘরে।
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা যাহার উপরে॥[১৬]

দেখিয়া বুঝিল মনে এ কর্ম্ম প্রভুর।
নহে এত দ্রব্য কেবা আনিবে প্রচুর॥
বৈষ্ণব সজ্জনে সাধু বিলাইতে লাগিল।
ব্রাহ্মণগণের মনে অসূয়া জন্মিল॥
কহে হারে বেটা জোলা তিলকধারীগণে।
অর্থ বিলাইলি কিছু না দিলি ব্রাহ্মণে॥
না দিবি ত আজি মোরা মারিব তোমারে।
কবির বিনয় করি কহে সবাকারে॥
ঘরেতে নাহিক কিছু চেষ্টা করি গিয়া।
যদি কিছু পাই দিব বাঁটরা করিয়া॥
এত কহি হাটে শূন্য ঘরে গিয়া রহে।
ভয়ে নাহি গৃহে আইসে রাম রাম কহে॥
পুনঃ বহু ধন হরি আনে রূপান্তরে।
কবির পাঠায় বলি আনি দিল ঘরে॥
কবির আসিয়া মর্ম্ম বুঝিয়া অন্তরে।
অদৈন্য করিয়া দিল ব্রাহ্মণগণেরে॥
তথাচ ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষা না ছাড়য়।
বৈষ্ণব সহিতে যথা দেবে দৈত্যে হয়॥
ইদানী বিপ্রের রীতি অনুভব হৈল।
পূর্ব্বেও বৈষ্ণব দ্বেষী এমতি আছিল॥
কবিরের প্রতি ঈর্ষা করি বিপ্রগণ।
জন চারি করে নিজ মস্তক মুণ্ডন॥

১৬ চরিত্র শ্রীকবিরজী, ভক্তমাল গ্রন্থ

বৈষ্ণবের বেশ ধরি গ্রামেং গিয়া।
আইল ব্রাহ্মণগণ নেওতা করিয়া ॥
সহস্রেক বৈষ্ণবের ঘরেং গিয়া।
কবিরের গৃহে মহোৎসব যে কহিয়া ॥
কবিরের গৃহে আসি সবে জমা হৈল।
বৃত্তান্ত শুনিয়া সাধু চিন্তিত হইল ॥
উপায় না দেখি এক স্থানে গিয়া বৈসে।
পূর্ব্ববৎ সামগ্রী লইয়া প্রভু আইসে ॥
সব সমাধান কৈল কবিরের বেশে।
তেঁহ আসি মিলি সুখসাগরেতে ভাসে ॥
সিদ্ধ বলি লোকে বড় জনরব হৈল।
আকার গোপন হেতু এত ছল কৈল ॥
এক স্ত্রী বেশ্যা যে তাহার হাত ধরি।
নগরের লোকেরে দেখাইয়া বুলি ফিরি ॥
সাধু লোক তা দেখি অন্তরে পায় ব্যথা।
অসাধুর হর্ষ চিত্ত লাভ অংশে যথা ॥
তাহার অন্তরে কিছু বিকার ত নাহি।
অবিজ্ঞা করয়ে লোক ভ্রষ্ট হৈল কহি ॥
এক দিনে কবির সেই বেশ্যার সহিতে।
রাজার সভাতে গেল করিয়া যাঁহাতে ॥
রাজা দেখি পূর্ব্ববৎ ভক্তি নাহি কৈল।
দণ্ডবৎ না করিল আসন না দিল ॥
হরিভক্ত ছাপাইয়া ছাপা নাহি যায়।
মৃগমদ গন্ধ যথা বস্ত্রে না লুকায় ॥

সভা হৈতে ফিরি সাধু যাইবার কালে।
তটস্থ হইয়া করয়ার জল ঢালে ॥
রাজার অন্তরে কিছু ভয় উপজিল।
অবজ্ঞা করিনু হেতু কি জানি কি কৈল ॥
একান্ত করিয়া রাজা পুছে বারবার।
বুঝি কিছু অনিষ্ট যে করিলা আমার ॥
সাধু কহে না না তব অনিষ্ট না করি।
রাজা কহে তবে কেন ছরকাইলে বারি ॥
সাধু কহে শ্রীমন্দিরে শ্রীপুরুষোত্তমে।
আগুন পড়িয়াছিল কোন কার্যক্রমে ॥
ভিড়িতে সেবকগণ পদ দিতেছিল।
চরণ পুড়িবে বলি জল ঢালি দিল ॥
রাজা তাহা শুনি সেইদিন বার তিথি।
লিখিয়া পাঠায় ক্ষেত্রে লাগিয়া প্রতীতি ॥
লোকের দ্বারায় তারা জানিলেন তথ্য।
অগ্নি পড়ে ছিল বটে নিভাইল সত্য ॥
তখন রাজার মনে ভয় জনমিল।
ভ্রষ্ট বলি বৈষ্ণবেরে অবজ্ঞা করিল ॥

যাইয়া দম্পতী শ্রীমন্ কবির চরণে।
পড়িয়া কান্দয়ে ধারা বহে দুনয়নে ॥

মূল আখ্যায়িকার সঙ্গে অপমানবর কবিতাটির অনেক প্রভেদ অর্থাৎ আখ্যায়িকায় এমন অনেক বিষয় আছে যা কবিতায় নাই। দুটি কারণে কবিকে গণ্ডী সংকীর্ণ করতে হয়েছে। প্রথমতঃ আখ্যায়িকার অনেক বিষয় অতিপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত ঘেঁষা। দ্বিতীয়তঃ কবিরের মহত্ত্ব প্রদর্শনের জন্য একটি ঘটনাই যথেষ্ট মনে করেছেন কবি। ব্রাহ্মণগণ ষড়যন্ত্র ক'রে কবিরের সঙ্গে এত পতিতা রমণীকে জুটিয়ে দিল, এই একটিমাত্র ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে, তার বিস্তার সাধনের দ্বারা কবির-চরিত্রের মহত্ত্ব দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। জাতক-গাথাগুলোর রূপান্তরের মতো এসব কাহিনীর রূপান্তরেও অতিপ্রাকৃত বর্জিত হয়েছে। প্রাকৃতের মধ্যেই প্রকৃত বিভূতির প্রকাশ সম্ভব এ যুগের নিত্য বিশ্বাস।

পাঞ্জাব ও শিখসমাজ এবং মহারাষ্ট্র ও মারাঠীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছিল কথাকাব্যের কবিতাগুলো লিখবার অনেক আগে, কিন্তু রাজপুতানা সম্বন্ধে তেমন ব্যক্তিগত পরিচয়ের বিবরণ পাওয়া যায় না। তবু যে তিনি রাজপুতানার কাহিনীতে আকৃষ্ট হয়ে ছিলেন তার কারণ রাজপুতানার ইতিহাস শৌর্য বীর্য ও মহত্ত্বের অফুরন্ত আকর। ভারতের সব প্রদেশের কবি সাহিত্যিক শিল্পী চিত্রকর এই আকর থেকে রত্ন উদ্ধার ক'রে কাব্য নাটক উপন্যাস লিখেছেন, গান বেঁধেছেন, ছবি এঁকেছেন। সেই সাধারণ আকর্ষণেই রবীন্দ্রনাথও নেমেছেন এই রত্নগর্ভ খনিতে। তবু অন্যদের সঙ্গে কিছু প্রভেদ আছে। রাজপুত ইতিহাসের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নামগুলি, সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনাগুলিকে কবি এড়িয়ে গিয়েছেন। রাণা সঙ্গ, প্রতাপ সিংহ, রাজ সিংহ, রাঠোর দুর্গাদাস, মান সিংহ, মীর্জা জয় সিংহ, রানী পদ্মিনী বা ধাত্রী পান্না কাউকে পাই নে, তেমনি পাই নে আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ বা হলদিঘাটের সংগ্রাম, এমন আরো অজস্র ইতিহাসবিখ্যাত ঘটনা। যে আখ্যায়িকাগুলি অবলম্বনে ছয়টি কবিতা কবি লিখেছেন তাদের অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব এতটুকু ক্ষুণ্ণ না করেও বলা যায় যে ইতিহাসের রুদ্রবীণায় এগুলো যেন সরু তারে সাধা স্বর। এসব ঘটনা ইতিহাস-গ্রন্থের পাদটীকায় ক্ষুদ্রতর অক্ষরে লিখিত বলেই যেন পূর্বতন কবি ও শিল্পীদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। ইতিহাসের যে রাজপথটাতে ভাটচারণের জয়গানে এবং তূরী-ভেরীর নিনাদে চতুরঙ্গ বাহিনীর সমারোহ কবি তাকে এড়িয়ে গিয়েছেন, তিনি যেন খিড়কি দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছেন রাজপুতানার ইতিহাসের অভ্যন্তরে, যেখানে জীবনের সংগীত নিম্নগ্রামে ধ্বনিত। সেই জন্যই একবার ছাড়া ভারতেতিহাসের কোনো নায়ককে চোখে পড়ে না। খুব সম্ভব বিষয়-নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যে ইতিহাস সম্বন্ধে কবির ধারণার আভাস পাওয়া যায়।

রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও শিখসম্প্রদায় সম্বন্ধে কবিতাগুলিকে ঐতিহাসিক কবিতা বলে গ্রহণ করা উচিত। ছান্দোগ্য উপনিষদ ও বৌদ্ধ কবিতাগুলিকে পৌরাণিক কবিতা বলে ধরাই সংগত। যদিচ বুদ্ধদেব ঐতিহাসিক ব্যক্তি তবু দিব্যাবদানমালা অবদানশতক প্রভৃতিকে ইতিহাস বলতে বাধা আছে— এগুলি স্পষ্টতঃ বৌদ্ধপুরাণ। কাজেই এ-সমস্ত কবিতা পৌরাণিক। ভক্তমালের অন্তর্গত তুলসীদাস, সনাতন ও কবীর প্রভৃতি সাধুসন্তগণও ঐতিহাসিক ব্যক্তি তথাপি কবিতা তিনটিকে ঐতিহাসিক কবিতা না বলাই উচিত। রাজস্থানে প্রবেশের সঙ্গে আমরা ইতিহাসের রাজ্যে প্রবেশ করলাম। এ দেশে পাঠানরাজত্ব প্রতিষ্ঠার আগেই রাজস্থানের রাজন্যবর্গ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পাঠান সুলতান ও মোগল বাদশাদের দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে। শিবাজী ও মারাঠারাজ্য এবং শিখগুরুগণ ও শিখরাজ্য মোগল-বাদশাদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত। কাজেই কালানুক্রমে বিচার করলে আগে রাজস্থান পরে মারাঠা ও শিখ -সমাজ সম্পর্কিত কবিতাগুলির স্থান ; যদিচ রাজস্থানের কোনো কোনো কবিতায়, যেমন পণরক্ষা কবিতাটির ঘটনা একেবারে অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকের। তৎসত্ত্বেও ভারতেতিহাসের ক্রম অনুসরণ ক'রে রাজস্থান, মারাঠা ও শিখ সম্প্রদায়ের আলোচনা করাই বিধিসংগত।

মানী কবিতাটির আখ্যায়িকা টডের রাজস্থান থেকে গৃহীত। এখানে আখ্যায়িকার প্রাসঙ্গিক অংশ প্রদত্ত হল।

দেওরা-যুবরাজ যখন সম্মুখসমরে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না, তখন তিনি নিকটস্থ পাহাড়ে আত্মগোপন করিতেন। কিন্তু একদা যখন তিনি বুঝিলেন যে তিনি নিরাপদ, তখন একদিন গভীর রাত্রে মুকুন্দ একদল সুসজ্জিত সৈন্য সহ সিরোহি-যুবরাজ (সুরতান) যেখানে নিদ্রিত ছিলেন সেখানে প্রবেশ করিলেন। মুষ্টিমেয় সৈন্যদের হত্যা করিলেন এবং নিদ্রিত রাজাকে স্বীয় পাগড়ি দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিলেন। অনুচরদের চতুর্দিকে দাঁড় করাইয়া যুবরাজের সৈন্যদের ডাক দিলেন। পাহাড়ের গুহা হইতে বাহির হইয়া দেওরা-অনুচরবৃন্দ তাহাদের রাজার চতুর্দিকে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিল। তখন নহুর তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা দেখছ তাঁর জীবন আমার হাতে। তোমরা যদি বুদ্ধিমান হও— তা হলে জেনো তিনি নিরাপদ। আমি তাঁকে আমার রাজার কাছে নিয়ে চললাম; যদি তোমরা বাধা দাও, তা হলে তাঁর মৃত্যু সুনিশ্চিত। তোমাদের যে সতর্কবাণী দিয়ে ডেকেছি, তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যাতে তোমরা আমার এই কাজ দেখতে পাও।"

তিনি সুরতানকে (সিরোহিপতি) যশোবন্তের নিকট লইয়া গেলে যশোবন্ত বলিলেন যে, রাজার (আরংজেবের) সহিত সুরতানের পরিচয় করাইতে হইবে। দেওরা-রাজকে রাজসভার দিকে লইয়া যাইবার পথে যখন তাঁহারা প্রাসাদের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন তখন সুরতানকে বলা হইল যে, তিনি যেন রাজার (আরংজেবের) প্রতি যথোচিত সম্মান দেখান। নচেৎ বিপদ ঘটিবে। উদ্ধত দেওরা উত্তর দিলেন, "আমার জীবন রাজার হাতে কিন্তু আমার সম্মান নিজের হাতে। আমি কখনো কারো কাছে মাথা নত করি নি, কখনো করব না।"

যখন যশোবন্ত নিজে সুরতানের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করিতে অনুরোধ জানাইলেন, তাঁহার অন্যান্য সহকারীবৃন্দ চাতুরীপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করিল। সাধারণভাবে পথে না লইয়া তাহারা তাঁহাকে সংকীর্ণ প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে লইয়া গেল। কিন্তু সুরতান প্রথমে দেহের নিম্নভাগ প্রবেশ করাইয়া পরে মাথা গলাইলেন। তাঁহার এই মহৎ আত্মসম্মানের দৃষ্টান্ত দেখিয়া যশোবন্ত তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন এবং রাজাও (আরংজেব) সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি শুধু ক্ষমাই করিলেন না, প্রভূত ভূ-সম্পত্তিও দান করিলেন। যদিও রাজা সবটুকু খুলিয়া বলিলেন না, সুরতান শর্ত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "মহারাজ! অচলগড়ের তুল্য আপনার কি আছে? আমাকে সেখানে ফিরে যেতে দিন এবং আমি তাই চাই।" সুরতানের এই অনুরোধ রাখিবার মতো রাজার মহত্ত্ব ছিল; আবু দুর্গে (অচলগড়) সুরতানকে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইল।[১৭]

কবিতায় কেবল শেষের অংশটুকু গৃহীত হয়েছে— যখন সম্মান ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে রাজা যশোবন্ত সুরতানকে আরংজেবের দরবারে হাজির করলেন। আরংজেব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন; আর শুধু তাই নয়, সুরতানকে অচলগড়ে অচল হয়ে বাস করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। আরংজেবের

১৭ James Todd, *The Annals and Antiquities of Rajasthan,* Vol. II.

এই আচরণ প্রচলিত ধারণার বিরোধী হলেও নিঃসন্দেহ সত্য। সুরতানের প্রতিজ্ঞা, "গুরুজনের চরণ ছাড়া করি নে কারে প্রণিপাত।" তাঁর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে সংকীর্ণ ও নিচু দরজা দিয়ে তাঁকে প্রবেশ করাবার চেষ্টা সত্য হতে পারে, যে ভাবে সুরতান প্রবেশ করলেন তা তেজোব্যঞ্জক হতে পারে, তবু কবি তাকে পরিত্যাগ করেছেন, কেননা তেজপ্রকাশের এই কায়িক কসরৎ কাব্যে হাস্যকর প্রতিভাত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। প্রবলপরাক্রান্ত মোগল বাদশার সম্মুখে

এমন যেন না হয় মতি
ভয়েতে কারে করিব নতি—
জানি নে কভু ভয়-ডর।

এই সমস্ত উক্তিকেই কবি যথেষ্ট মনে করেছেন।

পণরক্ষা কবিতাটির আখ্যায়িকাটিও টডের রাজস্থান থেকে গৃহীত। আজমীড় গড় রক্ষার প্রতিশ্রুতি এবং প্রভুর আদেশের উভয়-সংকটেও দুর্গরক্ষক ডুমরাজের বীরোচিত প্রাণত্যাগ অংশটুকু নিয়েই কবিতাটি রচিত। আগে সেই প্রাসঙ্গিক অংশ দেখা যাক, পরে কিছু পূর্ব-ইতিহাসের প্রয়োজন হবে।

> Tonga-র ক্ষণস্থায়ী বিজয়ে আজমীড় বিদ্রোহ করিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় চিরতরে মাড়োয়ারের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইল।...
>
> ডুমরাজ উভয়-সংকটে পড়িয়াছিলেন— এক দিকে অসম্মানজনক আত্মসমর্পণ, অন্য দিকে প্রভুর নির্দেশের অবমাননা; এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া তিনি হীরক-চূর্ণ উদরস্থ করিলেন। বিশ্বস্ত ভৃত্য কহিলেন, "রাজাকে বলিয়ো— এইভাবেই আমি আমার আনুগত্যের প্রমাণ দিলাম, আমার মৃতদেহ মাড়াইয়া তবেই একজন দক্ষিণী আজমীড়ে প্রবেশ করিতে পারিবে।"[১৮]

Tonga-র যুদ্ধে মাধাজি সিন্ধিয়া ও তাঁর সেনাপতি De Boigne সম্মিলিত রাজপুত শক্তির কাছে পরাজিত হল। তার চার বছর পরে ১৭৯১ সালে Patun ও Mairta -র যুদ্ধে রাজপুতরা সম্পূর্ণ পরাজিত হল মারাঠাদের কাছে। এই পরাজয়ের ফলে আজমীড়ের ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতা লোপ পেল। De Boigne আজমীড় গড় অবরোধ করলে দুর্গরক্ষক ডুমরাজ হীরক-চূর্ণ পান করে উভয়-সংকটের বীরোচিত সমাধান করল। দুর্গাধিপতি বিজয় সিংহ কর্তৃক দুর্গসমর্পণের কথা ইতিহাসে নাই। কবিতার "সিন্দে আসিছে, সঙ্গে তাহার ফিরিঙ্গি সেনাপতি", সুবিখ্যাত মাধাজি সিন্ধিয়া ও তাঁর ফরাসী সেনাপতি De Boigne— দুজনেই অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

রাজবিচার কবিতার আখ্যায়িকাকে ইতিহাসের গৌরব দেওয়া যায় না, কারণ এই ঘটনার সঙ্গে বহু লোকের ভাগ্যের উত্থানপতন জড়িত নয়, এ নিতান্তই একটি ব্যক্তিগত কাহিনী। কিন্তু ভুললে চলবে না যে এমনি-সব বিস্মৃত ব্যক্তিগত কীর্তির সোপানেই একটা জাত ঐতিহাসিক মাহাত্ম্যের শিখরে আরোহণ করে। মানুষ বড়ো হলে তবেই জাত বড়ো হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। সামষ্টিক কীর্তিতে জাত শক্তিমান হতে

---

১৮ James Todd, *Annals of Rajasthan, Annals of Marwar*, Vol. II.

পারে, মহৎ হয় কি না সন্দেহ। রাজবিচার ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কবিতাটির বস্তু বা মূল আখ্যায়িকা এই রকম—

রতন রাও চার পুত্র রাখিয়া (মারা) যান। অন্যতম পুত্র বুঁদির উত্তরাধিকারী গোপীনাথ পিতার মৃত্যুর পূর্বেই মারা যান। যে ভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন তাহা রাজপুত-চরিত্রের আর-এক উজ্জ্বল নিদর্শন এবং তাহা ঐতিহাসিক রোমান্সের বিষয়বস্তু। বুলদীয়া শ্রেণীর এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর সহিত গোপীনাথের অবৈধ সম্পর্ক ছিল ; তিনি গভীর রাতে গুপ্তদ্বার দিয়া সেই গৃহে যাতায়াত করিতেন। অবশেষে একদিন তিনি ব্রাহ্মণ কর্তৃক ধৃত হইলেন ; তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ রতন রাওকে বলিলেন যে, সম্মান-হরণকারী এক চোরকে তিনি ধরিয়াছেন এবং তাহার উপযুক্ত শাস্তি কি ? উত্তর আসিল 'মৃত্যু'।

ব্রাহ্মণ আর অপেক্ষা করিলেন না ; বাড়ি ফিরিয়া এক হাতুড়ির সাহায্যে অপরাধীর মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিলেন এবং মৃতদেহটি প্রকাশ্য রাজপথে ফেলিয়া রাখিলেন। রতন রাও -এর কাছে খবর পৌছিল যে, বুঁদির উত্তরাধিকারী নিহত হইয়াছেন, এবং যখন তাঁহাকে তাঁহার আদেশ-জারির কথা স্মরণ করানো হইল, তখন তিনি নীরব রহিলেন।[১৯]

আখ্যায়িকাটি সামান্য কিছু পরিবর্তিত হয়েছে কবিতায়। "বুলদীয়া শ্রেণীর এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর সহিত গোপীনাথের (রাজপুত্রের) অবৈধ সম্পর্ক ছিল ; তিনি গভীর রাতে গুপ্তদ্বার দিয়া সেই গৃহে যাতায়াত করিতেন।" এতে গোপীনাথের অপরাধের গুরুত্ব না কমলেও দায়িত্ব ভাগ হয়ে যায়, আর তার ফলে পাঠকের খানিকটা সহানুভূতি তার প্রাপ্য হয়। সেই সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত করবার উদ্দেশ্যেই কবি ঘটনাটিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করেছেন। হাতুড়ির আঘাতের মধ্যে যে নিষ্ঠুর বীভৎসতা আছে তাতেও সহানুভূতি জাগ্রত হয় পাঠকের মনে। কাজেই সেটিও বাদ পড়েছে। কবি কোথাও কোনো সহানুভূতির রন্ধ্র না রেখে ঘটনাটিকে একটি নিদারুণ নির্মমতা দিয়েছেন যার ফলে রতন রাও -এর মহত্ব সমধিক ফুটে উঠেছে। আখ্যায়িকায় "তিনি নীরব রহিলেন" কবিতায় "মুক্তি দাও" আদেশে মুখর হয়ে উঠে রাজবিচারের নিরপেক্ষতার জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়েছে।

কথার কবিতাগুলিকে অনেকে ব্যালাড-জাতীয় রচনা মনে করেন, কিন্তু এগুলিকে ব্যালাড বলা যায় কি না সন্দেহ। লিখিতকাব্যের বড়ো বেশি ভদ্র রূপ, মৌখিককাব্য ব্যালাডের একটি অশিক্ষিত-পটুত্ব আছে। বন্য অশ্বের সঙ্গে তুলনীয় এই শ্রেণীর রচনার প্রধান ঐশ্বর্য দুর্বার গতি— ঘটনার গতি, ভাবনার গতি, ছন্দের গতি। ব্যালাডের এই-সব গুণ কিছু পরিমাণে হোরিখেলা কবিতাটিতে আছে, আর সেদিকের বিচারে এটি কথা কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

জেষ্টির (Jaestsi) বংশধরবৃন্দ কয়েক পুরুষ ধরিয়াই দুর্গ এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলি অধিকার করিয়া ভোগ করিতেছিলেন ; পঞ্চম বংশধর ভুনাংশি বুঁদির রাও সুরজমল কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন।

১৯ James Todd, 'Annals of Haravati', *The Annals and Antiquities of Rajasthan,* Vol. II.

জেষ্টির সুরজান নামে এক পুত্র ভীল-প্রদেশের নাম দিয়াছিলেন কোটা; তিনি তাহার চারি দিকে প্রাচীর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ধীরদেও বারোটি দিঘি এবং নগরের পূর্বদিকে বিরাট জলাশয় খনন করান। এখনো তাহা 'কিশোর সাগর' নামে খ্যাত। তাঁহার পুত্র কণ্ডুল কোটা হারাইয়া ফেলেন এবং নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা পুনরুদ্ধার করেন।

ঢাকুর এবং কেশর খাঁ নামে দুই পাঠান কোটা অবরোধ করিয়াছিল। ভূনাগরাজা অতিরিক্ত আফিংসেবন এবং মদ্যপানের ফলে পাগল হইয়া গিয়াছিলেন এবং বুঁদি হইতে নির্বাসিত হন। তাঁহার পত্নী কেতুনে বাস করিতেছিলেন; এই কেতুন নগরের চারিপাশে হারাবংশীদের তিনশত ষাটটি গ্রাম ছিল। নির্বাসনকালীন অবস্থায় ভূনাগরাজা অনুতপ্ত হন; ভুল বুঝিতে পারিয়া পত্নী এবং আত্মীয়বর্গের নিকট ফিরিয়া আসিতে চাহিলেন। বীরাঙ্গনা রানী এই পুনর্জীবনে খুশি হইলেন এবং সংকল্প করিলেন যে, কোটা উদ্ধার করিতেই হইবে; এবং রাজাকে এই কাজের ভার লইবার জন্য বলিলেন। রানী বুঝিলেন যে, যুদ্ধে জয় করিতে চেষ্টার অর্থ ধ্বংস ডাকিয়া আনা; কাজেই তিনি সাহসের সঙ্গে কূটনীতির পথ অবলম্বন করিলেন। যখন আনন্দমুখর বসন্তের আবির্ভাব হইল, কেতুনের সুন্দরী যুবতীদের সহিত হোলিখেলার জন্য তিনি নিজেই কোটার পাঠানদের আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। দুষ্ট মদ্যপ পাঠানেরা গভীর উল্লাসের সহিত সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিল। বিশেষতঃ যখন তাহারা দেখিল যে কেতুনের রানী স্বয়ং তাহাদের প্রতি আসক্তি দেখাইয়াছে তখন তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। বীরশ্রেষ্ঠ তিন শত হারা যুবক সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহাদিগকে নারীর পোষাকে সজ্জিত করাইলেন এবং স্বয়ং ভূনাগ বৃদ্ধা পরিচারিকা পরিবৃত হইয়া, সকলেই আবীর-পূর্ণ পাত্র লইয়া প্রস্তুত রহিলেন। যখন সেই তরুণের দল পাঠানদের দিকে আবীর ছুঁড়িতেছিলেন, বৃদ্ধা পরিচারিকা ভূনাগকে তাহাদের প্রধানের (সেনাপতির) সহিত খেলিবার ইঙ্গিত দিলেন। ছদ্মবেশী হারা (রাজা) কেশর খাঁর মস্তক লক্ষ্য করিয়া পাত্রটি ছুঁড়িয়া মারিলেন। ইহাই ছিল আক্রমণ করিবার ইঙ্গিত। রাজপুতেরা তাহাদের ঘাগড়ার ভিতর হইতে তরবারি বাহির করিয়া কেশর খাঁ এবং তাহার সঙ্গীদের সেইস্থলেই নির্মমভাবে হত্যা করিল; উৎসব-প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে মৃতদেহগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া ছড়াইয়া রহিল।[২০]

উদ্ধৃত আখ্যায়িকার প্রথম অংশ কাহিনীর পশ্চাৎপট, কবিতায় অনাবশ্যক বোধে বাদ পড়েছে। কোটা শহর উদ্ধারের আশায় ভূনাগ-রাজা-রানীর সংকল্প থেকে কবিতার সূত্রপাত, তার পরে সমস্ত কবিতা অকস্মাৎ-নিষ্কাশিত তরবারির চমকে ঝিকিয়ে উঠেছে আর চরম পরিণামে পৌছতেও বিলম্ব হয় নি। আখ্যায়িকার মধ্যেই একটা প্রচণ্ড বেগ ছিল; কবির কৃতিত্ব, সে বেগ কোথাও ব্যাহত হতে দেন নি।

নকল গড় কবিতায় ও আখ্যায়িকায় প্রভেদ নামে মাত্র। আখ্যায়িকায় কুম্ভ একক নয়, তার সঙ্গে

---

২০ 'Annals of Haravati', *The Annals and Antiquities of Rajasthan*, p. 376.

আছে আরও কয়েকজন হারাবংশী রাজপুত। প্রতিজ্ঞারক্ষার এমন হাস্যকর দৃষ্টান্তের অভাব নাই ইতিহাসে, কর্নেল টড নিজেও এই রকম একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।[২১] এ যুগের লোকের চোখে কুম্ভ ও তার সহচরদের নিশ্চিত মৃত্যুপণ কিভাবে প্রতিভাত হবে জানি না, কিন্তু সে যুগে এটাই ছিল রাজপুতদের জাতিচরিত্র। প্রত্যেক সমাজেই দু-দশ জন বীর জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু বীরত্ব যখন বহুব্যাপক আকারে দেখা দেয় তখনই সমাজ বীরের সমাজে পরিণত হয়। সে যুগে রাজপুতনা ছিল এই আযবীরের দেশ।

এইভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের কাছে পরাজিত হইয়া অপমানিত রুষ্ট চিত্তে (মেবারের) রানা চিতোরের অভ্যন্তরে তাঁহার সৈন্যদলকে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে বুঁদি জয় না করা পর্যন্ত জলগ্রহণ করিবেন না। তাহার এই কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু বুঁদি ছিল যাট মাইল দূর এবং তদুপরি তাহা আবার বীর সৈনিক দ্বারা পরিবৃত। প্রধান (সহকারীবৃন্দ) তাঁহার এই অনমনীয় প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু রাজবাক্য নাকি পবিত্র এবং অবশ্যপালনীয়, সুতরাং বুঁদি জয় করিতেই হইবে, অন্যথায়···

এই আসন্ন বিপদে, অতি শিশুসুলভ এক পন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব গৃহীত হইল, যাহাতে রানাকে ক্ষুধার হাত হইতে অব্যাহতি দেওয়া যায়, প্রতিজ্ঞাও রক্ষা হয়। এক নকল বুঁদিগড় তৈয়ারি করিবার কথা উঠিল এবং তাহা জয় করিলেই সমস্যা মিটিয়া যাইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই নকল গড় চিতোরের প্রাচীরের মধ্যে রচিত হইল। একদল হারাবংশী চিতোরের মধ্যে কার্যে নিযুক্ত ছিল ; তাহাদের সর্দার কুম্ভ হরিণশিকার করিয়া ফিরিতেছিল। হঠাৎ তাহাদের এই দুর্গের দিকে দৃষ্টি পড়িল। তাহাদিগকে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলা হইল যে বুঁদির পতন হইলে তবে রানা জলগ্রহণ করিবেন। কুম্ভ তাহার সকল সহচরদের একত্রিত করিয়া ঘোষণা করিল যে, এই নকল বুঁদিগড়কেও রক্ষা করিতে হইবে। তাহারা সকলেই জাতির অসম্মান মর্মে মর্মে অনুভব করিল। প্রত্যেকের হৃদয় অপমানের আগুনে পুড়িতে লাগিল। তাহারা সকলেই অপমানের হাত হইতে নকল বুঁদির মাটির দেওয়াল রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। (এ দিকে) রানাকে জানানো হইয়াছিল যে বুঁদিগড় তৈয়ারি হইয়াছে। তিনি সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন কিন্তু গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে ফাঁকা আওয়াজের পরিবর্তে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাবর্ষণের শব্দ শুনিলেন। খবর আনিতে ছুটিল একজন দূত। দ্বারদেশেই তাহার সহিত কুম্ভের অনুচরের দেখা হইল। এই অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া সেই দ্বাররক্ষী অনুচর তাহাকে জানাইল যে দূত যেন রানাকে গিয়া বলে যে, হারাবংশীর এই নকল রাজধানীকেও তাহারা অসম্মানের হাত হইতে বাঁচাইবে। তাহারা সেই সংকীর্ণ প্রবেশদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আক্রমণকারীদের আমন্ত্রণ জানাইল এবং মাটির বুঁদির (Gar-Ca-Boondi) প্রবেশপথে জাতির সম্মান রক্ষার জন্য একে একে প্রাণ হারাইল।[২২]

---

২১ James Todd, 'Annals of Haravati : Boondi', *The Annals and Antiquities of Rajasthan.*

২২ *Ibid.*

জাতিচরিত্র ও বীরজাতির উল্লেখ করেছি, তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ বিবাহ কবিতার আখ্যায়িকা। বীরত্বের প্রকৃত উদ্ভব অন্তঃপুরে। যে দেশে নারী দুর্বল সে দেশে পুরুষ সবল হতে পারে না। সাহস এমন একটা গুণ যা মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সন্তানের দেহে প্রবেশ করে। বিবাহ কবিতায় নায়ক ও নায়িকার মধ্যে কে বেশি সাহসী? দু জনেই সমান, দু জনেই বীর মাতার স্তন্যে লালিত।

আখ্যায়িকাটি করুণ ও হৃদয়গ্রাহী। মৌলিক ঘটনা ও ভাবের এতটুকু পরিবর্তন করবার প্রয়োজন বোধ করেন নি কবি, কেবল চিতাসনের চারদিক ঘিরে চোখের জলের একটি আলপনা এঁকে সেকালের জয়ধ্বনির সঙ্গে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছেন।

মেত্রীর উত্তরাধিকারীর মৃত্যু এমন একটি মহান বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনা যার তুলনা এডোয়ার্ড এবং ক্রেসীর ইতিহাসে মিলিবে না। তিনি এই রণক্ষেত্রে তাঁহার পিতা এবং ভ্রাতাদের সহিত আত্মরক্তে তাঁহার সামন্ততান্ত্রিক আনুগত্য প্রমাণ করিয়াছিলেন। বহুপূর্বে নিরুক্ষ প্রধানের এক কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ স্থির ছিল। যখন বিবাহ-অনুষ্ঠানে ব্যস্ত তখন মেরতায় বিদ্রোহীদের উপস্থিতির সংবাদ তাঁহার কাছে পৌঁছিল। বিবাহ-বন্ধন এইমাত্র সম্পন্ন হইয়াছে। উভয়ের হস্ত তখনও আবদ্ধ। কিন্তু তিনি ভুলিতে পারেন না যে তিনি মেরতীয়া। তখনই সুন্দরী নিরুকী-কন্যার হস্ত মুক্ত করিয়া তিনি যুদ্ধ-অপ্সরীর আকর্ষণে ছুটিয়া গেলেন। বিবাহ-সজ্জায়, মুকুটাবৃত ভালে তিনি যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে তাঁহার স্বজাতীয়দের পাশে আপন স্থান গ্রহণ করিলেন এবং 'ইন্দ্র-সভায় এক সুর-সুন্দরীকে লাভ করিলেন'।

মারু কবিগণ মেত্রীর তরুণ উত্তরাধিকারীর গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী স্মরণ করিয়া চারণকাব্য লিখিয়াছেন—

কান এ মুটি বুলবুল্লা
গুল্লা সোনি এ মাল্লা
আসি কোশ কুরো হো আয়া
কুনওয়ার মেত্রীবালা।

"কর্ণে মুক্তা এবং কণ্ঠে স্বর্ণালঙ্কার-শোভিত মেত্রীর উত্তরাধিকারী আশি ক্রোশ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন।"

কুমারীকন্যা উদয়পুর হইতে তাঁহার প্রভুর অনুগমন করিতেছিলেন। কিন্তু মেত্রীদেশে সানাই অথবা কোনো উৎসবানুষ্ঠান তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে নাই। তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল ক্রন্দন ও শোকাশ্রু। সংবাদ আসিল মেরতীয়া বংশের সমর্থকদের আর কেহই জীবিত নাই। তিনি চিতাসজ্জার আদেশ দিলেন এবং এই সর্বনাশা দিনে যে বেশে তাঁহার প্রভু শায়িত ছিলেন সেই বেশে সূর্যলোকে তাঁহার অনুগমন করিলেন।[২৩]

---

২৩ James Todd, *The Annals and Antiquities of Rajasthan*, Vol. I.

কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের প্রথম পরিচয়। প্রথমবার বিলাত গমনের প্রাক্কালে আমেদাবাদে শাহিবাগ নামে এক প্রাচীনকালের প্রাসাদে জজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে তিনি কিছুকাল বাস করেন। তখনকার দিনে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র একত্রে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি নামে পরিচিত ছিল। কাজেই রাজনৈতিক পরিচয় যাই হোক আমেদাবাদকে মহারাষ্ট্র না বলাই সংগত। আমেদাবাদে কয়েক মাস কাটাবার পরে কিশোর কবি বোম্বাই শহরে এক শিক্ষিত মহারাষ্ট্র-পরিবারে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। এই সময় থেকেই মহারাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্রপাত ধরা উচিত। তার পরে কবি বিলাত চলে যান, কিন্তু মহারাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্র ছিন্ন হয়ে যায় নি। ১৮৯৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তার আগে পর্যন্ত অনেকবার কবি মহারাষ্ট্রে গিয়েছেন মধ্যম অগ্রজের কাছে— কখনো শোলাপুরে, কখনো পুণায়, কখনো কারোয়ারে। কারোয়ারে লিখিত হয় প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যকাব্য। মহারাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার স্থান এ প্রবন্ধ নয়, তবে এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে, বাংলাদেশকে ছেড়ে দিলে মহারাষ্ট্রই তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। কিন্তু কথা কাব্যে এ পরিচয় খুব স্পষ্ট নয়, কেননা মহারাষ্ট্র-সম্পর্কিত দুটিমাত্র কবিতা এখানে পাওয়া যায়— প্রতিনিধি (১৮৯৭) এবং বিচারক (১৮৯৯)। যদিচ আরও দুটি রচনা কবির গ্রন্থাবলীতে অন্যত্র পাওয়া যাবে— সতী (নাট্যকাব্য, ১৮৯৭) এবং শিবাজী-উৎসব (১৯০৪)। শিখ সম্প্রদায় ও রাজস্থান সম্বন্ধে লিখিত কবিতার সংখ্যা বেশি। মহারাষ্ট্র সম্বন্ধে কবিতা আরও বেশি আশা করাই যখন সংগত তখন এই অপ্রতুলতার কারণ নির্দেশ সহজ নয়। খুব সম্ভব উপযুক্ত বস্তু বা আখ্যায়িকা কবির চোখে পড়ে নি। যাই হোক এখানে আমাদের এই দুটি কবিতা নিয়েই আলোচনা করতে হবে, প্রসঙ্গত এসে পড়বে শিবাজী-উৎসব কবিতা।

প্রতিনিধি, বিচারক ও শিবাজী-উৎসব কবিতা-তিনটির তাৎপর্য বুঝবার উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্রের তৎকালীন রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আবশ্যক। "উনবিংশ শতকের শেষ দশকে ভারতবর্ষময় জাতীয়তা-বোধের যে-নূতন প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, তাহার হোতা ছিলেন বালগঙ্গাধর টিলক।··· টিলক মহারাষ্ট্রীয়দের গণপতি-পূজাকে 'সার্বজনিক' গণদেবতার পূজায় রূপান্তরিত করিয়া মারাঠাদের ধর্মীয় জীবনে সংঘচেতনা আনয়ন করেন। এই গণধর্মবোধের সহিত রাজনৈতিক আত্মচেতনা প্রবুদ্ধ করিবার জন্য শিবাজী-উৎসব প্রবর্তিত হয়।···শিবাজী-উৎসব মারীভয়ের (প্লেগ) জন্যে শিবাজীর জন্মদিনে অনুষ্ঠিত না হইয়া ১৩ই জুন (১৮৯৭) সম্পন্ন হইল।"[২৪]

প্রতিনিধি কবিতাটি ১৮৯৭ সালের ৬ কার্তিক লিখিত, কাজেই ঘটনা ও কবিতার মধ্যে যোগাযোগ-কল্পনা অসংগত নয়। শিবাজী-উৎসব কয়েক বছর পরে লিখিত, তবে তারও মূলে একটি সাময়িক ঘটনা আছে।

"আট বৎসর পূর্বে (১৮৯৭) মহারাষ্ট্র দেশে যে শিবাজী-উৎসব প্রবর্তিত হয়···এতদিন মারাঠিদের

---

২৪ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "ভারতীর সম্পাদক", রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড (১৩৬৭)।

মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এই সময়ে সখারাম গণেশ দেউস্কর ইঁহাকে বাংলাদেশে প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তিনি 'শিবাজীর দীক্ষা' নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন, রবীন্দ্রনাথ উহারই ভূমিকাস্বরূপ 'শিবাজী-উৎসব' নামে কবিতা লিখিয়া দেন। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড ভারতের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা কালে হিন্দুভারতের ধ্যানের বস্তু হইয়া উঠে।"[২৫]

কাজেই দেখা যায় যে দুটি কবিতাই, বিশেষ শেষেরটি, নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেরণায় লিখিত হলেও ঘটনার উপসংহার না হয়ে মুখপাত্র হয়ে ওঠে। এখন সাময়িক উত্তেজনায় লিখিত কবিতাকে কবির সুচিন্তিত অভিমত বলে গ্রহণ উচিত কি না তা বিবেচনার বিষয়। সাময়িক উত্তেজনা কেটে যাওয়ার অনেক পরে শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ (১৯১০) নামে যে প্রবন্ধ কবি লিখেছিলেন তাতে কতক পরিমাণে পূর্বপ্রকাশিত মতকে তিনি সংশোধিত করেছেন। শিবাজীর অখণ্ড ভারতের ধ্যানকে স্বীকার করে নিয়েও, কেন তা সম্ভব হয় নি বলেছেন কবি। কবিতা-দুটির সঙ্গে প্রবন্ধটিকে মিলিয়ে নিলে তবেই শিবাজী ও তাঁর আদর্শ সম্বন্ধে কবির সুচিন্তিত অভিমত পাওয়া সম্ভব মনে হয়।

"শিখ-ইতিহাসের সহিত মারাঠা-ইতিহাসের প্রধান প্রভেদ এই যে, যিনি মারাঠা-ইতিহাসের প্রথম ও প্রধান নায়ক সেই শিবাজী হিন্দুরাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে সুপরিস্ফুট করিয়া লইয়াই ইতিহাসের রঙ্গক্ষেত্রে মারাঠা জাতির অবতারণা করিয়াছিলেন; তিনি দেশজয় শত্রুবিনাশ রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি যাহা-কিছু করিয়াছেন সমস্তই ভারতব্যাপী একটি বৃহৎ সংকল্পের অঙ্গ ছিল।"[২৬]

আবার আছে—

"শিবাজী যে-সকল যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা সোপানপরম্পরার মতো; তাহা রাগারাগি লড়ালড়ি মাত্র নহে। তাহা সমস্ত ভারতবর্ষকে এবং দূর কালকে লক্ষ্য করিয়া একটি বৃহৎ আয়োজন বিস্তার করিতেছিল, তাহার মধ্যে একটি বিপুল আনুপূর্বিকতা ছিল।"[২৬]

এ পর্যন্ত 'শিবাজী-উৎসবে' প্রকাশিত মন্তব্যের সঙ্গে মেলে। তার পরেই সমালোচনা— কেন শিবাজীর স্বপ্ন সফল হল না তার কারণ বিচার। কিছুদিন সময় লেগেছে কবির এই কারণটিতে পৌছতে।

"শিবাজী তাঁহার সমসাময়িক মারাঠা-হিন্দু সমাজে একটা প্রবল ভাবের প্রবর্তন এতটা পর্যন্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অভাবেও কিছুদিন পর্যন্ত তাহার বেগ নিঃশেষিত হয় নাই। কিন্তু শিবাজী সেই ভাবের আধারটিকে পাকা করিয়া তুলিতে পারেন নাই, এমন-কি চেষ্টামাত্র করেন নাই। সমাজের বড়ো বড়ো ছিদ্রগুলির দিকে না তাকাইয়া তাহাকে লইয়া ক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। তখনই পাড়ি না দিলে নয় বলিয়া এবং পাড়ি দিবার আর কোনো উপায় ছিল না বলিয়াই যে অগত্যা এই কাজ করিয়াছেন তাহা নহে। এই ছিদ্রকেই পার করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। শিবাজী যে হিন্দুসমাজকে মোগল-আক্রমণের

২৫ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "বঙ্গবিচ্ছেদ ও স্বদেশীসমাজ", রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৬৮)। শিবাজী-উৎসব কবিতার প্রকাশ: বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩১১ (১৯০৪)।

২৬ "শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ", ইতিহাস।

বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আচারবিচারগত বিভাগবিচ্ছেদ সেই সমাজেরই একেবারে মূলের জিনিস। সেই বিভাগমূলক ধর্মসমাজকেই তিনি সমস্ত ভারতবর্ষে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে বালির বাঁধ বাঁধা, ইহাই অসাধ্যসাধন।

"শিবাজী এমন কোনো ভাবকে আশ্রয় ও প্রচার করেন নাই যাহা হিন্দুসমাজের মূলগত ছিদ্রগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারে। নিজের ধর্ম বাহির হইতে পীড়িত অপমানিত হইতেছে এই ক্ষোভ মনে লইয়া তাহাকে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিজয়ী করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক হইলেও তাহা সফল হইবার নহে; কারণ, ধর্ম যেখানে ভিতর হইতেই পীড়িত হইতেছে, যেখানে তাহার ভিতরেই এমন-সকল বাধা আছে যাহাতে মানুষকে কেবলই বিচ্ছিন্ন ও অপমানিত করিতেছে, সেখানে সেদিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া, এমন-কি সেই ভেদবুদ্ধিকেই মুখ্যত ধর্মবুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিয়া, সেই শতদীর্ণ ধর্মসমাজের স্বারাজ্য এই সুবৃহৎ ভারতবর্ষে স্থাপন করা কোনো মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত নহে; কারণ, তাহা বিধাতার বিধানসংগত হইতে পারে না।"[২৭]

শিবাজীর কল্পনা, "একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি", বাস্তবের কোন্ অভিশাপে অসম্পূর্ণ থেকে গেল, শতধা হয়ে ভেঙে পড়ল, কবি নিজের সেই ধারণা প্রবন্ধটিতে প্রকাশ করেছেন। কবির ধারণা ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করবেন কি না তাঁরাই জানেন। এখানে এই প্রসঙ্গে প্রবেশের কারণ স্বতন্ত্র। কথা কাব্যে ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা প্রকাশ পেয়েছে এবং কালক্রমে তার যে পরিবর্তন ঘটেছে সেই আলোচনা আমাদের একটি উদ্দেশ্য; আর তাকে বস্তুবিচারের অন্তর্গত মনে করলে অন্যায় হবে না। এ বিষয়ে প্রয়োজন হলে আরও আলোচনা করা যাবে।

প্রতিনিধি কবিতাটিতে শিবাজীর চরিত্রগত মহত্ত্বের আশ্চর্য এবং অনেকের কাছে অপ্রত্যাশিত একটি দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। শিবাজী প্রবলপ্রতাপান্বিত মোগল বাদশা আরংজেবের প্রতিদ্বন্দ্বী, রাজ্যস্থাপয়িতা, ও বিরাট সংগঠন-প্রতিভা-শালী— কূটনীতিজ্ঞ ও অসমসাহসিক যোদ্ধা—এ-সকল তথ্য সুবিদিত। কিন্তু তাঁর মধ্যে একটি ধর্মপিপাসু উদাসীন ব্যক্তি ছিল। তুকারাম ও রামদাসের মতো সাধুপুরুষের সঙ্গ তিনি কামনা করতেন, মাঝে মাঝে তাঁদের আশ্রমে গিয়ে বাস করতেন, অনেকবার তাঁদের নিজের কাছে স্থায়ীভাবে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন, আর সদাসর্বদা কেবল তত্ত্বজিজ্ঞাসায় নয় রাজ্যজিজ্ঞাসার ব্যাপারেও তাঁদের উপদেশ ও পরামর্শ প্রার্থনা করতেন। শিবাজী-চরিত্রের এই দিকটি সম্বন্ধে অনবহিত পাঠকের কাছে প্রতিনিধি কবিতার বিষয়টি অবাস্তব মনে হতে পারে, মনে হতে পারে গুরুর যতই গুরুত্ব হোক রাজার পক্ষে তাঁকে রাজ্যদান ও শিষ্যত্ব গ্রহণ একেবারেই অসম্ভব অর্থাৎ কিনা কবিকল্পনা। বিংশ শতকের চোখে অনেক মহত্ত্বই অসম্ভব বা কবিকল্পনা। প্রাচীন ভারতে রাজশিষ্য ও গুরুর মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল মনোরম শিবাজী-চরিত্রে সেই ধারাটি রক্ষিত হয়েছে দেখা যায়।

---

২৭ "শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ", ইতিহাস।

কবিতাটির বস্তু বা আখ্যায়িকা পাঠ করলে দেখা যাবে যে দুয়ে বড়ো ভেদ নেই। বস্তু এমন মহৎ ও মনোরম যে কবি সামান্য চেষ্টাতেই সার্থক একটি কবিতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।[২৮]

বস্তুর অবিকল রূপ যদুনাথ সরকার -প্রণীত শিবাজী গ্রন্থে আছে।[২৯] অন্য একখানি ইংরাজি গ্রন্থে[৩০] অতিরিক্তর মধ্যে আছে "Shivaji insisted that the saint should bestow on him his sandals as Rama had done to his brother Bharata, so that the world might know that Ramdas and not he was the true King."

কাহিনীর এই রূপান্তর রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল কি না জানি না; না পড়লেও গুরুর বা গুরুজনের পাদুকা প্রতিষ্ঠার রীতি ভারতীয় সাহিত্যে ও ইতিহাসে সুবিদিত, কাজেই কবির পক্ষে কল্পনা ক'রে নেওয়া অসম্ভব নয়, যদিচ কবিতায় পাদুকাটি রূপক—

হে রাজা, রেখেছি আনি
তোমারি পাদুকাখানি,
আমি থাকি পাদপীঠতলে।

এবং রামদাসের মুখে তা উচ্চারিত।

বিচারক কবিতার বস্তু বা আখ্যায়িকা নানা রূপান্তরে পাওয়া যায়, আর মূল ঘটনা সম্বন্ধেও বাদানুবাদের অন্ত নাই। মোট কথা এই যে, নারায়ণ রাও পেশোয়া হওয়ার এক বৎসরের মধ্যেই নিহত হন। অনেকে সন্দেহ করেন খুল্লতাত রঘুনাথ রাও -এর হুকুমে কাণ্ডটি ঘটেছে। রাজ্যের প্রধানগণ স্বভাবতই হাঁ এবং

২৮ কথিত আছে যে (একদা) শিবাজী সিতারা দুর্গ হইতে নীচে দেখিলেন রামদাস নগরে ভিক্ষা করিতেছেন। তিনি তাঁহার মুখ্য করণিক (Chitnis— head writer) বালাজী আবাজীর (Balaji Abaji) নিকট গিয়া একটি আদেশ লিপিবদ্ধ করাইলেন এবং তাহা রাজকীয় শীলমোহর দ্বারা অঙ্কিত করিবার পর, রামদাস যখন প্রাসাদে আসিলেন তখন তাহা তাঁহার ভিক্ষাঝুলিতে অর্পণ করিলেন। রামদাস সেই লিপিটি খুলিয়া পড়িলেন; দেখিলেন— শিবাজী তাঁহাকে সমস্ত রাজাই দান করিয়াছেন। রামদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার পর রাজা কি করিবেন। এই প্রশ্নের উত্তরে শিবাজী বলিলেন যে, তিনি তাঁহার গুরুর সেবায় বাকি জীবন অতিবাহিত করিতে চান। রামদাস উত্তর দিলেন, "বেশ তাই হোক! এখন আমাকে অনুসরণ কর।" বলিয়া সেই ভিক্ষাঝুলিটি শিবাজীর কাঁধে চড়াইয়া তাঁহাকে ভিক্ষা করিবার আদেশ দিলেন। তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া প্রচুর শস্য পাইলেন; (অবশেষে) একটি নদীর তীরে তাঁহারা উভয়েই গেলেন। রামদাস স্বহস্তে দুইটি রুটি প্রস্তুত করিলেন, একটি নিজে খাইলেন, অপরটি খাইলেন শিবাজী। রামদাস তখন জানিতে চাহিলেন যে তাঁহার (শিবাজীর) এই নূতন জীবন কেমন লাগিতেছে। শিবাজী জানাইলেন যে তিনি সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত। রামদাস যখন পুনরায় জানিতে চাহিলেন যে শিবাজী তাঁহার আদেশ পালন করিবেন কি না; শিবাজী এবারও সম্মতিসূচক উত্তর দিলেন। তখন রামদাস বলিলেন, "তুমি প্রাসাদে ফিরিয়া যাও এবং আমার প্রতিনিধিরূপে রাজত্ব কর।" শিবাজী সেই আদেশ পালন করিলেন এবং সেইদিন হইতে সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক হিসাবে গৈরিক পতাকা বহন করিতে লাগিলেন।

২৯ যদুনাথ সরকার, "শিবাজীর রাজ্য এবং শাসনপ্রণালী", শিবাজী।

৩০ *A History of the Maratha People,* Chapter VII.

না দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। চীফ জাস্টিস বা ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী হাঁ-এর দলে। তিনি রায় দিলেন যে রঘুনাথ রাও-এর হুকুমে নারায়ণ রাও নিহত হয়েছেন। তিনি আরও বললেন যে, যতদিন রঘুনাথ রাও শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ততদিন তিনি সরকারী চাকুরি করবেন না, এমন-কি পুণা শহরেও অবস্থান করবেন না। নিজের ঘোষণা অনুসারে পুণা ও সরকারী চাকুরি পরিত্যাগ ক'রে "গ্রামের কুটীরে চলি গেলা ফিরে দীন দরিদ্র বিপ্র।"

কবিতায় ও আখ্যায়িকায় এখানে অনেক প্রভেদ। রঘুনাথ রাও এবং রামশাস্ত্রীর চরিত্র অবশ্যই যথাযথ অঙ্কিত, কিন্তু আখ্যায়িকায় নাটক নাই; কবির কৃতিত্ব রঘুনাথ রাও এবং রামশাস্ত্রীকে সংকটের মুখে এনে নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে। রঘুনাথ রাও রাজ্যের শত্রুর বিরুদ্ধে (নিজাম্-উল্-মুল্ক) যুদ্ধে চলেছেন, অপকীর্তি ঢাকা দেবার উদ্দেশ্যে চিরকাল শাসকগণ এই পন্থাটি অবলম্বন ক'রে থাকেন, এমন সময়ে পথরোধ ক'রে এসে দাঁড়ালেন ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী—

'রঘুনাথ রাও,
নগর ছাড়িয়া কোথা চলে যাও
না লয়ে পাপের শাস্তি।'

রঘুনাথ রাও -এর ডিক্‌টেটরী চালটা ভালোই জানা ছিল—

'নৃপতি কাহারো বাঁধন না মানে,
চলেছি দীপ্ত মুক্ত কৃপাণে,
শুনিতে আসি নি পথমাঝখানে
ন্যায়বিধানের ভাষ্য।'

তখন

কহিলা শাস্ত্রী, 'রঘুনাথ রাও,
যাও করো গিয়ে যুদ্ধ।
আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার,
ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার,
বিচারশালার খেলাঘরে আর
না রহিব অবরুদ্ধ।'

সামান্য একটা অপ্রমাণিত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে কিনা রাষ্ট্রশত্রু-দলনের পথে বাধা সৃষ্টি! এ যুগের নজিরের বলে মনে হয় মারাঠার অধিকাংশ লোক ছিল রঘুনাথ রাও -এর পক্ষে। হায় ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রীর দল! তবে সে যুগে গ্রামে ফিরে গিয়ে রামশাস্ত্রীর পক্ষে আত্মরক্ষা সম্ভব হয়েছিল, এ যুগে হলে শেষ পর্যন্ত কতদূর কি হত কে জানে।

এই নাটকীয় চমৎকারিত্বটুকুই কবিতাটির প্রাণ এবং এ কৃতিত্ব আখ্যায়িকায় নেই; এ হচ্ছে কবির সৃষ্টি। পূর্ণ কাহিনীটি এরূপ:

পেশোয়া নারায়ণ রাও -এর মৃত্যু

[পেশোয়া বালাজী বাজীরাও -এর ছিল তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ বিশ্বাস রাও পানিপথে নিহত হইয়াছিলেন। মধ্যম মাধুরাও পিতার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষয়রোগে প্রাণত্যাগ করেন (vide Ballad No. iv on the Suttee of Ramabye)। অতঃপর কনিষ্ঠ নারায়ণ রাও পেশোয়া হন এবং সেই বৎসরই নিহত হন। এরূপ সন্দেহ প্রচলিত আছে যে, নারায়ণ রাও -এর খুল্লতাত রঘুনাথ রাও এই হত্যাপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, যদিও এ সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।]

মাধব রাও -এর সিংহাসন-ত্যাগের পূর্বে,
তাঁর জীবনসূত্র যখন ছিন্ন হয় নাই,
কী রাজমহিমা ক্ষরিত হ'ত তাঁর দৃষ্টি থেকে !
গগনচুম্বী ছিল তার শক্তি !
কত ভক্তি-উপহার এনেছিল দিল্লীর মর্মর মিনার,
কিন্তু সবই ব্যর্থ হল।
সময় হ'ল এবং তাঁর জীবনসূত্র ছিন্ন হল।
তাঁর সর্ব ক্ষমতা বর্তিল দাদার 'পরে।
মৃত্যুশয্যায় শুয়ে (তিনি বলেছিলেন),
"নারায়ণ রাও, আমার এ আদেশ মেনে চলো,
যাকে আমি দিয়ে যাচ্ছি অভিভাবক রূপে,
রাজকীয় সদয় দৃষ্টিতে সর্বদা দেখবে তাকে,
তার হৃদয় যেন তোমার হয়।
আর দাদা, এখনকার মতো পরেও সর্বদা
অনুগত হস্তে আপনি তাকে রক্ষা করবেন,
স্নেহ-দৃষ্টিতে সর্বদা তাকে দেখবেন।"
এই বলে জীবন-দীপ তাঁর নির্বাপিত হল।
যে আলো দক্ষিণাপথে দেদীপ্যমান ছিল,
রক্তপাতে তা নির্বাপিত হ'ল।
যে উজ্জ্বল রত্ন আমরা নিরীক্ষণ করতাম,
চিরতরে তা হারিয়ে গেল।
হে আমাদের নিহত প্রভু, ছল-হৃদয় সে,
যার বিশ্বাসঘাতক তরবারি তোমাকে আঘাত করেছে।

শেষকৃত্য সব যখন শেষ হল,
যুবরাজ ও অভিভাবক, উভয়েই চাইল
সে সিংহাসন, যে সিংহাসন
এক লুপ্তগৌরব জাতির অধীশ্বর
সাতারার উচ্চ দুর্গে শূন্য আড়ম্বরে
পূর্ণ করেছিল। রাজা নব পেশোয়াকে
শীলমোহর ও পোষাক দান করলেন।
পেশোয়া চললেন বাড়ির পথে। উচ্চস্বরে
জয়ঢাক বাজল। নাসিকের পবিত্র তরঙ্গে
পেশোয়া তাঁর অন্তর ধৌত করতে গেলেন।
সেখান হতে যখন পুণার প্রাসাদে ফিরলেন
তখন তাঁর হৃদয় ঈর্ষান্বিত আশঙ্কায় জর্জরিত।
'দাদা'র উপর তিনি সতর্ক দৃষ্টি
রাখলেন। আর গুপ্তচর-দল অনবরত
মিথ্যার জাল বুনে চলল।

যখন রাও পলাইয়া যাইতেছিলেন তখন রক্ষী সমরসিং সৈন্যসামন্তসহ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। সকল পথচারী জনতা তাহাদের পলায়নপর প্রভু ও পেশোয়ার বিশ্বাসঘাতক পশ্চাদ্ধাবনকারীদের মহানন্দে আলিঙ্গন করিল। রাও যখন কৃতাঞ্জলিপুটে 'দাদা'কে মিনতি করিয়া বলিলেন, "অতীত ভুলে যান, আমাকে রক্ষা করুন, আমার প্রাণ ভিক্ষা দিন," তখন তাঁহার মাথা 'দাদা'র বুকের কাছে অবনত হইয়া আসিয়াছিল। 'দাদা' প্রকৃতির বন্ধনের জোর উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহার অভয় হস্ত প্রসারিত করিলেন। তাঁহার নিষ্ঠুর আদেশ শিথিল করিয়া বলিলেন, "উহাকে প্রাণে মারিয়ো না।" "যে আলো দক্ষিণাপথে দেদীপ্যমান ছিল, রক্তপাতে তা নির্বাপিত হ'ল। যে উজ্জ্বল রত্ন আমরা নিরীক্ষণ করতাম, চিরতরে তা হারিয়ে গেল। হে আমাদের নিহত প্রভু! ছল-হৃদয় সে, যার বিশ্বাসঘাতক তরবারি তোমাকে আঘাত করেছে।"

পুঞ্জীভূত কাষ্ঠে অগ্নি সংযুক্ত হইল। নারায়ণ রাও-এর জীবনদীপ নির্বাপিত হইল। নারী-মোহান্ধ নির্বোধ 'দাদা' রাজ্যেশ্বর হইল। বিশ্বাসঘাতকতা ও ছলনা বহুদূর প্রবাহিত হইয়া চলিল। অভিষেক-সজ্জা ও অনুমোদন আনিবার জন্য অমৃত দূত হইয়া রাজার নিকট চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে গেলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও ঋষি। তাঁহারা 'দাদা'র অধিকারের ন্যায্যতা প্রচার করিলেন এবং সমস্ত বিরুদ্ধ অভিযোগ শুদ্ধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেবাদিদেব 'দাদা'কে আশীর্বাদ করিয়া ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শিবপ্রসাদে ন্যায়ের রাজত্ব শুরু হইয়াছে এবং সকল মানুষ এক প্রবিত্র বিস্ময়ানুভূতিতে অভিভূত হইয়াছে। তাঁহার ক্ষমতার জয়পতাকা চিরকাল উড্ডীন থাকিবে।" এই পর্যন্ত কবি মুকুন্দ রাজাদের মহিমা ও পাপ কীর্তন করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন যেন প্রলয়কাল পর্যন্ত 'দাদা'র রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। "যে আলো দক্ষিণা-

পথে দেদীপ্যমান ছিল, রক্তপাতে তা নির্বাপিত হ'ল। যে উজ্জ্বল রত্ন আমরা নিরীক্ষণ করতাম, চিরতরে তা হারিয়ে গেল। হে আমাদের নিহত প্রভু, ছল-হৃদয় সে, যার বিশ্বাসঘাতক তরবারি তোমাকে আঘাত করেছে।"

দাদাসাহেব রঘুনাথ রাও -এর অপর নাম। ইনি রঘোবা নামেও পরিচিত। তিনি নিহত পেশোয়া ও তাঁহার উত্তরাধিকারীর খুল্লতাত। মাধব এবং পরে নারায়ণ রাও তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি দুর্বল, হীন এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার স্ত্রী আনন্দীবাঈ-এর প্রভাবাধীন ছিলেন। আনন্দীবাঈ ছিলেন নির্লজ্জ এবং ভীষণ প্রকৃতির। তাঁহার এবং মাধব ও নারায়ণ রাও -এর মাতা গোপিকা বাঈ -এর মধ্যে ছিল প্রচণ্ড শত্রুতা।

কবিতা-দুটির একটির কাহিনী মহারাষ্ট্র-রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতার জীবনী থেকে গৃহীত, অপরটি গৃহীত অনেক পরবর্তী কালের একজন পেশোয়ার জীবনী থেকে। বিষয়-নির্বাচন আকস্মিক বলে মনে হয় না, এর মধ্যে একটি নীতি বর্তমান মনে করবার কারণ আছে। যে-সব গুণের সদ্‌ভাবে রাজ্যপ্রতিষ্ঠারূপ বৃহৎ ও মহৎ কার্য সম্ভব তার দৃষ্টান্ত শিবাজী-চরিত্র— যোদ্ধা ও কূটনীতিজ্ঞ শিবাজীর মধ্যে যে ধর্মপিপাসু উদাসীন ব্যক্তি বিরাজমান সেই চরিত্রটি। আর যে-সব গুণের অভাবে গড়া রাজ্য ভেঙে পড়ে তারই উদাহরণ রঘুনাথ রাও, যিনি ন্যায় ও ধর্মকে পদদলিত করতে দ্বিধা বোধ করেন না।

"শিবাজীর মনে যাহা বিশুদ্ধ ছিল, পেশওয়াদের মধ্যে তাহা ক্রমে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা-রূপে কলুষিত হইয়া উঠিল।"[৩১]

এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র শিখসম্প্রদায় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন তা বোধ করি পেশোয়াদের আচরণ সম্বন্ধেও অপ্রযোজ্য নয়। "তাহারা ত্যাগ শিখিল না, আত্মসমর্পণ শিখিল না, 'যতোধর্মস্ততোজয়ঃ' এ মন্ত্র ভুলিয়া গেল।"[৩১] শিবাজী গুরুকে রাজ্য ও রাজধানী দান করে ভিক্ষাঝুলি গ্রহণ করলেন, রঘুনাথ রাও লঙ্ঘন করলেন ন্যায়াধীশের অনুশাসন, দুটিই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একটির তাৎপর্য প্রতিষ্ঠায়, অপরটির ধ্বংসে। বিষয়-নির্বাচনের মধ্যে খুব সম্ভব এই ইঙ্গিতটি আছে।

শিখগুরু ও শিখ-ইতিহাস সম্বন্ধে কথা কাব্যে চারটি ও কাহিনী কাব্যে একটি মোট পাঁচটি কবিতা আছে। তন্মধ্যে তিনটি গুরুগোবিন্দ সম্বন্ধে, অন্য দুটির প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র। কবিতাগুলি রচনার সময় বিশেষ-ভাবে প্রণিধানযোগ্য, কেননা ঐ কালভেদে কবির মতভেদ সূচিত হচ্ছে। এই মতভেদ আরও প্রকট হয়ে উঠবে যদি সমকালে ও পরবর্তীকালে কবির লিখিত প্রবন্ধের সঙ্গে মিলিয়ে গুরুগোবিন্দ, নিষ্ফল উপহার, ও শেষ শিক্ষা কবিতা-তিনটি পড়ি। প্রথম কবিতা-দুটির সঙ্গে পরবর্তীকালে পোষিত মতের পার্থক্য বেশি,

৩১ "শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ", ইতিহাস।

যদিচ শেষ শিক্ষা কবিতাটির প্রযোজ্যতাও কম নয়। বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশের আগে কবিতা ও প্রবন্ধগুলির নাম ও রচনাকাল পাশাপাশি সাজিয়ে দিলে বুঝবার সুবিধা হবে।

কবিতা	প্রবন্ধ	প্রবন্ধ
গুরুগোবিন্দ, ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ : ১৮৮৮	বীরগুরু, শ্রাবণ ১২৯২ : ১৮৮৫	শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ, চৈত্র ১৩১৬ : ১৯১০ —ইতিহাস
নিষ্ফল উপহার, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ : ১৮৮৮	শিখ-স্বাধীনতা, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২ : ১৮৮৫ —ইতিহাস	
শেষ শিক্ষা, ৬ কার্তিক ১৩০৬ : ১৮৯৯	৮৪-সংখ্যক পত্র, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ —ছিন্নপত্রাবলী	

কালানুক্রমিক ভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে বীরগুরু ও শিখ-স্বাধীনতা প্রবন্ধ-ছুটি রচনার আড়াই বৎসর পরে গুরুগোবিন্দ ও নিষ্ফল উপহার কবিতা-ছুটি লিখিত, প্রবন্ধের বক্তব্যে ও কবিতার মন্তব্যে অমিল নাই। তারপরে ছিন্নপত্রাবলীর পত্রখানি। তখনো পত্রে, প্রবন্ধে ও কবিতায় মতের ঐক্য। শেষ শিক্ষা কবিতাটি রচনার কাল ১৮৯৯ সাল (ঐ সময়েই, মাত্র কয়েক দিন আগে, প্রার্থনাতীত দান ও বন্দী বীর কবিতা-ছুটি লিখিত), তখন পর্যন্ত কবির মতের পরিবর্তন ঘটে নি। তারপরে অনেক কয় বৎসরের ব্যবধানে ১৯১০ সালে পাই শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ; এই প্রবন্ধের বক্তব্য পূর্বমতের পরিপোষক নয়, বস্তুতঃ দুয়ে দুস্তর পার্থক্য। অবশ্য গুরুগোবিন্দ সিংহের ব্যক্তিগত বীরত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে কবির মতের পরিবর্তন হয় নি, হয়েছিল অন্য বিষয়ে; আর সেটি ব্যক্তিগত বীরত্ব ও মহত্ত্বের চেয়ে অনেক গভীর ও গুরুতর। যথাস্থানে তার আলোচনা হবে। এখানে উল্লেখ করা সংগত যে ১৯১০ সালের কিছু আগে থেকে, এ-সব বিষয়ে সঠিক দিনকাল নির্ণয় সম্ভব নয়, কবির সুচিরপোষিত অনেক মতে পরিবর্তন শুরু হয়ে গিয়েছিল। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে যুগধর্মের প্রভাবে বা অন্য কোনো অজ্ঞাত কারণে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল বর্ণাশ্রমধর্ম ও হিন্দু স্বারাজ্যের সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। পরাধীন জাতির মন কখনো সুস্থ হয় না। এই অস্বাস্থ্য জাতির সমস্ত কর্মে প্রকাশ পায়, সাহিত্যেও। সব বিষয়ে ঝোঁক দিয়ে কথা বলবার নেশা তার পক্ষে স্বাভাবিক— ভালোকে অত্যন্ত ভালো, মন্দকে অত্যন্ত মন্দ বলতে পারলে তার জাতিচিত্ত যেন তৃপ্তি পায়। এই মনোভাবের উজ্জ্বলতম প্রকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে কৃষ্ণচরিত্রে আর রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের নায়ক গৌরমোহনের চরিত্রে। প্রতিভাবানের হাতে গড়া বলেই কৃষ্ণচরিত্র ও গোরা সত্য হয়ে উঠেছে, প্রতিভাহীনের হাতে পড়লে যা হয় তার দৃষ্টান্ত শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা আর চন্দ্রনাথ বসুর অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকে সাংখ্যতত্ত্বের আবিষ্কার-প্রচেষ্টা। এই সময়টায় রবীন্দ্রনাথ যুগধর্মে অত্যন্ত বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন, আর সেইজন্যেই তাঁর এই সময়কার রচনায় যেমন সহজে পাঠকের মনোহরণ করতে সমর্থ হয়েছিল এমন আর কোনো সময়ের রচনায় নয়। কথা ও কাহিনী, কাহিনীর কাব্যনাট্য, প্রথম আমলের ছোটো গল্প, চোখের বালি ও নৌকাডুবি এই সময়ের রচনা।

গোরায় এসে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে নদী মোড় ঘুরেছে, পাঠকের মনেও খটকা বাধতে শুরু করেছে। কবিচিত্তের এই সামগ্রিক পরিবর্তনের ফলেই রবীন্দ্রনাথ গুরুগোবিন্দ সিংহের রাজনৈতিক কীর্তিকে নূতন দিগন্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত করে দেখতে সক্ষম হলেন আর বুঝতে পারলেন—

"শিখদের যিনি শেষ গুরু ছিলেন··· সর্বমানবের মধ্যে ধর্মপ্রচার-কার্যকে সংহৃত করিয়া লইয়া শিখদিগকে বলিষ্ঠ করিয়া তোলাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এ কাজ প্রকৃতপক্ষে ধর্মপ্রচারকের নহে; ইহা প্রধানত সেনানায়ক এবং রাজনীতিজ্ঞের কাজ। গুরুগোবিন্দের মধ্যে সেই গুণ ছিল। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ে দল বাঁধিয়া তুলিয়া বৈরনির্যাতনের উপযুক্ত যোদ্ধা ছিলেন। তিনিই ধর্মসম্প্রদায়কে বৃহৎ সৈন্যদলে পরিণত করিলেন এবং ধর্মপ্রচারক গুরুর আসনকে শূন্য করিয়া দিলেন। গুরু নানক যে মুক্তির উপলব্ধিকে সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া জানিয়াছিলেন, গুরুগোবিন্দ তাহার প্রতি লক্ষ স্থির রাখিতে পারেন নাই। শত্রুহস্ত হইতে মুক্তিকামনাকেই তিনি তাঁহার শিষ্যদের মনে একান্তভাবে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। ইহাতে ক্ষণকালের জন্য ইতিহাসে শিখদের পরাক্রম উজ্জ্বল হইয়াছিল সন্দেহ নাই, ইহাতে তাহাদিগকে রণনৈপুণ্য দান করিয়াছে তাহাও সত্য, কিন্তু বাবা নানক যে পাথেয় দিয়া তাহাদিগকে একটি উদার পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই পাথেয় তাহারা এইখানেই খরচ করিয়া ফেলিল এবং তাহাদের যাত্রাও তাহারা এইখানেই অবসান করিয়া দিল।"[৩২]

গুরুগোবিন্দ সিংহ সম্বন্ধে কবির এই ধারণা সকলে সমর্থন করবেন কি না সন্দেহ তবে অন্ততঃ আচার্য যদুনাথ সরকার এই ধারণার সমর্থক, নতুবা 'আরংজীবের ইতিহাস' গ্রন্থে আলোচ্য প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধার করে দিতেন না।[৩৩]

এবারে গোড়ার কথায় ফিরে আসা যাক। বাল্যকাল থেকেই শিখ ও পাঞ্জাবিদের সম্বন্ধে কবির মনে কৌতূহল ছিল আর তার কারণও ছিল।

"একবার লেনু বলিয়া অল্পবয়স্ক একটি পাঞ্জাবি চাকর তাঁহার (মহর্ষির) সঙ্গে আসিয়াছিল। সে আমাদের কাছে যে সমাদরটা পাইয়াছিল তাহা স্বয়ং রণজিতসিংহের পক্ষেও কম হইত না। সে একে বিদেশী তাহাতে পাঞ্জাবি— ইহাতেই আমাদের মন হরণ করিয়া লইয়াছিল। পুরাণে ভীমার্জুনের প্রতি যে-রকম শ্রদ্ধা ছিল, এই পাঞ্জাবি জাতের প্রতিও মনে সেই প্রকারের একটা সম্ভ্রম ছিল। ইহারা যোদ্ধা— ইহারা কোনো কোনো লড়াইয়ে হারিয়াছে বটে, কিন্তু সেটাকেও ইহাদের শত্রুপক্ষেরই অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। সেই জাতের লেনুকে ঘরের মধ্যে পাইয়া মনে খুব একটা স্ফীতি অনুভব করিয়াছিলাম।"[৩৪]

---

৩২ "শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ", ইতিহাস।

৩৩ J. N. Sarkar, *The History of Aurangzib*, Vol. III, 3rd Ed., Ch. XXXV.
৩০৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আছে—Rabindranath Tagore, as translated by me in *The Modern Review*, April 1911, pp. 334-38.

৩৪ "পিতৃদেব", জীবনস্মৃতি।

এ গেল একেবারে অল্প বয়সের কথা। তার পরে যখন কবি বছর-বারো বয়সে পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়-যাত্রার পথে অমৃতসরে পৌঁছলেন তখনকার স্মৃতি লেন্থুর স্মৃতিকে গভীরতর রেখায় অঙ্কিত করল।

"অমৃতসরে গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। অনেকদিন সকালবেলায় পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে শিখ-মন্দিরে গিয়াছি। সেখানে নিয়তই ভজনা চলিতেছে। আমার পিতা সেই শিখ-উপাসকদের মাঝখানে বসিয়া সহসা এক সময়ে সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন; বিদেশীর মুখে তাহাদের এই বন্দনাগান শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সমাদর করিত। ফিরিবার সময় মিছরির খণ্ড ও হালুয়া লইয়া আসিতেন।"[৩৫]

বাল্যকালের এই মোহময় 'স্বপ্ন' কিছু পরবর্তীকালে রচনায় রূপ লাভ করল বালক নামে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে।[৩৬] আরও পরবর্তীকালে দুটি শিখ ভজন গানের বাংলা রূপান্তর তিনি করেন।[৩৭] মনের যখন এই চরম অবস্থা তখন গুরুগোবিন্দ সিংহ সম্বন্ধে গুরুগোবিন্দ ও নিষ্ফল উপহার কবিতা-দুটি রচিত। গুরু নানককে বাদ দিলে গুরুগোবিন্দ সিংহ শিখ-গুরুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই শিখ উপাসক সম্প্রদায়কে ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়ে পরিণত করেন, পরাধীন দেশের কবির পক্ষে তাঁর প্রতি মোহের আকর্ষণ স্বাভাবিক। মোহগ্রস্ত মন যে চিত্র অঙ্কিত করল বাস্তবের সঙ্গে তার কতখানি মিল তা তখন ধরা পড়ল না। ধরা পড়েছে বাইশ বছর পরে লিখিত শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ প্রবন্ধে।

গুরুগোবিন্দ কবিতার বস্তু বা আখ্যায়িকা কোথায় পেলেন কবি? কবিতাটিতে আখ্যায়িকা বলে কিছু নেই, আছে গুরুগোবিন্দের আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস ও ভবিষ্যতের কল্পনা। আখ্যায়িকা না থাক, একটা আবহাওয়া আছে। নীচে দুটি অংশ উদ্ধৃত হল, একটি কানিংহামের শিখ-ইতিহাস থেকে, অপরটি রবীন্দ্রনাথের বীরগুরু প্রবন্ধ থেকে। বীরগুরু প্রবন্ধের বস্তু খুব সম্ভব তিনি কানিংহামের বই থেকেই পেয়েছেন।

১. যখন তেগ বাহাদুর মারা যান তখন তাঁহার পুত্রের বয়স ছিল মাত্র পনেরো বছর। শহীদ গুরুর জীবনাবসানের শোচনীয় স্মৃতি গোবিন্দের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, তাঁহার নিজের ক্ষতি এবং দেশের অধঃপতনের কথা চিন্তা করিয়া তিনি মুসলমানদের ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠেন। হিন্দুদের অতীত মহিমা ফিরাইয়া আনিবার জন্য জনসাধারণকে সেইভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন।···

---

৩৫ "হিমালয়যাত্রা", জীবনস্মৃতি।

৩৬ "কাজের লোক কে", বালক, বৈশাখ ১২৯২ : ১৮৮৫।

"বীরগুরু", বালক, শ্রাবণ ১২৯২।

"শিখ স্বাধীনতা", বালক, আশ্বিন ও কার্তিক ১২৯২।

৩৭ ক. গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে।

খ. এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর।

—গীতবিতান

(গোবিন্দ জাতিকে ডাক দিয়া বলেন)— তোমাদের একই আদর্শ এবং লক্ষ্য হইবে; একই নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিবে। নানকের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইবে এবং তাঁহার অনুবর্তী উত্তরাধিকারীদের সম্মান প্রদর্শন করিবে। তোমাদের সম্বোধন হইবে—'জয় গুরুজীর জয়!'[৩৮]

২. গুরুগোবিন্দের শিষ্যেরা তাঁহার চারিদিকে জড়ো হইতে লাগিল। সমস্ত শিখজাতিকে একত্রে আহ্বান করিবার জন্য তিনি চারিদিকে তাঁহার শিষ্যদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে সমস্ত পাঞ্জাব হইতে বিস্তর লোক আসিয়া তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, দেব-দৈত্য সকলেই নিজের উপাসনা প্রচলিত করিতে চায়; গোরখনাথ রামানন্দ প্রভৃতি ধর্মমতের প্রবর্তকেরা নিজের নিজের এক-একটা পন্থা বাহির করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবার সময়ে মহম্মদ নিজের নাম উচ্চারণ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি, গোবিন্দ, ধর্মপ্রচার, পুণ্যের জয়-বিস্তার ও পাপের বিনাশ-সাধনের জন্য আসিয়াছেন। অন্যান্য মানুষও যেমন, তিনিও তেমনি একজন; তিনি পিতা পরমেশ্বরের দাস; এই পরমাশ্চর্য জগতের একজন দর্শক মাত্র; তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া যে পূজা করিবে নরকে তাহার গতি হইবে। কোরান-পুরাণ পাঠ করিয়া, প্রতিমা বা মৃত ব্যক্তির পূজা করিয়া, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রে বা কোনো প্রকার পূজার কৌশলে ঈশ্বর মিলে না। বিনয়ে ও ভক্তিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

তিনি বলিলেন, আজ হইতে সমস্ত লোক এক হইয়া গেল। উচ্চনীচের প্রভেদ রহিল না। জাতিভেদ উঠিয়া গেল। সকলে অত্যাচারী তুর্ক জাতির বিনাশের ব্রত গ্রহণ করিলাম।[৩৯]

এই প্রসঙ্গে যদুনাথ সরকার -রচিত আরংজেবের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে কিয়দংশ উদ্ধারের লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

Govind steadily drilled his followers, gave them a distinctive dress and a new oath of baptism, and began a policy of open hostility to Islam. He harangued the Hindus to rise against Muslim persecution, and imposed a fine of Rs. 125 on his followers for saluting any Muhammadan saint's tomb. His aims were frankly martial . . . clearly, Nanak's ideal of the kingdom of heaven to be won by holy living and holy dying, by humility and prayer, self-restraint and meditation, had been entirely abandoned. . . . In the hills of North Punjab, Govind passed most of his life, constantly fighting with the hill Rajahs from Jammu to Srinagar in Garhwal, who were disgusted with his

---

৩৮ J. P. Cunningham, *The History of the Sikhs*, Ch. III.

৩৯ "বীর গুরু", ইতিহাস।

followers' violence and scared by his ambition, or with Mughal officers and independent local Muslim chiefs who raided the hills in quest of tribute and plunder. [৪০]

তিনটি উদ্‌ধৃত অংশ মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতে মিল আছে, কবি ভিন্ন মত পোষণ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে গুরুগোবিন্দ রাজনীতিক, যিনি নানা উপায়ে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে চেষ্টা করছেন, এ বিষয়ে সমকালীন আর দশজন রাজনীতিকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পার্থক্য নেই। কবির মতে গুরুগোবিন্দ কবিতায় অঙ্কিত গুরু সাধক, যিনি আদর্শ শাসক হয়ে উঠতে চেষ্টা করছেন। বস্তুবিচারে ঐতিহাসিকদের মতকেই মানতে হয়, রবীন্দ্রনাথও মেনেছেন কবিতাটি লিখবার বাইশ বছর পরে লিখিত প্রবন্ধে।

"গুরুগোবিন্দ শিখদের এই ধর্মবোধের ঐক্যানুভূতিকে কর্মসাধনার সুযোগে পরিণত করিয়া তুলিলেন। তিনি একটি বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধর্মসমাজের ঐক্যকে রাষ্ট্রীয় উন্নতি-লাভের উপায়রূপে খর্ব করিলেন।… কিন্তু গুরুগোবিন্দ কি করিলেন? ঐক্যকেই পাকা করিলেন, অথচ যে মহাভাবের শক্তির সহায়তায় তাহা করা সম্ভব হইল তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, অন্তত তাহার সিংহাসনে আর-একজন প্রবল শরিক বসাইয়া দিলেন।… গুরুগোবিন্দ সাময়িক ক্রোধের উত্তেজনায় ও প্রয়োজনবোধে বাহনকে প্রবল করিয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু আরোহীকে খর্ব করিয়া দিলেন।… এইজন্য বহু শতাব্দী ধরিয়া যে শিখ পরম গৌরবে মানুষ হইবার দিকে চলিয়াছিল তাহারা হঠাৎ এক সময়ে থামিয়া সৈন্য হইয়া উঠিল— এবং ঐখানেই তাহাদের ইতিহাস শেষ হইয়া গেল।"[৪১]

এ তো বাইশ বছর পরের কথা। বাইশ বছর আগে কি ছবি এঁকেছেন তিনি?

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
'পেয়েছি আমার শেষ!
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।

---

৪০ 'Guru Govind, His Ideal and Career', *The History of Aurangzib*, Vol. III, 3rd Ed., Ch. XXXV.

৪১ "শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ", ইতিহাস।

সত্যই কি শিখদের ইতিহাস শেষ হয়ে গেল? রণজিৎ সিংহ ও গুরুগোবিন্দ সিংহের আবির্ভাব না হলেই কি শিখ ইতিহাস শেষ হয়ে যেত না? এ বিষয়ে যদুনাথ সরকারের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—*The History of Aurangzib*, Vol. III, 3rd Ed., Ch. XXXV.

'নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগুপিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ—
নাই তার কাছে জীবন মরণ
নাই নাই আর কিছু।'

ইতিহাসের সঙ্গে এ চিত্র তো মেলে না। তবে কোথায় পেলেন এ ছবি? এ কি কবির নিজের মনের ধ্যানধারণার প্রক্ষেপ নয়? নিজের স্বপ্নকে ইতিহাসের আধারে আরোপ নয়?

"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবার সময় পাণ্ডবরা এক বৎসর অজ্ঞাতবাস যাপন করেছিলেন—গুরুগোবিন্দ তাঁর গুরুপদ গ্রহণ করবার পূর্বে বহুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আমাদের এখন সেই সময়। এখন যদি গা-ঢাকা দিয়ে নিজের কর্মশালার মধ্যে বসে গভীর গম্ভীর নিবিষ্ট-ভাবে নিজের লোক ও নিজের সমাজের কাজ না করি, যদি একবার আপনার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হতে দিই, সম্পূর্ণতা লাভ করবার পূর্বেই ক্রমাগত নিজের অসমাপ্ত কাজ দেখিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহবা নেবার ইচ্ছে করি, তা হলে কিছুই হবে না।"[৪২]

এখানে একই সঙ্গে গুরুগোবিন্দর ও নিজের উল্লেখ, দুজনের সাধন-সাম্যের ইঙ্গিত তাৎপর্যপূর্ণ। সে তাৎপর্যটি এই যে, নির্জনে বাস করে প্রস্তুত হয়ে উঠবার যে ইচ্ছা এবং সাধনার দ্বারা পূর্ণতা লাভের যে আকাঙ্ক্ষা এই সময় তাঁকে পেয়ে বসেছিল গুরুগোবিন্দ সিংহে তারই আরোপ করেছেন, সে ছবি ইতিহাসের সঙ্গে মিলল কি না ভেবে দেখেন নি। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ ঐতিহাসিক ফোটোগ্রাফ নয়। কবির ভাবের রঙে ধ্যানের রেখায় অঙ্কিত ছবি। কবির সত্যের স্থান হয়তো ঐতিহাসিকের সত্যের চেয়ে উঁচুতে, তবু তার ঐতিহাসিকতা স্বীকার করা চলে না।[৪৩]

গুরুগোবিন্দ কবিতাটি রচনার পরদিনে লিখিত হল নিষ্ফল উপহার কবিতাটি। কবিতাটি গুরুগোবিন্দ কবিতার মতো আখ্যায়িকাহীন ভাবোচ্ছ্বাস নয়, একটি স্পষ্ট ভিত্তির উপরে গঠিত। নীচে সেই আখ্যায়িকাটি প্রদত্ত হল।

> ধনের প্রতি গোবিন্দের বিরাগ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে বলি। গোবিন্দের একজন ধনী শিষ্য তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের একজোড়া বলয় উপহার দিয়াছিল। গোবিন্দ তাহার মধ্য হইতে একটি বলয় লইয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। দৈবাৎ পড়িয়া গেছে মনে করিয়া একজন শিখ পাঁচশত টাকা

---

৪২ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৮৪।

৪৩ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ'— গুরুগোবিন্দের তপস্যাকাল বারো বছর। ইতিহাস বলছে কুড়ি বছর—"We are told that he remained in obscurity for twenty years" —W. Irvine, *The Later Mughals*, Vol. I, Ch. I.

এখানে কবি স্পষ্টতঃ হিন্দুদের তপস্যাকালের ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া একজন ডুবারিকে সেই বলয় খুঁজিয়া আনিতে অনুরোধ করিল। সে বলিল, 'আমি খুঁজিয়া আনিতে পারি, যদি আমাকে ঠিক জায়গাটা দেখাইয়া দেওয়া হয়।' শিখ গোবিন্দকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বালা কোন্‌খানে পড়িয়া গেছে। গোবিন্দ অবশিষ্ট বালাটি লইয়া জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'ওইখানে।' শিখ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আর খুঁজিল না।[৪৪]

কবিতাটিতে গুরুগোবিন্দের ধন সম্বন্ধে উদাসীনতা সুন্দরভাবে চিত্রিত হলেও, মূলের সঙ্গে কিছু প্রভেদ আছে। মূলে আছে গোবিন্দ একখানি বালা ইচ্ছা করে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, কবিতায়

সহসা একটি বালা শিলাতল হতে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

এখানে ঘটনার উপরে কবি-কল্পনার জয় হয়েছে মনে হয়। ভক্তের উপহার জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ায় ধন সম্বন্ধে যে উদাসীনতা কিছু উৎকট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা গুরুর মর্যাদার উপযুক্ত নয়। হঠাৎ জলে পড়ে গেল, গুরু ভ্রূক্ষেপ করলেন না, এই কি যথেষ্ট নয়? মূলে আছে শিখ মোটা পারিশ্রমিকের লোভ দেখিয়ে বলয় উদ্ধারের জন্য একজন লোক নিযুক্ত করল, কবিতায় দাতা নিজেই জলে নামল। দুটিকেই সমর্থন করা চলে। পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের বলয় যে ব্যক্তি উপহার দিতে সক্ষম তার প্রাণের মায়া কিছু বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই টাকা দিয়ে বিপজ্জনক কাজে লোক নিয়োগের কথাই সে ভাববে। কবিতায় শিষ্যটির ভক্তি যমুনার জলের চেয়ে গভীর, তাই নিজেই নেমে পড়েছে। শিখটির রঘুনাথ নামকরণ খুব সম্ভব কবিকৃত।

শেষ শিক্ষা কবিতাটি পূর্বোক্ত কবিতা-দুটির কয়েক বছর পরে লিখিত হলেও তখনো তিনি গুরুগোবিন্দ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী ধারণা পোষণ করছেন, পরবর্তীকালে লিখিত শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ প্রবন্ধে মতামত তখনো ভবিতব্যের গর্ভে।

গুরুগোবিন্দর মৃত্যু সম্বন্ধে নানাপ্রকার কাহিনী প্রচলিত আছে। কোনো কোনো বিষয়ে এ-সব কাহিনীর মধ্যে অমিল থাকলেও এক বিষয়ে সব কাহিনী সমান সাক্ষ্য দেয়, গোবিন্দর মৃত্যু আততায়ীর হাতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বীর গুরু প্রবন্ধে গোবিন্দের যে মৃত্যুবর্ণনা দিয়েছেন তা খুব সম্ভব কানিংহামের শিখ-ইতিহাস থেকে গৃহীত। এখানে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করে দেওয়া হল।

তিনি (গোবিন্দ) একজন আফগানকে কার্যে নিযুক্ত করেন; সে ছিল কিছুটা এডভেঞ্চেরার কিছুটা বণিক; গোবিন্দ তাহার নিকট হইতে বেশ কিছু অশ্ব ক্রয় করেন। এই বণিক একসময় তাঁহাকে দেয় অর্থ মিটাইয়া দিবার জন্য বলিল। কিন্তু বিলম্ব দেখিয়া সে এমন রুষ্ট ব্যবহার করিল যে গোবিন্দ দারুণরাগে তাহাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করেন। মৃত পাঠানের দেহ সরাইয়া সমাধিস্থ করা হইল। তাহার পরিবার ইহাকে নিয়তির খেলা বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিল। কিন্তু তাহার পুত্রেরা মনের মধ্যে এই

---

৪৪ "বীর গুরু", ইতিহাস।

মূল আখ্যায়িকা কোথায় আছে অনুসন্ধান করে পাই নি।

প্রতিহিংসা জীয়াইয়া রাখিল এবং উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। একদিন নিদ্রিত গোবিন্দকে তাহারা ছুরিকাঘাত করিল ; গোবিন্দ জাগিয়া উঠিলেন ; আততায়ীরা ধরা পড়িল। তাহাদের ভঙ্গিতে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল এবং বলিল যে তাহারা ঠিকই করিয়াছে। গুরু (গোবিন্দ) সমস্ত শুনিলেন, তাঁহার মনে পড়িল তাহাদের হতভাগ্য পিতার কথা, হয়তো বা তাঁহার নিজের পিতারও। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন যে তাহারা উপযুক্ত কাজই করিয়াছে এবং নির্দেশ দিলেন তাহারা যেন অক্ষত অবস্থায় মুক্তি পায়। ১৭০৮ সালে গোবিন্দ গোদাবরী তীরে নুদেরায় নিহত হন।[৪৫]

আহত অবস্থায় ধনুকে ছিলা পরাতে গিয়ে গোবিন্দর মৃত্যু হল এ তথ্যটি কানিংহামে নেই, আরভিনের ***The Later Mughals*** গ্রন্থে আছে। সেখানে এ বিষয়ে অতিরিক্ত যে তথ্য আছে তা পাদটীকায় উদ্ধৃত হল।[৪৬]

রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর সেই ধারাটি অনুসরণ করেছেন যাতে গুরুগোবিন্দর ব্যক্তিগত মহত্ত্ব সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয়। কবিতাটিতে তথ্যগত নিষ্ঠা প্রশংসার যোগ্য।[৪৭]

---

৪৫ গুরুগোবিন্দের মৃত্যু সম্পর্কে সাধারণতঃ এই কাহিনীই অল্পবিস্তর পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত। একটু বিস্তৃত আকারে কেহ কেহ বলেন যে মৃত পাঠানের বিধবা স্ত্রী তাহার পুত্রদের প্রতিশোধ লইবার জন্য ক্রমাগত উত্তেজিত করিত। অনেকে আবার, বিশেষতঃ মুসলমান লেখকবৃন্দ, বলেন যে, গুরুগোবিন্দ তাঁহার কার্যের জন্য অনুতপ্ত হন। অনেক শিখ লেখকও এই অভিমত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, মৃত পাঠানের পুত্রদের প্রতি গোবিন্দর চিত্ত এমন স্নেহাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে তিনি তাহাদের সহিত (শতরঞ্চ) খেলা করিতেন এবং খেলার ফাঁকে ফাঁকে তাহাদিগকে (তাঁহার উপর) প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিতেন। কারণ, জীবন তাঁহার কাছে দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের হস্তে মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন। সির উল মুতাখেরিন্ (The Seirool Mutakhereen) বলেন যে স্বীয় পুত্রদের মৃত্যু-বিয়োগের বেদনায় গুরুগোবিন্দ মারা যান।— J. D. Cunningham, *The History of the Sikhs*, Ch. III.

৪৬ The tradition in the Sikh books (Sakhi Book, 198) is somewhat different. The murderer is stated to be the son of Said Khan, and the grandson of Painda Khan. Possibly the latter was the opponent whom Guru Govinda slew. In opposition to his own precept, which prohibited all friendship with Muhammadans, Govinda allowed this boy to come about him. One day, after they had played at Chaupar, a sort of draughts, Guru Govinda lay down to rest, two daggers recently given to him being by his side. The boy took up one of the daggers and inflicted three wounds. Govinda Singh sprang up, crying out, 'The Pathans have attacked me'. One Lakha Singh ran in and cut off the boy's head. The wounds were sewn up, and for fifteen days all went well. Then, on the 2nd of some lunar month, two bows were brought to the Guru. In trying to bend them, the Guru's wounds opened, during the 3rd and 4th he was insensible, and on 5th of that month he expired.—W. Irvine, *The Later Mughals*, Ch. I.

৪৭ কিন্তু হলে কি হয়, কবিতাটি শিখ-সম্প্রদায়ের একাংশের অসন্তোষের কারণ হয়। খুব সম্ভব শিখ গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীকেই শিখ-সম্প্রদায় সত্য মনে করেন ; রবীন্দ্রনাথ অন্য ধারা অনুসরণ করেছেন, তাতেই অসন্তোষের কারণ। যাই হোক, ব্যাপারটা উভয় পক্ষের মোকাবিলায় সন্তোষজনকভাবে মিটে যায়। —দ্রষ্টব্য, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "উত্তর ভারতে, ১৯৩৫," রবীন্দ্রজীবনী, চতুর্থ খণ্ড।

প্রার্থনাতীত দান কবিতাটির তথ্যাংশ রবীন্দ্রনাথের শিখ-স্বাধীনতা প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে, অবশ্য মূল কাহিনী গৃহীত কানিংহামের শিখ-ইতিহাস গ্রন্থ থেকে। এখানে শিখ-স্বাধীনতা প্রবন্ধে বিবৃত অংশ লিপিবদ্ধ হচ্ছে।

নাদিরশাহের ভারত-আক্রমণ-কালে শিখেরা ছোটো ছোটো দল বাঁধিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্তী পারসিক সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া লুটপাট করিতে লাগিল।··· কখনো কখনো কেহ বা ধৃতও হইত, কেহ বা হতও হইত, কিন্তু কখনো এমন হয় নাই যে, একজন শিখ ভয়ে তাহার স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছে।··· মুসলমানেরা অধিকসংখ্যক সৈন্য লইয়া দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিল ও শিখদিগকে পরাভূত করিল। লাহোরে এই উপলক্ষে বিস্তর শিখ নিহত হয়। যেখানে এই বধকার্য সমাধা হয় লাহোরের সেই স্থান স্থহিদগঞ্জ[৪৮] নামে অভিহিত। এখনো সেখানে ভাই তরুসিংহের কবরস্থান আছে। কথিত আছে, তরুসিংহকে তাঁহার দীর্ঘ কেশ ছেদন করিয়া শিখধর্ম ত্যাগ করিতে বলা হয়। কিন্তু গুরুগোবিন্দের এই বৃদ্ধ অনুচর তাঁহার ধর্ম ত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন এবং শিখদের শাস্ত্রানুমোদিত জাতীয় চিহ্নস্বরূপ দীর্ঘ কেশ ছেদন করিতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, 'চুলের সঙ্গে খুলির সঙ্গে এবং খুলির সঙ্গে মাথার সঙ্গে যোগ আছে। চুলে কাজ কি, আমি মাথাটা দিতেছি।'[৪৯]

কবিতাটি তথ্যের সংকীর্ণ পথ দিয়ে চলে প্রশস্ত সার্থকতায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে, কবিকে কল্পনার অপব্যয় করতে হয় নি।

বন্দীবীর জনপ্রিয় কবিতা, এটি ১৩০৬ সালের আশ্বিন মাসে লিখিত হয়। মূল আখ্যায়িকার সঙ্গে মিলিয়ে কবিতাটি পড়লে দেখা যাবে যে মূল আখ্যায়িকাকে কবি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন, এমনকি ছোটোখাটো ব্যাপারেও মূলকে লঙ্ঘন করেন নি। সে আলোচনায় প্রবেশের আগে কানিংহামের শিখ-ইতিহাস গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ অনুবাদ করে দিলাম। কবি কানিংহামকেই অনুসরণ করেছেন :

বান্দা ছিলেন গোবিন্দর বাছাই করা শিষ্য। তিনি মূলতঃ দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসী এবং বৈরাগী শ্রেণীর সন্ন্যাসী ছিলেন। গুরুগোবিন্দের তিরোধানের পরে তাঁহার শিষ্যদের জীবনেতিহাস হইতেই বুঝা যাইবে গুরু তাঁহাদিগকে কিরূপভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সাফল্যের প্রতিশ্রুতি স্বরূপ বান্দা যখন গুরুগোবিন্দের তূণীর সঙ্গে লইয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতে পৌঁছিলেন, তখন দলে দলে শিখগণ তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত হইল। সিরহিন্দের নিকটে মোগল কর্তৃপক্ষকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন। বান্দা সেখানকার প্রদেশপালকে পরাজিত করিয়া নিহত করিলেন।···

সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যু সিংহাসন লইয়া আর-একটি দ্বন্দ্বের সূচনা করিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এক বৎসর সিংহাসন দখলে রাখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফরুখ্‌শিয়রের হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। এই গোলযোগে শিখদের খুব সুবিধা হয়। তাহারা

---

৪৮ স্থহিদগঞ্জ না সহিদগঞ্জ ?

৪৯ "শিখ-স্বাধীনতা", ইতিহাস।

আবার ঐক্যবদ্ধ ও অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠিল। বিপাশা ও ইরাবতী নদীর মধ্যভাগে গুরুদাসপুর নামে তাহারা একটি উল্লেখযোগ্য দুর্গ গঠন করিল।...

আব্দুল সামাদ খাঁ তাঁহার সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধপ্রিয় দেশবাসীদের মধ্য হইতে কয়েক সহস্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। লাহোর ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিখ সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বান্দা প্রচণ্ডভাবে প্রতিরোধ করিয়াও পরাজিত হইলেন। বিজেতারা পশ্চাদ্ধাবন করিলে বান্দা এক দুর্গ হইতে অন্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নিজের যথেষ্ট ক্ষতি হইলেও তিনি বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া শত্রুদেরও যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছিলেন।

অবশেষে তিনি গুরুদাসপুর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন এবং সেখানে শত্রুগণ নীরন্ধ্র অবরোধ রচনা করিল। বাহির হইতে কিছুই তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিত না। সকল রসদ ফুরাইয়া যাইবার পর ঘোড়া, গাধা, এমন-কি নিষিদ্ধ গোমাংস পর্যন্ত বাদ যায় নাই। অবশেষে বান্দা আত্মসমর্পণ করিল। বন্দী বান্দা ও তাঁহার অনুচরদের দিল্লী লইয়া যাইবার কালে কিছু সংখ্যক শিখের ছিন্ন মুণ্ড বর্শাফলকে বিদ্ধ করিয়া পুরোভাগে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। ধর্মান্ধ অর্ধসভ্য বর্বর বিজেতাদের পক্ষে যেরূপ স্বাভাবিক, বান্দা ও বন্দী শিখদের সর্বপ্রকারে অপমানের চরম করা হইয়াছিল। প্রতিদিন একশত শিখকে হত্যা করা হইত। শিখদের মধ্যে আগে শহীদ হইবার জন্য দেখা যাইত প্রতিযোগিতা। অষ্টম দিবসে বান্দা তাঁহার বিচারকদের সম্মুখে আনীত হইলেন। একজন মুসলমান ওমরাহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার মতো জ্ঞানবিচারসম্পন্ন লোক কিভাবে এমন পাপ করিতে পারেন যাহার ফলে নরকবাস অনিবার্য। বান্দা উত্তর করিলেন যে, তিনি দুষ্টের দমনের জন্য ভগবানের হাতে যন্ত্রস্বরূপ এবং ভগবানের বিরুদ্ধে অপরাধের শাস্তিই তিনি এখন পাইতেছেন। তাঁহার পুত্রকে তাঁহার জানুর উপর ফেলিয়া তাঁহার হাতে একটি ছুরি দেওয়া হইল। নিজ পুত্রকে বধ করিবার নির্দেশ তাঁহাকে দেওয়া হইল। নিঃশব্দে এবং অবিচলিতভাবে তিনি তাহাই করিলেন। তার পর অগ্নিদগ্ধ সাঁড়াশিদ্বারা তাঁহার মাংস ছিঁড়িয়া লওয়া হইল। এই নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মধ্যে তাঁহার জীবনের অবসান হইল। মুসলমানেরা বলে যে তাহার কৃষ্ণ-আত্মা পাখায় ভর করিয়া নরকের উদ্দেশে যাত্রা করিল।[৫০]

১৮৮৫ সালে লিখিত শিখ-স্বাধীনতা[৫১] নামে প্রবন্ধে কবি বান্দার বিবরণ লিখেছেন, কবিতার সঙ্গে তার সামান্যই প্রভেদ। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে আরভিন-লিখিত *The Later Mughals* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে।[৫২]

---

৫০ J. D. Cunningham, *The History of the Sikhs*, Ch. III.

৫১ "শিখ-স্বাধীনতা", ইতিহাস।

৫২ Ch. IV.

খুব সম্ভব বইখানি কবির পড়বার সুযোগ হয় নি, কেননা, বন্দীবীর কবিতা লিখিত হওয়ার অনেক পরে বইখানি প্রকাশিত হয়। যদিচ চতুর্থ পরিচ্ছেদের কিয়দংশ ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল (J. A. S. B.) কিন্তু যে অংশে বান্দার কাহিনী আছে তার প্রথম প্রকাশ ঘটে (J. A. S. B.) ১৯০৪ সালে।

অপ্রাসঙ্গিক হবে না মনে করে কবিতা ও ইতিহাসের মধ্যে সাম্য প্রদর্শনের আশায় আরভিনের গ্রন্থ থেকে কতক অংশ প্রবন্ধের শেষে[৫৩] তুলে দিলাম। শিখ-স্বাধীনতা প্রবন্ধে সব ঘটনাই সংক্ষেপে আছে, কানিংহামেও আছে। আরভিন-লিখিত বিস্তারিত বিবরণ পড়লে আর কিছু না হোক ঘটনাকালীন শিখদের মনোভাব বেশ বুঝতে পারা যাবে, বন্দী বীরের মতো কবিতাকে আর অবাস্তব মনে হবে না; দেখা যাবে, আখ্যায়িকায় ও কবিতায় তথ্যগত মিল ঘনিষ্ঠ :

সম্মুখে চলে মোগল সৈন্য
উড়ায়ে পথের ধূলি,
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া
বর্শাফলকে তুলি।
শিখ সাত শত চলে পশ্চাতে,
বাজে শৃঙ্খলগুলি।
রাজপথ'পরে লোক নাহি ধরে,
বাতায়ন যায় খুলি।

আখ্যায়িকায় আছে সাত শো চল্লিশ, কবিতায় সাত শো।

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি—
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে
বন্দীরা সারি সারি
"জয় গুরুজির" কহি শত বীর
শত শির দেয় ডারি।

সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ
নিঃশেষ হয়ে গেলে
বন্দার কোলে কাজি দিল তুলি
বন্দার এক ছেলে।
কহিল, "ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে।"

---

৫৩ পরিশিষ্ট ঘ দ্রষ্টব্য।

দিল তার কোলে ফেলে—
কিশোর কুমার, বাঁধা বাহু তার,
বন্দার এক ছেলে।

এখানে কিছু অমিল আছে। আখ্যায়িকায় বান্দার ছেলে শিশু, "child"— আর মৃত্যুর বিবরণটাও অন্যরকম। "After he [Banda] had been made to dismount and was seated on the ground, his young son was put into his arms and he was told to take the child's life. He refused. Then the executioner killed the child with a long knife, dragged out its liver, and thrust it into the Guru's mouth"। কানিংহামে আছে, বান্দা পুত্রকে হত্যা করলেন; আরভিনের মতে বান্দা পুত্রকে হত্যা করতে অস্বীকার করেছেন। কবি কানিংহামকে অনুসরণ করেছেন, খুব সম্ভব আরভিনের মত তিনি জানতেন না।

মূলে বর্ণিত বীভৎসতা এ যুগের পাঠকের পক্ষে দুঃসহ বিবেচনায় কবি তার কিছু পরিবর্তন করেছেন। পুত্রকে বধ করলে পিতার দুঃখবরণের মহত্ত্ব প্রকাশ পেত, কিন্তু কিশোর কুমারের জয় গুরুজি বলে মৃত্যুবরণে পুত্র ও পিতা দুজনেরই মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এখানে ইতিহাসের তথ্যের উপরে কল্পনার সত্য জয়ী হয়েছে। যে দেশের ইতিহাস নেই সেই দেশই সুখী।

এখানে শেষ সপ্তক গদ্যকাব্যের তেত্রিশ-সংখ্যক রচনাটির আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে— বিষয়-সাম্যে প্রাসঙ্গিকতা আছে। কবি-রচিত ইতিহাস গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধগুলিতে রচনাটির বস্তু বা আখ্যায়িকার উল্লেখ নেই। খুব সম্ভব শিখ-ইতিহাস-সম্পর্কিত কবিতাগুলি রচনা-কালেই বস্তুর সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটেছিল, কিম্বা পরবর্তীকালে প্রকাশিত আরভিনের গ্রন্থ থেকে পেয়ে থাকবেন, কিন্তু তখন রচনা করা সম্ভব হয় নি, হয়েছে অনেক পরে।[৫৪] সময়ের ব্যবধানে বক্তব্যে অনেক ব্যবধান ঘটে গিয়েছে। মনের হাওয়ার বদল হয়েছে, দেশের হাওয়ারও, কবির মনে আগের সে উগ্র জাতীয়তাবোধের স্থান দখল করেছে মানবধর্মবোধ। ভিক্ষাদত্ত মুক্তিকে অগ্রাহ্য করে 'নেহাল সিং বালক' বলে উঠল, "চাই নে প্রাণ মিথ্যার কৃপায়, সত্যে আমার শেষ মুক্তি, আমি শিখ।" আগে বর্ণিত শিখবীরগণ প্রাণ দিয়েছে ধর্মের জন্য, গুরুর জন্য, নেহাল সিং প্রাণ দিল সত্যের জন্য। সকলেই বীর, তবে কে কোন্ উদ্দেশ্যে প্রাণ দিল তাতে অনেক প্রভেদ ঘটে, অন্ততঃ কবি তা-ই মনে করেছেন।[৫৫]

---

৫৪ শেষ সপ্তক (গদ্যকাব্য), প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৪২ (১৯৩৫)

৫৫ Although life was promised to those who became Muhammadans, not one prisoner proved false to his faith. Among them was a youth, whose mother made many supplications to Qutb-ul-mulk, through Ratan chand, his diwan or principal man of business. She said she was a widow, had but this son, and he had been unjustly seized, being no disciple or follower of the Guru but only a prisoner in his hands. The Wazir interceded and obtained the boy's life. The woman took the order of release to *kotwal,* who brought out the prisoner and told him he was free. The youth said, 'I know not this woman. What does she want with me? I am a true and loyal follower of the Guru, for whom I give my life. What is his fate shall be mine also.' He then met his fate without flinching.—W. Irvine, *The Later Mughals*, Ch. IV.

শেষ সপ্তকের অন্তর্গত রচনাটির একটি স্তবকে আছে মোগল সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ গুরুদাসপুর দুর্গের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা—

ভাণ্ডারে না রইল গম, না রইল যব,
না রইল জোয়ারি ;
জ্বালানি কাঠ গেছে ফুরিয়ে।
কাঁচা মাংস খায় ওরা অসহ্য ক্ষুধায়,
কেউ বা খায় নিজের জঙ্ঘা থেকে মাংস কেটে।
গাছের ছাল, গাছের ডাল গুঁড়ো করে
তাই দিয়ে বানায় রুটি।

আরভিনের গ্রন্থে বর্ণনা পাওয়া যায়—

". . . and not having any firewood, ate the flesh raw. . . . Many began to pick up and eat whatever they found on the roads. When all the grass was gone, they gathered the leaves from the trees. When these were consumed, they stripped the bark and broke off the small shoots, dried them, ground them down, and used them instead of flour, thus keeping body and soul together. They also collected the bones of animals and used them in the same way. Some assert that they saw a few of the sikhs cut flesh from their thighs, roast it, and eat it." [৫৬]

এখানে ইতিহাসের তথ্য ও কবির কল্পনা পাশাপাশি হাত ধরে চলেছে, কারো মর্যাদা কেউ ক্ষুণ্ন করে নি। এরকম রূঢ় বাস্তবকে বোধ করি বাঁধাছন্দে প্রকাশ অসম্ভব, তাই কবিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে গদ্যছন্দ উদ্ভাবন পর্যন্ত। খুব সম্ভব এও একটি কারণ যেজন্য কথাকাব্যের বাঁধাছন্দের যুগে এই ঘটনাটি নিয়ে কবিতা রচনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

বস্তুবিচারের তথ্য সম্পর্কিত আলোচনা শেষ করে এবারে আমরা এই আলোচনা থেকে লব্ধ কতকগুলি সাধারণ সত্য বা নিয়ম সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

কথাকাব্য সম্বন্ধে তথ্যমূলক আলোচনা শেষ হল। আলোচিত পঁচিশটি কবিতার বস্তু বা মূল আখ্যায়িকা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস থেকে সংগৃহীত। কাহিনী নামে পরিচিত নাট্যকাব্যের সংগ্রহ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর কোনো কাব্য সমগ্রভাবে এমন প্রাচীনবস্তুনির্ভর নয়। নিছক সংখ্যার বিচারে কথাকাব্যের স্থান সকলের আগে। কাহিনী নাট্যকাব্যের বস্তুর অধিকাংশই রামায়ণ ও মহাভারত থেকে গৃহীত বলে

৫৬ W. Irvine, *The Later Mughals*, Ch. IV.

পরিচিত ; তুলনায় কথা কাব্যের বস্তুর অনেকগুলিই গৃহীত হয়েছে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে, সে-সব সাধারণ পাঠকের আয়ত্তের বাইরে বলে নীরস মনে হওয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও বিস্তারিত ভাবে উদ্ধার করে দিতে হয়েছে। বস্তু সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা না হলে বস্তু কিভাবে শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে বুঝতে পারা যাবে না।

বস্তু বা মূল আখ্যায়িকা অবলম্বন করে কাব্য রচনা করতে গেলে তার পরিবর্তন অপরিহার্য। পরিবর্তন বলতে বোঝায় পরিবর্জন, অর্থাৎ কোনো কোনো তথ্যকে বাদ দেওয়া ; বোঝায় পরিবর্ধন, অর্থাৎ কোনো কোনো তথ্য যা বীজাকারে আছে তাদের স্ফুটতর করে তোলা ; আর বোঝায় পরিমার্জন, অর্থাৎ যে-সব তথ্য গ্রাম্যতা বা অন্যপ্রকার দোষে অপরিচ্ছন্ন, পরিশীলিত রুচির প্রলেপ দিয়ে তাদের মালিন্য ঘুচিয়ে উজ্জ্বল করে তোলা। আর-এক প্রকারের স্বাধীনতা কবি গ্রহণ করেন, তাকে বলা যেতে পারে পরিযোজন, অর্থাৎ মূলে যা আদৌ নেই তার আরোপ। চার রকম স্বাধীনতাই কবিদের আছে আর এই স্বাধীনতা গ্রহণের মধ্যেই তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব ধরা পড়ে। কথাকাব্যে বস্তুর পরিবর্জন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের বিস্তারিত বিবরণ আগে দিয়েছি, এবারে দেখতে হবে কবি যে স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন তাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের কি পরিচয় পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ পুরাণের আখ্যায়িকাগুলোয়, ভক্তমালের কবিতায়, এমন-কি বন্দী বীরের আখ্যায়িকাটিতেও অতিপ্রাকৃত ঘটনা আছে। রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র অতিপ্রাকৃতকে বর্জন করেছেন। এ যুগ অতিপ্রাকৃতের সাহায্য ছাড়াই মহত্ত্বকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে, বুদ্ধের মহিমা বুঝবার উদ্দেশ্যে জন্মজন্মান্তরের সাক্ষ্য তলব করে না। এ যুগের সুদাস মালী ভগবান তথাগতের "নিরঞ্জন আনন্দমুরতি" দেখে পদ্মফুলের দাম চাইতে, এমন-কি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করতেও ভুলে যায়। এ যুগের মানুষ ভিতরের দিকের দরজাটার সন্ধান পেয়েছে, তাই বাইরে আজগুবির অবতারণা করে চোখ ভোলাতে চায় না।

আর-এক প্রকার পরিবর্জনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে অনেকগুলো কবিতায়। বস্তুতে যেখানে স্থূলতা ও বীভৎসতা আছে কবি সেখানে নির্মম ভাবে কলম চালিয়েছেন। অভিসার কবিতাটির বস্তুতে আছে বাসবদত্তা বিকলাঙ্গ হয়েছিল। সে যুগে কোনো কোনো অপরাধের এই ছিল প্রচলিত শাস্তি। এ যুগের কবির চোখে বীভৎস মনে হয়েছে ব্যাপারটাকে, তাই কবি মারীগুটিকায় বাসবদত্তাকে বিকল করেছেন। আবার বন্দী বীর কবিতার বস্তুতে আছে যে জহ্লাদ বন্দার পুত্রকে হত্যা করে তার যকৃৎ টেনে বের করে এনে ঢুকিয়ে দিল বন্দার মুখে। এ চলতে পারে না এ যুগের কবিতায়— বাদ দিতে হয়েছে। এমন উদাহরণ আরো পাওয়া যাবে। স্থূলতা ও বীভৎসতা পরিবর্জিত হয়েছে, আবার অতিপ্রাকৃতও একপ্রকার স্থূলতা, তাও পরিবর্জিত হয়েছে।

পরিবর্ধন বলতে বোঝায় বীজাকারে যা আছে তাকে পরিবর্ধিত করে তোলা। প্রভু বুদ্ধের পায়ে দেবার জন্য পদ্মটি নিয়ে এমন দরাদরির কারণ নিশ্চয় এই যে, পদ্ম তখন দুর্লভ হয়েছিল। তা শীতকালেই সম্ভব। এটি বীজ। কবি বীজকে পরিবর্ধিত করে বলছেন—

অঘ্রানে শীতের রাতে
নিষ্ঠুর শিশিরঘাতে

পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া ;
সুদাস মালীর ঘরে
কাননের সরোবরে
একটি ফুটেছে কি করিয়া।

শীতের দিনের দুর্লভ পদ্ম— তাও আবার কিনা মালীর সযত্ন রক্ষিত সরোবরের। ঐ পদ্মটি সম্বন্ধে মালীর বিশেষ আগ্রহ স্বাভাবিক, চড়া দাম পাওয়ার ইচ্ছাও স্বাভাবিক। সমস্ত কবিতাটির ভিত্তি পদ্মটি, যা শীতের দিনে "ফুটেছে কি করিয়া"। এই মূল তথ্যটি বাদ দিলে কবিতাটি নিরর্থক হয়ে পড়ে— তাই যা বীজাকারে ছিল তাকে পুষ্ট ও পরিবর্ধিত করে এঁকেছেন কবি। পরিবর্ধনের আর-একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে হোরিখেলা কবিতায়। বস্তুতে আছে, তখন মধুর বসন্তকাল এল, আর রাজপুতানার নরনারী হোরিখেলায় উন্মত্ত হয়ে উঠল। কবি ঐ ক্ষুদ্র সম্ভাবনাকে অবলম্বন করে তিনটি শ্লোকে চব্বিশটি ছত্রে আকাশে বাতাসে ও মানুষের মনে বসন্তের উন্মাদনার ছবি এঁকেছেন। মূলে যা বাক্য, কবিতায় তা হয়ে উঠেছে রসবাক্য।

পরিযোজনের দৃষ্টান্ত অবিরল। ব্রাহ্মণ, পরিশোধ ও অভিসার কবিতায় মানুষের মনের ভাবনার সঙ্গে মিল রেখে যে নিসর্গের বর্ণনা আছে, যা আর নিছক বর্ণনামাত্র থাকে নি, নরনারীর সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্যের সঙ্গে তরঙ্গিত হয়েছে— এ সমস্তই পরিযোজিত, মূলে এদের উল্লেখমাত্র নেই। বস্তুতঃ এ হচ্ছে এ যুগের চোখে নিসর্গকে দর্শন।

পরিমার্জনের দৃষ্টান্ত চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া কঠিন। কিন্তু বস্তুতে আর কবিতায় মিলিয়ে পড়লে অনুভব করতে পারা যায় যে পরিবর্জন, পরিবর্ধন ও পরিযোজন ছাড়াও আর-একটা প্রক্রিয়া চলেছে রচনার সময়ে। একটি সুকুমার, অনুশীলিত, সূক্ষ্মরুচিসম্পন্ন মন কবিতাগুলির উপরে দিব্য প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে। এই মনটি অতিপ্রাকৃতে অবিশ্বাসী হয়েও ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, বীভৎসা সম্বন্ধে স্পর্শকাতর হওয়া সত্ত্বেও তথ্যনিষ্ঠ, আর সর্বোপরি পুরাণ ও ইতিহাস সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান হওয়া সত্ত্বেও মানবপ্রকৃতির সত্য সম্বন্ধে অধিকতর শ্রদ্ধাবান। এই গেল মনের প্রক্রিয়া। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তার পিছনে আছে অনন্য-সাধারণ কবিপ্রতিভা, যা একটিমাত্র দিনে পরিশোধের মতো সুন্দর দীর্ঘ কবিতাটি লিখতে সক্ষম। গাথা কবিতা বাংলা ভাষায় কথাকাব্যের আগে ও পরে অনেক লিখিত হয়েছে, কিন্তু কোথাও যে এমন উৎকর্ষের স্তরে পৌছয় নি তার কারণ, তাদের পিছনে এমন বহুগুণান্বিত মন ও প্রতিভার লীলা সক্রিয় ছিল না।

এবারে আমরা উপসংহারের কাছে এসে পৌচেছি, কিন্তু তার আগে ছোট একটি প্রসঙ্গ সেরে নিতে চাই। কথাকাব্যের অনেকগুলো কবিতা সম্বন্ধে নানা জনে নানা উদ্দেশ্যে মত প্রকাশ করেছেন— যদিচ সে-সমস্ত মত সাহিত্যবিচারের এলাকার বাইরে, তাদের প্রত্যক্ষ যোগ হচ্ছে সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে। তাছাড়া অধিকাংশ মন্তব্যই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, যদিচ কোনো কোনো মন্তব্যকে কবি আলোচনাযোগ্য মনে করেছেন। আর কোনো কারণে না হোক, কৌতূহল পরিতৃপ্তি করতে পারে আশায় প্রসঙ্গটির এখানে অবতারণা করা গেল।

যতদূর জানা যায় শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, ব্রাহ্মণ, পূজারিনী, মানী, বন্দী বীর, শেষ শিক্ষা ও বিচারক কবিতাগুলো সম্বন্ধে নানা পক্ষ থেকে নানা রকম আপত্তি উঠেছে। শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা ও পূজারিনী -সংক্রান্ত আপত্তির উত্তরে কবি নিজ মত ব্যক্ত করেছেন। এখানে কবির প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধার করে দেওয়া হল।

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা সম্বন্ধে উত্থাপিত আপত্তির বিরুদ্ধে কবি মন্তব্য করেছেন—

"আমি কবিতায় একটি বৌদ্ধকাহিনী লিখেছিলেম। বিষয়টি হচ্ছে এই :

"একদা প্রভাতে অনাথপিণ্ডদ প্রভু বুদ্ধের নামে শ্রাবস্তী নগরের পথে ভিক্ষা মেগে চলেছেন। ধনীরা এনে দিল ধন, শ্রেষ্ঠীরা এনে দিল রত্ন, রাজঘরের বধূরা এনে দিলে হীরামুক্তার কণ্ঠী। সব পথে পড়ে রইল, ভিক্ষার ঝুলিতে উঠল না। বেলা যায়, নগরের বাহিরে পথের ধারে গাছের তলায় অনাথপিণ্ডদ দেখলেন এক ভিক্ষুক মেয়ে। তার আর কিছুই নেই, গায়ে একখানি জীর্ণ চীর। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই মেয়ে সেই চীরখানি প্রভুর নামে দান করলে। অনাথপিণ্ডদ বললেন, অনেকে অনেক দিয়েছে, কিন্তু সব তো কেউ দেয় নি। এতক্ষণে আমার প্রভুর যোগ্য দান মিলল, আমি ধন্য হলুম।

"একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ধার্মিক খ্যাতিমান লোক এই কবিতা পড়ে বড়ো লজ্জা পেয়েছিলেন ; বলেছিলেন, এ তো ছেলেমেয়েদের পড়বার যোগ্য কবিতা নয়। এমনি আমার ভাগ্য, আমার খোঁড়া কলম খানার মধ্যে পড়তেই আছে। যদি-বা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ থেকে আমার গল্প আহরণ করে আনলুম, সেটাতেও সাহিত্যের আব্রু নষ্ট হল! নীতিনিপুণের চক্ষে তথ্যটাই বড়ো হয়ে উঠল, সত্যটা ঢাকা পড়ে গেল। হায় রে কবি, একে তো ভিখারিনীর কাছ থেকে দান নেওয়াটাই তথ্য হিসাবে অধর্ম, তার পরে নিতান্ত নিতেই যদি হয় তাহলে তার পাতার কুঁড়ের ভাঙা ঝাঁপটা কিংবা একমাত্র মাটির হাঁড়িটা নিলে তো সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা হতে পারত। তথ্যের দিক থেকে এ কথা নতশিরে মানতেই হবে। এমন-কি, আমার মতো কবিও যদি তথ্যের জগতে ভিক্ষা করতে বেরোত তবে কখনোই এমন গর্হিত কাজ করত না, এবং তথ্যের জগতে পাগলাগারদের বাইরে এমন ভিক্ষুক মেয়ে কোথাও মিলত না রাস্তার ধারে নিজের গায়ের একখানি মাত্র কাপড় যে ভিক্ষা দিত ; কিন্তু সত্যের জগতে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য এমন ভিক্ষা নিয়েছেন এবং ভিখারিনী এমন অদ্ভুত ভিক্ষা দিয়েছে ; এবং তার পরে সে মেয়ে যে কেমন করে রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে যাবে সে তর্ক সেই সত্যের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তথ্যের এতবড়ো অপলাপ ঘটে, ও সত্যের কিছুমাত্র খর্বতা হয় না— সাহিত্যের ক্ষেত্রটা এমনি। রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এবং এক মূল্য নয়। তথ্যজগতের যে আলোকরশ্মি দেয়ালে এসে ঠেকে যায়, রসজগতে সে-রশ্মি স্থূলকে ভেদ করে অনায়াসে পার হয়ে যায়, তাকে মিস্ত্রি ডাকতে বা সিঁধ কাটতে হয় না। রসজগতে ভিখারির জীর্ণ চীরখানা থেকেও নেই, তার মূল্যও তেমনি লক্ষপতির সমস্ত ঐশ্বর্যের চেয়ে বড়ো।"[৫৭]

এবারে পূজারিনী কবিতা সম্বন্ধে প্রথমে রবীন্দ্রজীবনীকার ও পরে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃত হচ্ছে—

---

৫৭ গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭।

"কিছুকাল হইতে মুসলমানদের একদল লোক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে হিন্দু পৌত্তলিকতার ছায়া দেখিয়া আতঙ্কিত হইতেছেন। মুসলমান ছাত্রদের সেই-সব রচনা স্কুলে কলেজে পড়িতে হয় বলিয়া তাঁহাদের ঘোর আপত্তি। বাংলাভাষা অতি সংস্কৃত-ঘেঁষা, এ লইয়াও আলোচনা চলিতেছে। সম্প্রতি 'মোহম্মদী' নামে সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক মাসিকপত্র রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে নীতি ও ধর্ম -বিরোধী কথা আবিষ্কার করিয়াছেন 'পূজারিনী' কবিতায় ও 'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যকাব্যে।

"মোহম্মদীর লেখকের মতে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩) 'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পূজা করিবার' ও 'এক কালে ধর্মাধর্ম দুই তরী 'পরে পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। বারেক যখন নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপুত্রগণ, তখন ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে'— এই-সকল ইসলাম-নীতি-বিগর্হিত কথা রবীন্দ্রনাথ প্রচার করিতেছেন! এই-সব লেখা মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে পড়া অনুচিত।

"এই মূঢ়তা নীরবে সহ্য করা ধৈর্যশীল কবির পক্ষেও সম্ভব হইল না। তিনি জবাবের একস্থানে লিখিলেন, 'লেখক পাপপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন; আমি সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে তাঁকে এই উপদেশটুকু দেব যে, কাব্যে নাটকে পাত্রদের মুখে যে-সব কথা বলানো হয় সে কথাগুলিতে কবির কল্পনা প্রকাশ পায়, অধিকাংশ সময়েই কবির মত প্রকাশ পায় না। প্যারাডাইস লস্টে The Arch fiend বলছেন, To do aught good never will be our task, But ever to do ill our sole delight. সন্দেহ নেই, কথাগুলো উদ্ধতভাবে সুনীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ছাত্র বা অধ্যাপক, কোনো মাসিকপত্রের সম্পাদক বা পাঠক মিলটনকে এ বলে অনুযোগ করে নি যে, পাঠকের মনে দুর্নীতি ও ঈশ্বরবিদ্রোহ বদ্ধমূল করা কবির অভিপ্রেত ছিল। স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকের তালিকা থেকে প্যারাডাইস লস্ট্‌কে উচ্ছেদ করার প্রস্তাব এখনো শোনা যায় নি; কিন্তু বাংলা দেশে কখনোই শোনা সম্ভব হতে পারে না, জোর করে এমন কথা বলার মুখ আজ আর রইল না।

" 'হোমারের ইলিয়ড বা মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট্‌ মুখ্যতঃ পৌত্তলিকও নয় অপৌত্তলিকও নয়— ওরা সাহিত্য। ওদের গ্রহণ-বর্জন সম্বন্ধে বিচার করবার সময় একমাত্র রসের দিক থেকেই বিচার কর্তব্য, ধর্মমতের দিক দিয়ে নয়। লজ্জা হয় এই সাদা কথাটারও ব্যাখ্যা করতে।' "[৫৮]

বিচারক কবিতা সম্বন্ধে (এই সঙ্গে মানী কবিতাটিকেও ধরা উচিত) রবীন্দ্রজীবনীকার লিখছেন— "রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে বিচারক কবিতাটির জন্য শিক্ষাবিভাগীয় পাঠ্য-নির্বাচন-সমিতির নিকট হইতে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কবি একস্থানে অতি দুঃখে বলিয়াছিলেন, 'সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিয়ে ভাঙা-কপাল আমরা পরস্পরের মাথা ভাঙাভাঙি করছি, অবশেষে কি সাহিত্যের ললাটে বাড়ি পড়তে শুরু হবে?' কিছুকাল পূর্বে শিখদের হস্তেও তাঁহার লাঞ্ছনা হয় গুরু গোবিন্দ সম্বন্ধে 'শেষ শিক্ষা' কবিতার জন্য।"[৫৮]

অন্য একস্থানে রবীন্দ্রজীবনীকার দুঃখ করে বলেছেন— " 'কথা'র ন্যায় অপরূপ কাব্যগুচ্ছও সমালোচকদের

---

৫৮ "উত্তর-ভারতে সফর ও তার পরে", রবীন্দ্রজীবনী, চতুর্থ খণ্ড।

হাতে বিপর্যস্ত হইয়াছে। 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা'য় অশ্লীলতার ইঙ্গিত আছে, 'বন্দী বীর' মুসলমানদের আত্মসম্মানে আঘাত দিয়াছে, 'শেষ শিক্ষা'য় গুরু গোবিন্দ সিংহের নিন্দা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ। শিখদের অভিযোগ গুরু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যু-বিষয়ক কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য নহে। দুঃখের বিষয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে রচিত কানিংহাম সাহেবের শিখ ইতিহাসে ঐ ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে, এতদিন তাহা কাহারও আত্মসম্মানে লাগে নাই, কবিতা প্রকাশিত হইবার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে এই বিষয় লইয়া সাময়িক পত্রিকায় সমুদ্রমন্থন হয়।"[৫৯]

যাই হোক, কবির সম্বন্ধে শিখ-সমাজের প্রতিকূলতা সহজেই দূর হয়ে গেল। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখছেন— "এবার (১৯৩৫ সালে) লাহোরে শিখদের সহিত কবির ঘনিষ্ঠতা হয়। 'গুরুগোবিন্দ' কবিতা লইয়া তাহাদের যে ক্ষোভ ছিল তাহা নিরাকৃত হইল, আকালী পত্রিকায় কবির বক্তব্য প্রকাশিত হইল। রবীন্দ্রনাথের ঋষিকল্প মূর্তি, তাঁহার শিষ্টাচারে শিখরা মুগ্ধ; একদিন গুরুদ্বারে কবিকে তাহারা বিশেষভাবে সম্মানিত করিল।"[৬০]

ব্রাহ্মণ কবিতা -বিষয়ক বিতর্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ রবীন্দ্রজীবনীতে আছে।[৬১] একদল পণ্ডিত "বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি"— এই জবালা-উক্তির রবীন্দ্রনাথ-কৃত মর্মানুবাদ "যৌবনে দারিদ্র্যদুঃখে বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে, জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে, গোত্র তব নাহি জানি, তাত"— স্বীকার করেন না। তাদের বক্তব্য এই যে, প্রাচীন কালে বিধিবহির্ভূত যৌনসম্পর্ক নিয়ে ঢাকাঢাকি করবার প্রথা বা প্রয়োজন ছিল না, সব কথাই খুলে বলা হয়েছে— পুরাণাদিতে এমন অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু ছান্দোগ্যোপনিষদের কোনো টীকাতে রবীন্দ্র-ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় না। কেন? তার কারণ নিশ্চয় তাঁরা কেউ রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিত জবালার উক্তিতে দেখতে পান নি। পূর্বতন টীকায় ও রবীন্দ্র-টীকায় কখনো মীমাংসা হবে আশা করা যায় না, কেননা ব্যাকরণ ও ভাষার চেয়ে গভীরতর স্থানে এই প্রভেদের মূল। আর এ সাহিত্যেতর বিষয়ের মীমাংসা করবার দায়িত্ব সাহিত্য-সমালোচকের উপরে অবশ্যই নয়।

সমাজ ও রাজনীতি যখন সাহিত্যের উপরে হস্তক্ষেপ করে তখন কি বিড়ম্বনা ঘটে বর্তমান প্রসঙ্গ তার একটি শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ। সমাজ রাজনীতি ও ধর্ম প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্য ও শিল্পের উপরে মুরুব্বিয়ানা করে আসছে সত্য, কিন্তু যে যুগে আমরা এসে পৌঁচেছি তখন এই-সব মুরুব্বিদের মধ্যে রাজনীতির হাতে একসঙ্গে দণ্ড ও প্রলোভনের ভার ন্যস্ত। বেচারা সাহিত্যের পক্ষে উভয়সংকট কাটিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে পথ চলা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো বহুমানভাজন বিশ্বখ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির উপরেও মুরুব্বি গদা চালাতে ত্রুটি করে নি। এই ঘটনাটি সামাজিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবার যোগ্য।

---

৫৯ "কণিকা, কথা, কাহিনী", রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড।

৬০ "উত্তর-ভারতে। ১৯৩৫", রবীন্দ্রজীবনী, চতুর্থ খণ্ড।

৬১ "সাধনার সম্পাদক", রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড।

এবারে উপসংহার। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নন, আর কথা কাব্যও ইতিহাস নয়— তৎসত্ত্বেও এই কাব্যখানি থেকে বাঙালী সন্তান সুকুমার বয়সে ইতিহাসের প্রথম পাঠ নিয়ে আসছে বললে অন্যায় হবে না। আর তার ফলে বাঙালীর ইতিহাসজিজ্ঞাসা বহুল পরিমাণে কথা কাব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও অনুরঞ্জিত হয়েছে। এ দিক দিয়ে বিচার করলে, পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত থেকে অজ্ঞাতসারে বাঙালী-সমাজের দৃষ্টিপরিচালনায় এবং মতামত-গঠনে কাব্যখানির স্থান খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমূহের মধ্যে প্রথম সারিতে। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে, রাজপুত মারাঠা ও শিখ সম্বন্ধে শিক্ষিত সাধারণ বাঙালী আজ যে মত পোষণ করে তার অনেকটাই কথা কাব্যের প্রভাব-জাত। এ প্রভাবের ব্যাপকতা ও গভীরতা নিয়ে আলোচনা হলে দেখা যাবে যে, এ ক্ষেত্রে সে প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবের চেয়ে কম নয়, খুব সম্ভব বেশি। এর একটি কারণ, যে সময়ে কথা কাব্যের কবিতাগুলি লিখিত হচ্ছিল তখন কিছুকালের জন্য রবীন্দ্রনাথের মত ও দৃষ্টি দেশের মত ও দৃষ্টির সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। প্রবল জাতীয়তাবোধের সমতরঙ্গে তখন কবি ও পাঠক ভাসমান ছিল। তার পরে, কখনো কখনো ঘটনা-বিশেষকে উপলক্ষ ক'রে কবিতে ও সাধারণে মিল হয়েছে বটে, তবে সামগ্রিকভাবে আর স্থায়ী মিল ঘটে নি। কাজেই বলা যেতে পারে কথা কাব্যের রাজপুত মারাঠা ও শিখ ইতিহাসের কবিতাগুলো কেবল একক কবির সৃষ্টি নয়, তার পিছনে ছিল সমস্ত সমাজের তাগিদ ও প্রেরণা। এ বিষয়ে আগে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে, কাজেই অতিবিস্তারের মধ্যে না গিয়ে অন্য প্রসঙ্গে প্রবেশ করা যেতে পারে।

কথা কাব্যের কবিতাগুলোকে বিষয়ানুসারে দুই খণ্ডে সাজানো চলে। একটি খণ্ডে বৈদিক ও বৌদ্ধ পুরাণের আমলের কবিতাগুলো— আর-এক খণ্ডে রাজপুত মারাঠা ও শিখ সমাজের কবিতাগুলো; মাঝখানে আছে ভক্তমালের কবিতা-তিনটি, যাদের নায়ক ঐতিহাসিক ব্যক্তি বটে, তবে বিষয়টা ঐতিহাসিক নয়, নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক খণ্ডের মধ্যে ভক্তমালের কবিতা-তিনটি সেতুর মতো, পুরাণ থেকে ইতিহাসে প্রবেশের পথে। এইভাবে দেখলে ও সাজালে কবিতাগুলোর মধ্যে বেশ স্পষ্ট একটা pattern দেখতে পাওয়া যায়— পুরাণ, ইতিহাসমুখ এবং ইতিহাস। তবে খুব সম্ভব এ pattern রচনা কবির সচেতন প্রয়াস নয়, অন্তর্নিহিত ভাবের প্রেরণায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নিয়মে এই patternটিও গঠিত হয়ে উঠেছে।

আমরা এখানে ঐতিহাসিক খণ্ডের আলোচনা করব, কারণ তার মধ্যে পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণা, যা জানবার বিশেষ প্রয়োজন আছে; কেননা, ঐতিহাসিক না হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ধারণাকেই শিক্ষিত সমাজ গ্রহণ করেছে, এমন-কি অনেক ঐতিহাসিকেও। কবির সে ধারণার মুখ্য আকর কথা কাব্য, গৌণ আকর প্রবন্ধ। যে বিষয়ে কাব্যে ও প্রবন্ধে অর্থাৎ সৃষ্টিপ্রেরণায় ও সচেতন চিন্তায় মিল দেখতে পাওয়া যাবে সে বিষয়টিকে কবির সুদৃঢ় ধারণা বলে অনায়াসে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই আলোচনায় আমাদের প্রধান সহায় ইতিহাস নামে প্রকাশিত কবির প্রবন্ধসমষ্টি, যার সাহায্য গোড়া থেকেই অনেকবার গ্রহণ করতে হয়েছে।

ঐতিহাসিক খণ্ডে আছে রাজপুত মারাঠা ও শিখ সম্প্রদায়ের কাহিনী। রাজস্থানের যে সময়ের

কথা কবি লিখেছেন তখন তার গৌরবের যুগ অন্তর্হিত। পদ্মিনী, প্রতাপ সিংহ, রাজ সিংহ প্রভৃতি ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন, তখন চলছে রাজপুত-জীবন-সন্ধ্যা। তবু সেই অন্ধকারের মধ্যেও এখানে ওখানে চোখে পড়ে রতনরাও-এর ন্যায়নিষ্ঠা, চোখে পড়ে নকল গড় ধ্বংসের প্রহসনে বাধা দিতে গিয়ে বীর কুম্ভের প্রাণোৎসর্গ, বীরের ধর্মে প্রভুর কর্মে বিরোধ মেটাবার উদ্দেশ্যে দুর্গদ্বারে শয়ান দুমরাজের প্রাণহীন দেহ, কানে শুনতে পাওয়া যায় বিবাহ-মণ্ডপ ত্যাগ ক'রে রণক্ষেত্রে ধাবমান সেনাপতির অশ্বক্ষুরধ্বনি। এ-সব হলদিঘাটের যুদ্ধ বা রন্ধ্রমুখরোধকারী রাজসিংহের বীর্যকৌশল নয়, কিন্তু বীরত্বের যে বিরাট শিলাখণ্ডে রাজপুত-ইতিহাস গঠিত, এ-সমস্ত তারই ভগ্নাবশেষ নিঃসন্দেহ। এই-সব কাহিনী বর্ণনা উপলক্ষে কবি হয়তো বলতে চেয়েছেন যে সার্বিক গৌরবযুগ গত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত গৌরবের জের চলতে থাকে। কিন্তু ঠিক কি বলতে চেয়েছেন জোর করে বলবার উপায় নেই, কেননা রাজস্থানের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি ভাষ্য বা মন্তব্য করেন নি, করেছেন শিখ ও মারাঠা ইতিহাস সম্বন্ধে। রূপান্তরে তিনি যদি রাজপুত-জীবন-সন্ধ্যা বিবৃত করে থাকেন তবে আবার রূপান্তরে বিবৃত করেছেন মহারাষ্ট্র-জীবন-প্রভাত, সেই সঙ্গে শিখ সম্প্রদায়েরও। নব-অভ্যুদিত মহারাষ্ট্র ও শিখ সম্প্রদায়কে নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ কবি লিখেছেন, আর তা থেকে কেবল তাদের সম্বন্ধে নয় সাধারণভাবে জাতীয় পতন-অভ্যুদয় সম্বন্ধেও কবির বক্তব্য জানতে পারা যায়— এই জানাটির বিশেষ প্রয়োজন আছে গোড়ায় বলেছি। যথাসাধ্য তাই ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব।

কিন্তু তার আগে মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথের মন কবির ও তাত্ত্বিকের মন, ঐতিহাসিক বা সংখ্যা-তাত্ত্বিকের মন নয়। এ মনের গতি ভাব থেকে রূপে, রূপ থেকে ভাবে নয়; এ মন দিব্য অন্তর্দৃষ্টির বলে আইডিয়া ও সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, ঐতিহাসিকের পদাতিক মনের মতো ধীর পদক্ষেপে তথ্যের ভূমি সংক্রমণ ক'রে রূপ থেকে ভাবে এবং তথ্য থেকে তত্ত্বে পৌঁছয় না। রবীন্দ্রনাথের তাত্ত্বিক মন বলে যে শিখরা "যতোধর্মস্ততো জয়ঃ এ মন্ত্র ভুলিয়া গেল",...এবং তার ফলে "শিখজ্যোতিষ্ক ক্ষণকালের জন্য জ্বলিয়া ক্ষণকালের মধ্যে নিবিয়া গেল।"

এ সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিকগণ যদি বা স্বীকার করেন, তবু যে প্রক্রিয়ায় কবি-মন এ সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে সে প্রক্রিয়া খুব সম্ভব ঐতিহাসিক-রীতি-সম্মত নয়। কেননা, যদিচ ধর্ম শব্দটা অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক, ব্যাখ্যা ক'রে তার মধ্যে ঢোকানো যায় না এমন বস্তু অল্পই আছে, তবু নৈসর্গিক কারণকে ধর্মের অন্তর্গত করা যায় কি না সন্দেহ। নদী শুকিয়ে গিয়ে, মরুভূমি এগিয়ে এসে, হিমাঙ্ক দু-চার ডিগ্রি নেমে প'ড়ে, কিংবা সমুদ্রের জল ফেঁপে উঠে অনেক দেশ, অনেক সভ্যতার ধ্বংসের কারণ ঘটিয়েছে। এ-সব স্থানেও কি যতোধর্মস্ততো জয়ঃ নীতি প্রযোজ্য? ইসলামের প্রতিক্রিয়ায় বাবা নানকের ধর্মপ্রচার আর মোগল বাদশাদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় গুরুগোবিন্দের শিখ সম্প্রদায়কে সৈন্যদলে পরিণতকরণ। দুটোই ইতিহাসের প্রতিক্রিয়া। একটির মধ্যে ধর্মের সদ্‌ভাব থাকতে পারে কিন্তু অন্যটির মধ্যে তার অভাব কল্পনা ঐতিহাসিকের কাজ নয়। বাবা নানক ও গুরুগোবিন্দ দুজনকেই ইতিহাস যখন যেমন প্রয়োজন ছিল তেমনি রূপ দিয়েছে, একজনকে করেছে সাধক অন্যজনকে করেছে সৈনিক। দুটোই যুগধর্মের

ফল। আর ধর্মের স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে যুগধর্মের স্থান যদি হয় তবে গুরুগোবিন্দের ফৌজ যতোধর্মস্ততো জয়ঃ ভুলে গিয়েছিল এ কথা বলা চলে কি? বস্তুতঃ আত্মরক্ষা যদি ধর্মের অঙ্গ হয় তবে শিখ সৈনিকগণকে ধর্মচ্যুত বলা যায় না, বরঞ্চ বলতে হয় যে মোগল বাদশাদের অত্যাচার ও আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ক'রে তারা আত্মরক্ষারূপ ধর্মকেই রক্ষা করছিল।

"নানক-শিষ্যেরা আজ যুদ্ধ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদল ফৌজে ঢুকিয়া কখনো কাবুলে, কখনো চীনে, কখনো আফ্রিকায় লড়াই করিয়া বেড়াইবে, নানকের ধর্মতেজে উদ্দীপ্ত উত্তরবংশীয়দের এই পরিণামই যে গৌরবজনক, এমন কথা আমরা মনে করিতে পারি না।"[৬২]

নানক-শিষ্যেরা যে কাবুলে চীনে আফ্রিকায় যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে তার মূলে নানকের শিক্ষার অভাব নয়। দেশ পরাধীন হয়ে পড়েছিল, তাই অসহায় ভাবে তারা প্রভুর আজ্ঞা পালন করতে বাধ্য হয়েছে। এখন তারা স্বাধীন দেশের নাগরিকরূপে যুদ্ধ করছে। নিশ্চয় সেটা নিন্দনীয় নয়। পাঞ্জাবে গুরুগোবিন্দ এবং মহারাষ্ট্রে শিবাজী প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি না করলে ঐ-সব অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী ধর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হত, নানকের এবং মহারাষ্ট্রের ধর্মগুরুদের শিক্ষা তাদের বাধা দিতে পারত না বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। মধ্যযুগে দেশের অন্য অনেক অঞ্চলে অনেক ধর্মগুরু ধর্মপ্রচার করেছেন, তাঁদের শিষ্যসম্প্রদায় তৈরি হয়ে উঠেছে, তারা ফৌজে পরিণত হয়েছে এমন কথা কেউ বলবে না, কিন্তু তার ফলে ঐহিক ও পারত্রিক ক্ষেত্রে সেই-সব শিষ্যসম্প্রদায় অনুসরণযোগ্য মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে এমন মনে করবার কারণ নেই। কোনো কোনো অঞ্চলে ধর্মান্তরিতের সংখ্যা হয়েছে সব চেয়ে বেশি, আবার কোনো কোনো অঞ্চল কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে সর্বপ্রথম তাদের কুক্ষিগত হয়েছে। অপর পক্ষে পাঞ্জাবে ও মহারাষ্ট্রে ইংরেজকে সব চেয়ে কঠিন যুদ্ধ করতে হয়েছে—আর এই দুই অঞ্চল ইংরেজের পরাধীন হয়েছে সব শেষে। এ-সব সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক তথ্য। কাজেই বলা চলে না যে গুরুগোবিন্দ ও শিবাজীর শিক্ষায় দেশের কেবলই ক্ষতি হয়েছে, বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে যে ধর্মগুরুদের শিক্ষায় যাদের বাঁচাতে অক্ষম হয়েছিল এই দুই বীর পুরুষের শিক্ষা তাদের স্বাধীন সামাজিক সত্তাকে অনেক কাল পর্যন্ত রক্ষা করেছিল; শেষ পর্যন্ত যে পারে নি তার কারণ ইতিমধ্যে আর-এক বড়ো খেলোয়াড় ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এসে হাজির হয়েছিল। ভারতের সেই আঠারো শতকের ভাগাভাগির লাঠালাঠির সামনে সর্বজন-অনুসৃত নীতি ছিল জোর যার মুল্লুক তার, ধর্মের স্থিতিস্থাপকতা যতই বাড়ানো যাক-না কেন, ধর্মের কোনো স্থান বা মর্যাদা ছিল, মনে হয় না। যদি স্বীকার করা যায় যে ধর্ম বিস্মৃত হয়েছিল বলেই দেশ পরাধীন হয়েছিল তবে সেই সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগে, যারা জয়ী হল সেই ইংরেজ কোন্ ধর্মনীতি অনুসরণ করেছে? রাজনীতির দাবা খেলায় ভারতীয়দের চেয়ে তারা অনেক বড় ওস্তাদ ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু তাদের জয়কে যতোধর্মস্ততো জয়ের উদাহরণরূপে

---

৬২ "শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ", ইতিহাস।

নিশ্চয় দেখানো যায় না। অতএব যতোধর্মস্ততো জয়ঃ নীতি যে ইতিহাসের মধ্যে ব্যাপকভাবে সক্রিয় এ কথা বোধ করি স্বীকার করা যায় না।

ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর-একটি ধারণা এই যে, আদর্শ শাসককে সাধক হতে হবে। রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই— এ তাঁর একটি বহুব্যবহৃত উক্তি। খুব সম্ভব শাসক-সাধক বা রাজসন্ন্যাসীর দৃষ্টান্ত রূপেই তিনি শিবাজী ও গুরুগোবিন্দর চরিত্র বেছে নিয়েছেন আর সেই ভাবেই তাঁদের চিত্রিত করেছেন প্রতিনিধি ও গুরুগোবিন্দ কবিতা-দুটিতে। কবিতা-দুটির বর্ণনার মধ্যেই যদি বীরদ্বয়ের কীর্তি ও কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ হত তবে এ কথা সত্য হত। কিন্তু ইতিহাস যেমন নির্মম তেমনি নিরপেক্ষ। গুরুগোবিন্দ যমুনার তীরে বনে কেবলই সাধনা করেছেন আর ধর্মচর্চা করেছেন ইতিহাস এমন বলে না, তৎকালীন রাজনীতিতে দাবা খেলার সমস্ত চাল দেবার জন্যেই তাঁকে হস্ত প্রসারিত করতে হয়েছে। "In the hills of North Panjab, Govinda passed most of his life, constantly fighting with the hill Rajahs from Jammu to Srinagar in Garhwal, who were disgusted with his followers' violence and scared by his ambition".[৬৩]

গুরুগোবিন্দর আর-এক দিক উপরের বর্ণনা, আর দুয়ের যোগদানে ঠিক শাসক-সাধক বা রাজসন্ন্যাসীর মূর্তি অঙ্কিত করে না। আবার শিবাজীর চরিত্রও প্রতিনিধি কবিতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। অনেক কাজ তাঁকে করতে হয়েছে যা শাসক-সাধক বা রাজসন্ন্যাসীর যোগ্য নয়। তৎসত্ত্বেও এ কথা নিঃসন্দেহ যে, তাঁরা দুজনেই ভারতীয় ইতিহাসের দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষ; তৎকালীন ইতিহাসের অভিপ্রায়ের প্রতীক বা বহিঃপ্রকাশ রূপেই তাঁদের দেখতে চেষ্টা করা উচিত, শাসক-সাধক বা রাজসন্ন্যাসী রূপে নয়, কারণ এমন গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো কোনো রাজসিংহাসনে বসেছেন কি না সন্দেহ। তবে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের এ ভাবে চিত্রিত করেছেন তার কারণ, যখন তিনি এ-সব কবিতা লিখছিলেন সেই জাতীয়তাবোধোন্মেষের প্রথম প্রভাতে দেশের চিত্ত ইতিহাসের মধ্যে বের হয়ে পড়েছিল আদর্শ বীরের সন্ধানে, মনের মতো লোক পেতেই তাকে কল্পনার রাজহস্তীর পিঠে চাপিয়ে তূরীভেরীর সমারোহে নিয়ে এসে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে। সমসাময়িক সাহিত্য অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে অনেক অপদার্থ এইভাবে কিছুকাল সিংহাসনের দাবিদার হয়েছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অপদার্থের অভিষেক সম্ভব নয়। তিনি যাঁদের জাতীয় চিত্তের সিংহাসনে বসাতে চেষ্টা করেছেন তাঁরা যথার্থ বীরপুরুষ এবং জাতীয় প্রতিরোধের প্রতীক।

তাঁরা দুজনেই সপ্তদশ শতকের দোষেগুণে মানুষ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের ধারণার সঙ্গে তাঁদের যোগ নেই। তাই

একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।

---

৬৩ *The History of Aurangzib*, Vol. III, Ch. XXXV.

কিংবা

তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।

এই-সব ধারণা তৎকালীন নয়, কবির সমকালীন— কবির কাল ও চিত্ত যে স্বপ্ন দেখছিল, কবির কল্পনা ও লেখনী তাকেই জীবন্ত রূপ দান করেছে। দূরকালের উপরে পরবর্তীকালের এই প্রলেপকেই বোধ করি বলে "reading history backward." কবি ও দার্শনিকগণ এইভাবেই ইতিহাস পাঠ করতে অভ্যস্ত।

সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-ধারণা আলোচনার স্থান এখানে নয়, কথার কতকগুলি কবিতাকে অবলম্বন করে তাঁর যে ইতিহাস-ধারণা প্রকাশিত হয়েছে এখানে কেবল তারই আলোচনা চলতে পারে। তা ছাড়া মনে রাখতে হবে যে স্বভাবতঃ-বিবর্তনশীল কবি-মনের সময়-বিশেষের ধারণাকে কবির চূড়ান্ত ধারণা বলে গ্রহণ করা নিতান্ত অনুচিত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ইতিহাসের মধ্যে যতোধর্মস্ততো জয়ের লীলা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা হয়তো শেষ জীবনে অপরিবর্তিত ছিল না। সংসারে অধর্মের জয় হয় এ কথা স্বীকার না করলেও ধর্ম যে সব সময়ে জয়ী হয় খুব সম্ভব এ বিষয়ে তাঁর মনে সংশয় জেগেছিল। কাজেই কথা কাব্যে প্রকাশিত কবির ধারণাকে চূড়ান্ত ধারণা মনে না ক'রে উক্ত কাব্য রচনা-কালীন ধারণা বলেই গ্রহণ করতে হবে। যথাসাধ্য তাই দেখাবার চেষ্টা করেছি।

এখানেই আমাদের আলোচনার শেষ। কথার মতো মনোহর কাব্যের আলোচনা মনোহর হল না তার একটি কারণ, আগেই বলেছি, এ আলোচনা রসের আলোচনা নয়, আখ্যায়িকা বা বস্তুর আলোচনা। এ জিনিস স্বভাবতই নীরস, তবু হয়তো তার প্রয়োজন আছে। তাজমহলের রসের সাধনাকে ধারণ ক'রে রয়েছে যে-সব পাথর সেগুলো নিশ্চয় এই বস্তুবিচারের মতোই কঠিন ও নীরস। রসের ভিত্তি নীরসতা।

পরিশিষ্ট ক

উপনিষদ থেকে গৃহীত

১ ব্রাহ্মণ

বৌদ্ধ পুরাণ থেকে গৃহীত

২ শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

৩ মস্তকবিক্রয়

৪ অভিসার

৫ পরিশোধ

৬ সামান্য ক্ষতি

৭ মূল্যপ্রাপ্তি

৮ নগরলক্ষ্মী

৯ পূজারিনী

ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে গৃহীত

১০ অপমানবর
১১ স্বামীলাভ
১২ স্পর্শমণি

রাজপুত-ইতিহাস থেকে গৃহীত

১৩ মানী
১৪ রাজবিচার
১৫ নকল গড়
১৬ হোরি খেলা
১৭ বিবাহ
১৮ পণরক্ষা

মারাঠা-ইতিহাস থেকে গৃহীত

১৯ প্রতিনিধি
২০ বিচারক

শিখ-ইতিহাস থেকে গৃহীত

২১ বন্দী বীর
২২ প্রার্থনাতীত দান
২৩ গুরুগোবিন্দ
২৪ শেষ শিক্ষা

কাহিনী অংশে

২৫ নিষ্ফল উপহার

পরিশিষ্ট খ

১৮৮৮

গুরুগোবিন্দ। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫
নিষ্ফল উপহার। ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

১৮৯৫

ব্রাহ্মণ। ৭ ফাল্গুন ১৩০১

১৮৯৭

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা। ৫ কার্তিক ১৩০৪
প্রতিনিধি। ৬ কার্তিক ১৩০৪
মস্তকবিক্রয়। ২১ কার্তিক ১৩০৪

১৮৯৯

পূজারিনী। ১৮ আশ্বিন ১৩০৬
অভিসার। ১৯ আশ্বিন ১৩০৬
পরিশোধ। ২৩ আশ্বিন ১৩০৬
সামান্য ক্ষতি। ২৫ আশ্বিন ১৩০৬
মূল্যপ্রাপ্তি। ২৬ আশ্বিন ১৩০৬
নগরলক্ষ্মী। ২৭ আশ্বিন ১৩০৬
অপমানবর। ২৮ আশ্বিন ১৩০৬

স্বামীলাভ। ২৯ আশ্বিন ১৩০৬
স্পর্শমণি। ২৯ আশ্বিন ১৩০৬
বন্দী বীর। ৩০ আশ্বিন ১৩০৬
মানী। ১ কার্তিক ১৩০৬
প্রার্থনাতীত দান। ২ কার্তিক ১৩০৬
রাজবিচার। ৪ কার্তিক ১৩০৬
শেষ শিক্ষা। ৬ কার্তিক ১৩০৬
নকল গড়। ৭ কার্তিক ১৩০৬
হোরি খেলা। ৯ কার্তিক ১৩০৬
বিবাহ। ১১ কার্তিক ১৩০৬
বিচারক। ৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬
পণরক্ষা। অগ্রহায়ণ ১৩০৬

দেড় মাসের মধ্যে উনিশটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতা কি এর চেয়ে বেশি!

পরিশিষ্ট গ

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললে,
"ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করব, কী গোত্র আমার?"
তিনি বললেন, "জানি নে, তাত, কী গোত্র তুমি।
যৌবনে বহুপরিচর্যাকালে তোমাকে পেয়েছি,
তাই জানি নে তোমার গোত্র।
জবালা আমার নাম, তোমার নাম সত্যকাম,
তাই বোলো তুমি সত্যকাম জাবাল।"

সত্যকাম বললে হারিদ্রুমত গৌতমকে,
"ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মচর্যে উপনীত করুন।"
তিনি বললেন, "সৌম্য, কী গোত্র তুমি?"
সে বললে, "আমি তা জানি নে।
মাকে জিজ্ঞাসা করেছি আমার গোত্র কী।
তিনি বলেছেন, 'যৌবনে যখন বহুপরিচারিণী ছিলেম,
তোমাকে পেয়েছি।

আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম,
বোলো আমি সত্যকাম জাবালা'।"
তিনি তখন বললেন, "এমন কথা অব্রাহ্মণ বলতে পারে না।
সত্য থেকে নেমে যাও নি তুমি।
সমিধ্ আহরণ করো সৌম্য, তোমাকে উপনীত করি।"[১]

পরিশিষ্ট ঘ

The triumphal entry with the prisoners took place on the 17th Rabi I, 1128 (10th March, 1716). The road from Agharabad to the Lahori Gate of the palace, a distance of several miles, was lined on both sides with troops. Banda sat in an iron cage placed on the back of an elephant. He wore a long heavy-skirted Court dress (Jama) of gold brocade, the pattern on it being of pomegranate flowers, and a gold embroidered turban of fine red cotton cloth. Behind him stood, clad in chain mail, with drawn sword in hand, one of the principal Mughal officers. In front of the elephant were carried, raised on bamboo poles, the heads of Sikh prisoners who had been executed, the long hair streaming over them like a veil. Along with these, the body of a cat was exposed at the end of a pole, meaning that, even down to four-footed animals, everything in Gurdaspur had been destroyed. Behind the Guru's elephant followed the best of the prisoners, seven hundred and forty in number. They were seated, two and two, on camels without saddles. One hand of each man was attached to his neck by two pieces of wood, which were held together by iron pins. On their heads were high caps of a ridiculous shape made of sheep's skin and adorned with glass beads. A few of the principal men, who rode nearest to the elephant, had been clothed in sheep's skin with the woolly side outwards, so that the common people compared them to bears. When the prisoners had passed, they were followed by the Nawab Mhd. Amin Khan Chin, accompanied by his son, Qamr-ud-din Khan and his son-in-law, Zakaria Khan. In this order the procession passed on through the street to the palace.

The streets were so crowded with spectators that to pass was difficult. Such a crowd had been rarely seen. The Muhammadans could hardly contain themselves for joy. But the Sikhs, in spite of the condition to which they had been reduced, maintained their dignity and no sign of dejection or humility could be detected on their countenances. Many of them, as they passed

---

১ সত্যকাম-জবালার কবিকৃত গদ্যছন্দে রূপান্তর। "সম্পূরণ", ছন্দ।

along on their camels, seemed happy and cheerful. If any spectator called out to them that their evil deeds and oppressions had brought them where they then were, they retorted, without a moment's hesitation, in the most reckless manner. They were content, they said, that fate had willed their capture and destruction. If any man threatened that he would kill them then and there, they shouted, "Kill us, kill us, why should we fear death? It was only through hunger and thirst that we fell into your hands. If that had not been the case, you know already what deeds of bravery we are capable of."

By the Emperor's order the Guru Banda, with Taj Singh and another leader, was made over to Ibrahim-ud-din Khan, Commander of the artillery, and they were placed in prison at the Tirpoliya or Triple Gate. The Guru's wife, his three-year-old infant, and the child's wetnurse, were taken by Darbar Khan, the nazir, and placed in the harem. With the exception of between twenty and thirty of the chief men, who were sent to prison with Guru, the remaining prisoners were made over for execution to Sarbarah Khan, the city "Kotwal" or head of the police. The work began at the "chabutra" or chief police office, on the 22nd Rabi I (15th March, 1716), and one hundred men were executed every day for a week. All observers, Indian and European, unite in remarking on the wonderful patience and resolution with which these men underwent their fate. Their attachment and devotion to their leader were wonderful to behold. They had no fear of death, they called the executioner "Mukt", or the Deliverer, they cried out to him joyfully "O Mukt! kill me first!" Everyday one hundred victims met their fate and artificers were kept in attendance to sharpen the executioner's swords. After the heads had been severed from the bodies, the bodies were thrown into a heap, and at nightfall they were loaded into carts, taken out of the city, and hung up on the trees.

At length on the 29th Jamadi II, 1128 (19th June, 1716) Banda and his remaining followers were led out to execution. The rich Khatris of the city, who were secretly favourable to his tenets, had offered large sums for his release. But all these offers were rejected. The execution was entrusted to Ibrahim-ud-din Khan, the kotwal. The Guru, dressed as on the day of his entry, was again placed on an elephant and taken through the streets of the old city to the shrine of Khawaja Qutb-ud-din Bakthiyar Kaki, and there paraded round the tomb of the Emperor Shah Alam Bahadur Shah. After he had been made to dismount and was seated on the ground, his young son was put into his arms and he was told to take the child's life. He refused. Then the executioner killed the child with a long knife, dragged

out its liver, and thrust it into the Guru's mouth. His own turn came next. First of all his right eye was removed by the point of a butcher's knife, next his left foot was cut off, then his two hands were severed from his body, and finally he was decapitated. His companions were also executed at the same time. His wife was made a Muhammadan and given to Dakhini Begum, the Emperor's maternal aunt.[২]

পরিশিষ্ট ৬

Rugonath Rao was suspected, but there was no proof of his being the author of the outrage. It was well known that he had an affection for his nephew, and the ministers, considering the extreme jealousy with which many of them viewed each other, are entitled to some praise for having adopted a resolution on the occasion equally sound and politic. They were generally of opinion that, whilst there remained a shadow of doubt, it was on every account advisable to support Rugoba's right to the succession ; to this Ram Shastree, who was consulted, made no objections, but diligently instituted a search into the whole transactions. About six weeks after the event, having obtained proofs against Rugonath Rao, the Shastree waited upon him and accused him of having given an authority to Somer Sing and Mohummud Yusoof to commit the deed. Rugonath Rao is said to have acknowledged to Ram Shastree that he had written an order to those men, authorizing them to seize Narrain Rao, but that he had never given the order to kill him. This admission is generally supposed to have been literally true ; for by the original paper, afterwards recovered by Ram Shastree, it was found that the word *dhurawe,* to seize, was altered to *marawe,* to kill. It is universally believed that the alteration was made by the infamous Anundee Bye ; and although Rugonath Rao's own conduct, in subsequently withholding protection even at the hazard of his life, sufficiently justifies the suspicion of his being fully aware of it, the moderate and general opinion in the Mahratta country is that he did not intend to murder his nephew ; that he was exasperated by his confinement, and excited by the desperate counsels of his wife, to whom is also attributed the activity of the domestic, Truleea Powar, who was set on by the vindictive malice of that bad woman.

After Rugonath Rao had avowed his having so far participated in the fall of his nephew, he asked Ram Shastree what atonement he could make. 'The

---

২ W. Irvine, *The Later Mughals,* Vol. I, Ch. IV.

sacrifice of your own life', replied the undaunted and virtuous Shastree, 'for your future life cannot be passed in amendment ; neither you nor your government can prosper ; and for my own part I will neither accept of employment nor enter Poona, whilst you preside in the administration.' He kept his word, and retired to a sequestered village near Waee.[৩]

---

৩ Grant Duff, *The History of the Maratha People,* Vol. II.

রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা : কালানুক্রমিক সূচী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রজীবনী লিখিবার পূর্বে বহু বৎসর ধরিয়া কবির রচনার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলাম। প্রথমে সেগুলি একটি খাতায় তুলিয়া লই ; পরে আক্ষরিকভাবে সাজাইয়া তাহাতে কবির প্রত্যেকটি রচনার আনুপূর্বিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করি।
নিম্নে ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৮ সাল পর্যন্ত ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার তালিকা প্রদত্ত হইল।

১৮৬৮। রবীন্দ্রনাথের কবিতারম্ভ

"আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়ো।··· একদিন দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, 'তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।' বলিয়া, পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।··· এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে, এ কথা কল্পনা করিতেও সাহস হইত না।··· ভয় যখন একবার ভাঙিল তখন আর ঠেকাইয়া রাখে কে। কোনো-একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীল কাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেন্‌সিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিয়া দিলাম।"—জীবনস্মৃতি

শিশুকালে যে-সব কবিতা ও ছড়ার মতো পদ্য রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন, স্মৃতি হইতে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃতি আছে অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' গ্রন্থে। কবির 'ছেলেবেলা' বইটিতেও তার চিহ্ন পাওয়া যায়। আমরা সে পর্বের মধ্যে প্রবেশ করিব না ; কবির অ-নামে, নিজনামে, বেনামে যা রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে তাহারই আলোচনায় আমরা সীমিত থাকিব।

কালানুক্রমিক রচনার তালিকা প্রস্তুত করার কয়েকটি গুরুতর বাধা আছে : প্রথমত, তাঁর আদিযুগের রচনার সন-তারিখ পাওয়া যায় না ; এমন-কি, যে-সবের পাণ্ডুলিপি মহাকালের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, সেগুলিতেও সর্বত্র রচনার তারিখ প্রদত্ত হয় নাই। দ্বিতীয়ত, জীবনস্মৃতি বা অন্যান্য রচনার মধ্যে কবি তাঁহার কৈশোরের অনেক কবিতা ও গানের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল অনেক পরে। সন-তারিখ সম্বন্ধে কবি সর্বদা যে খুব সতর্ক ছিলেন তা বলা যায় না। কখনো কখনো ইংরেজি সন ও বাংলা মাস-তারিখ দিতে দেখি। ইচ্ছা করিয়া কখনো কখনো রচনাকাল দিতেন না। সেইজন্য আমরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি তাহা সংক্ষেপত এই—

কবির নিজগ্রন্থে অথবা অন্য সমসাময়িক লেখকের রচনার মধ্যে কবির রচনার সময় যদি উল্লিখিত থাকে, এবং তাহা যদি অন্যান্য ঘটনার দ্বারা সমর্থিত হয়, তবেই আমরা সেটি গ্রহণ করিয়াছি। পাণ্ডুলিপির সন-তারিখ প্রামাণ্য হিসাবে অগ্রাধিকার পাইয়াছে। যেখানে রচনার তারিখ নাই সেখানে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত মাসকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি; কিন্তু যখন কোনো দুইটি রচনার মধ্যে ভাব-সামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি, অথচ একটিতে তারিখ নাই, অপরটিতে পত্রিকায় প্রকাশের মাস পাইতেছি, সে ক্ষেত্রে আমরা রচনা দুইটিকে কাছাকাছি রাখিয়াছি। পত্রিকায় মুদ্রিত না হইয়া যদি গ্রন্থে প্রথম মুদ্রিত পাই, তবে তাহাকে রচনার কাল বলিয়া গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই।

কবির কবিতা, গান, গদ্যরচনা, গল্প, উপন্যাস ও চিঠিপত্র— সবই কালানুক্রমিক সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এইভাবে সাজাইতে গিয়া দেখিলাম, যে-রচনার পটভূমি পাইতেছিলাম না, এই পদ্ধতিতে সেইটি পাইলাম।

কবির উপন্যাসগুলি পত্রিকায় মাসিক কিস্তিতে প্রকাশিত হইত; অধিকাংশ উপন্যাসই প্রতিমাসে লিখিয়া পাঠাইতেন— এ তথ্য আমরা তাঁহার চিঠিপত্রের মধ্যে পাই। সেইজন্য গ্রন্থাকারে পুস্তক-মুদ্রণ-কালে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। যাঁহারা স্রষ্টা ও সমালোচকের (creator and critic) সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে চান, তাঁহারা মাসিক পত্রে প্রকাশিত পাঠ ও মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ তুলনার অবসর পাইবেন।

কবির চিঠিপত্র বা পত্রাবলীর মধ্যে তাঁহার কাব্যের বা রচনার উৎস এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাষ্য পাইয়া থাকি; সেইজন্য চিঠিপত্র ও অন্যান্য রচনা কালানুক্রমিক সজ্জিত হওয়ায়, তথ্য ও তত্ত্বের সামঞ্জস্য-সাধন আংশিক ভাবে সম্ভব হইতে পারে। যুগপৎ কবির জীবনের ঘটনাবলী এবং পারিবারিক ও সামাজিক ঘটনার কথা যদি দেওয়া সম্ভব হইত, তবে রচনার পটভূমি আরো স্পষ্ট হইত।

প্রত্যেক লেখক প্রতি মুহূর্তের রচনায় সার্থক; আঠারো বৎসর বয়সের রচনা সেই বয়সেরই উপযুক্ত; সেই বয়সের রচনাকে যদি কালানুক্রমে সেখানেই পাই, তবে সেগুলিকে আঠারো বৎসরের মানেই বিচার করিব। তাহা না করিয়া যদি প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়সের রচনার সঙ্গে সেগুলিকে সমশ্রেণীয় করিবার প্রচেষ্টা হয়, তাহা হইলে সে পদ্ধতি বা দৃষ্টিকে কবির প্রতি সুবিচার বলিয়া মনে করিতে পারি না। রচনার সহিত ঘটনার মন্থন হইতেই জীবনী উৎসৃত হয়।

কবির বাল্যকালের রচনা অধিকাংশই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 'কোনো-একটি কর্মচারীর কৃপায়' যে 'নীল কাগজের খাতা' জোগাড় করিয়াছিলেন, তাহা কিভাবে পূর্ণ হইল এবং কিভাবে উহা 'করুণাময়ী বিলুপ্তিদেবী কবে বৈতরণীর কোন্ ভাঁটার স্রোতে ভাসাইয়া' দিয়াছিলেন, তাহা কেহ জানে না।

দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে বালক রবীন্দ্রনাথ পিতার সহিত হিমালয়-যাত্রার পূর্বে বোলপুরে কিছুকাল বাস করিয়া যান। তখন 'সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীলখাতাটি বিদায় করিয়া একখানা বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারি সংগ্রহ' করিয়াছিলেন। 'এখন খাতাপত্র ও বাহ্য উপকরণের' দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে।

"বোলপুরে যখন কবিতা লিখিতাম, তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেলগাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালোবাসিতাম।··· তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তার উপযুক্ত বাহন সেই বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারিটিও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীল খাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারও কাছে রাখিয়া যায় নাই।" —জীবনস্মৃতি

আমাদের মনে হয়, আট বৎসর পরে (১৮৮১) পৃথ্বীরাজের কাহিনী 'রুদ্রচণ্ড' রূপে আবির্ভূত হয়।

হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বিদ্যাশিক্ষার নানা পরীক্ষার মধ্যে অন্যতম হইয়াছিল গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট ম্যাকবেথ ও কুমারসম্ভব পাঠ। জ্ঞানচন্দ্র বালক রবীন্দ্রকে ম্যাকবেথ কবিতার অনুবাদ করিতে বাধ্য করেন। "সেই অনুবাদের আর সকল অংশই হারাইয়া গিয়াছিল, কেবল ডাকিনীদের অংশটা অনেকদিন পরে বাহির হইয়াছিল।" (জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি)। ভারতী, ৩য় বর্ষ, ১২৮৭ আশ্বিন, পৃ. ২৯৩— সম্পাদকের বৈঠকের অন্তর্গত।

জ্ঞানচন্দ্র "আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া 'কুমারসম্ভব' পড়াইতে লাগিলেন।" "তিনসর্গ যতটা পড়াইয়াছিলেন তাহার আগাগোড়া সমস্তই আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।" (জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি, দ্র. পৃ. ৬০ ও ২৪৫)। রবীন্দ্রনাথ ইহার কোন্ অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন, সে কথা বলেন নাই, যেমন ম্যাকবেথের অনুবাদ সম্বন্ধে স্পষ্টত বলিয়াছেন।

যাই হোক, 'মালতীপুঁথি'তে কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গের ৪৩টি শ্লোকের অনুবাদ পাওয়া যায়। দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রগ্রন্থপরিচয় (২য় সং) পৃ. ৮১।

মালতীপুঁথিতে দুইটি পাঠ লইয়া শ্রীকানাই সামন্ত 'রবীন্দ্র-প্রতিভা' গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন (পৃ. ২৪৯-৫৫)।

ভারতী ১২৮৪ মাঘ সংখ্যায় সম্পাদকের বৈঠকের শেষে 'মদনভস্ম' নামে যে কবিতা মুদ্রিত আছে এবং যাহা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রগ্রন্থপরিচয়' গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ ৮১-৮৫) তাহা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে অনুবাদ মিলহীন চতুর্দশ পয়ারে করিয়াছিলেন, তাহা মালতীপুঁথিতে আছে (দ্র. রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা, পৃ. ৬৯-৭৬)। এইটি সংশোধন করিয়া যে রূপ হয় তাহা ভারতীতে প্রকাশিত হয় (১২৮৪ মাঘ) ; সুতরাং ঐ পাঠকে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ বলিয়া বিবেচনার কারণ নাই। এই অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথ কখন করেন জানা যায় না। তবে ১৮৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং কিছুকাল বালকদের পড়াইয়াছিলেন ; সেই সময়ে, আমার মনে হয়, জ্ঞানচন্দ্রের নিকট ইতিপূর্বে অধীত কুমারসম্ভবের যে তিনটি সর্গ রবীন্দ্রনাথ মুখস্থ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তৃতীয় সর্গটি বালক রবীন্দ্রকে অনুবাদ করিতে বলেন এবং সেই অনুবাদ ও সেই অনুবাদের উপর দ্বিজেন্দ্রনাথের শুদ্ধিকরণ মালতীপুঁথি-মধ্যে রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ মূলগত না হওয়ায় দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বয়ং অনুবাদ করিয়া বালকের সম্মুখে আদর্শ পেশ করেন,

সেইজন্য দুইটি পাঠই মালতীপুঁথি-মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে ১৮৭৪ সালের বসন্তকালে 'কুমারসম্ভব'এর 'মদনভস্ম' রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত হয়।

ম্যাক্‌বেথের অনুবাদ ১৮৭৩ সালের কোনো এক সময়ে জ্ঞানচন্দ্রের শাসনে বালক রবীন্দ্রকে করিতে হইয়াছিল। রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য তখন সংস্কৃতশিক্ষক; তিনি ম্যাক্‌বেথের অনুবাদ লইয়া রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করিলেন। কুমারসম্ভবের অনুবাদ তখনও প্রস্তুত হয় নাই, হইলে সংস্কৃতজ্ঞ রামসর্বস্ব সেটিও লইয়া যাইতেন।

ম্যাকবেথ পাঠের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ বালক রবীন্দ্র ৩৯ স্তবকের (৪ পংক্তির) 'অভিলাষ' নামে কবিতা রচনা করেন। ইহাতে লেখক-স্থলে আছে 'দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচনা'। ১৮৭৩ সালে যখন জ্ঞানচন্দ্রের নিকট 'ম্যাকবেথ' পড়িতেছিলেন, তাহার পর লিখিত হইলে লেখকের বয়স 'দ্বাদশবর্ষ' হয়; কিন্তু উহা যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৭৯৬ শক) ১২৮১ অগ্রহায়ণ (১৮৭৪ নভেম্বর) মাসে মুদ্রিত হয়, তখন বালকের বয়স ত্রয়োদশ বৎসর। এই কবিতার মধ্যে সদ্য ম্যাকবেথ-পাঠের প্রভাব রহিয়া গিয়াছে (২৪, ২৫, ২৬ স্তবক তুলনীয়)।

১৮৭৫ জানুয়ারিতে (১২৮১ মাঘ) ৪৫ সাংবৎসরিক মাঘোৎসবে ১১ই মাঘ সায়ংকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যে-সব সংগীত গীত হয় তন্মধ্যে 'গগনের থালে রবিচন্দ্রদীপক জ্বলে' গানটি রবীন্দ্রনাথের কৃত বলিয়া 'গীতবিতানে' উদ্ধৃত করা হইয়াছে। গানটি গুরু নানকের বিখ্যাত 'গগনময় থাল. রবি-চন্দ্র-দীপক বনে' ভজনের প্রথমাংশের অনুবাদ। কিন্তু গানটি রবীন্দ্রনাথের কোনো গীতসংগ্রহে নাই; আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ) পুস্তকে ইহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা বলা হইয়াছে। শনিবারের চিঠির ১৩৪৬ মাঘ সংখ্যায় (পৃ. ৫৯০) বলা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এটি তাঁহার রচনা।

১২৮১ সালের ৩০ মাঘ (১৮৭৫, ফেব্রুয়ারি ১১) পার্সিবাগানে (সার্কুলার রোড) 'হিন্দুমেলা'র নবম বাৎসরিক উৎসবক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'হিন্দুমেলার উপহার' (র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৮২৪) শীর্ষক কবিতা পাঠ করেন। তখন বালক-কবির বয়স মাত্র তেরো বৎসর আট মাস। দ্বিভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায় (১২৮১, ফাল্গুন ১৪। ১৮৭৫, ফেব্রুয়ারি ২৫) এটি প্রকাশিত হয়। সমকালীন *India Daily News*-এ সংবাদটি বাহির হইয়াছিল (রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃ. ৪৭, পাটী-৩)।

১২৮২ সালের ২০ জ্যৈষ্ঠ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরদের বাড়িতে (৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিস্থিত পুরাতন অট্টালিকায়) 'বিদ্বজ্জন সমাগম'-সভায় শতাধিক সাহিত্যিক ও গ্রন্থকারের সমক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির খেদ' (র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৮২৮, ৮৩৫) নামে কবিতা পাঠ করেন। এই কবিতা রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য -সম্পাদিত নূতন মাসিক 'প্রতিবিম্ব'-এর ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় (১২৮২ বৈশাখ) প্রকাশিত হয়, এবং 'বালকের রচিত' বলিয়া এই কবিতাটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১২৮২ আষাঢ়) পুনরায় মুদ্রিত হয়; দুইটির পাঠভেদ আছে। 'সাধারণী' সাপ্তাহিকের সম্পাদক তরুণ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই কবিতা সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্য করিয়াছিলেন (সাধারণী, ১২৮২, জ্যৈষ্ঠ ৬। ১৮৭৫, মে

১৬, রবিবার। জীবনস্মৃতি-গ্রন্থপরিচয়। রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃ. ৪৪। প্রবোধচন্দ্র সেন, "ভোরের পাখি", বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৮)

১৮৭৫ অব্দে রবীন্দ্রনাথ বাড়িতে রামসর্বস্ব পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত পড়েন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটক তখন মুদ্রিত হইতেছে। রামসর্বস্ব প্রুফ দেখিবার সময় জোরে জোরে পড়িতেন।

"রাজপুত মহিলাদের চিতা-প্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়াছিলাম।...গদ্যরচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন এখানে পদ্যরচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না।...আমি সময়াভাবে আপত্তি উত্থাপন করিলে রবীন্দ্রনাথ অল্প সময়ের মধ্যেই 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।" —জ্যোতিস্মৃতি

'সরোজিনী' নাটকের শেষাংশের মুদ্রণকালে এটি রচিত হয়; নাটকটি ১২৮২ অগ্রহায়ণ (১৮৭৫ নভেম্বর) মাসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। সেইজন্য মনে হয়, এই কবিতাটি আশ্বিন-কার্তিক মাসের কোনো সময়ে রচিত হইয়াছিল। গানটি রবিচ্ছায়া, গানের বহি, কাব্যগ্রন্থাবলী, কাব্যগ্রন্থ, এমনকি ১৯০৯-এর গানের বহিতেও নাই। ইহা রবীন্দ্রসংগীতরূপে গীতবিতানের (১৩৫৭) অন্তর্গত হয় (পৃ. ৭৬৭,৯৭৪)। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৫৯৫। স্বরবিতান ৫১।

রামসর্বস্ব-সম্পাদিত 'প্রতিবিম্ব' ও রাজশাহীর শ্রীকৃষ্ণদাস-পরিচালিত 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকা যুগ্মভাবে কলিকাতা হইতে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নামে ১২৮২ অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৭৫ নভেম্বর) 'জ্ঞানাঙ্কুর'-এর ৪র্থ বর্ষে প্রকাশিত হয়। "কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন।" রামসর্বস্বের উৎসাহে এইটি ঘটে, কারণ তিনি ঠাকুরবাড়ির শিক্ষক; বালক রবীন্দ্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া আট মাস পূর্বে (১২৮২ বৈশাখ) প্রতিবিম্বে 'প্রকৃতির খেদ' প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে'র ১২৮২ অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' কাব্য ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতে থাকে। কাব্যটি ১২৮২ অগ্রহায়ণ হইতে ১২৮৩ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা পর্যন্ত বাহির হয়; কিন্তু মনে হয় কাব্যটি সম্পূর্ণভাবে ১২৮২ সালের গোড়ার দিকে রচিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৮ সালে বলিয়াছিলেন যে, পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার 'বেশ কিছুদিন আগে লেখা' (রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃ. ৫২)।

১২৮২ অগ্রহায়ণ	পৃ. ১৫-১৬।	'বনফুল' প্রথম সর্গ।
মাঘ	পৃ. ১৩৫-৩৮।	'বনফুল' দ্বিতীয় সর্গ।
ফাল্গুন		'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছ (র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪)।
চৈত্র	পৃ. ২২৮-৩৪।	'বনফুল' তৃতীয় সর্গ।
১২৮৩ বৈশাখ	পৃ. ২৭৮-৮০।	'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছ।

জ্যৈষ্ঠ পৃ. ৩১৬-১৯। 'বনফুল' চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গ।
শ্রাবণ পৃ. ৪২০-২৫। 'বনফুল' ষষ্ঠ সর্গ।
ভাদ্র পৃ. ৪৫৭-৬১। 'বনফুল' সপ্তম সর্গ।
আশ্বিন-কার্তিক পৃ. ৫৬৭-৭৩। 'বনফুল' অষ্টম সর্গ।

বনফুল। র-র, অ-১, পৃ. ৪৭-১১৬। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ১-৫৩।

প্রলাপ। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৮৩৯, ৮৪৫, ৮৪৭।

১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইলে বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ হইল। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পিতা দেবেন্দ্রনাথের সহিত [নদীপথে ?] রাজশাহী (রামপুর বোয়ালিয়া) যাত্রা। সেখানে ১২৮২ পৌষ ৪ তারিখে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে দেবেন্দ্রনাথ উপাসনা করেন ; "স্বাধ্যায়ের···রবীন্দ্রনাথ [বয়স ১৪]···সুমধুর স্বরে একটি মনোহর ব্রহ্মসঙ্গীত করেন।" —তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৯৭ শক (১২৮২ মাঘ)।

১৮৭৬ অক্টোবরে (১২৮৩ আশ্বিন-কার্তিক) জ্ঞানাঙ্কুরে 'বনফুল'এর শেষ সর্গ প্রকাশিত হয়। সেই সংখ্যায় প্রথম গদ্যপ্রবন্ধ 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'[১] তিনটি কাব্যের সমালোচনা। কাব্যখানি এই বৎসরেই প্রকাশিত হয়।

"খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম। খণ্ড কাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত বিচার করিয়াছিলাম।" —জীবনস্মৃতি

জীবনস্মৃতির রচনা-প্রকাশ অধ্যায়ে গদ্যপ্রবন্ধ-প্রকাশ বিষয়ে বহু কৌতুকপ্রদ তথ্য আছে।

১৮৭৭, মার্চ ৪ (১২৮৩ ফাল্গুন ২২, রবিবার) অক্ষয়চন্দ্র সরকার হিন্দুমেলা বা ন্যাশন্যাল মেলা সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

"আমরা নিরাশমনে নবগোপালবাবুকে অভিসম্পাত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রবাবুর পুত্র জ্যোতিরিন্দ্র (২৯) এবং রবীন্দ্রের (১৬) সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রবাবু 'দিল্লীর দরবার' সম্পর্কে একটি কবিতা ও একটি গীত রচনা করিয়াছিলেন। আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষচ্ছায়ায় দূর্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা এবং গীতটি শ্রবণ করি।···একজন সুপরিচিত কবিও [নবীনচন্দ্র সেন] উপস্থিত ছিলেন।"

—জীবনস্মৃতি, দ্র. নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৪। রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃ. ৬১-৬২।

---

১ ভুবনমোহিনীপ্রতিভা (১৮৭৫)। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
অবসরসরোজিনী (১৮৭৬ মে)। রাজকৃষ্ণ রায়।
দুঃখসঙ্গিনী (১৮৭৫ অক্টোবর)। হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম গদ্যরচনা তাঁহার কোনো গ্রন্থে বা রচনাবলীর কোনো খণ্ডে এখনো মুদ্রিত হয় নাই। শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ কার্তিক এবং বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৯ বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। 'সাহিত্যসাধক চরিতমালার' অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'দুঃখসঙ্গিনী' সম্বন্ধে কবির মন্তব্য আংশিক উদ্‌ধৃত আছে।

দিল্লী দরবার (কবিতা)

'দেখিছ না অয়ি ভারতসাগর, অয়িগো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে।' কবিতাটি কোনো সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। লর্ড লীটন্ ১৮৭৭ জানুয়ারি ১ তারিখে দিল্লীতে দরবার আহ্বান করেন। সেই ঘটনাকে বিকৃত করিয়া কবিতাটি রচিত। ভার্ণাক্যুলার প্রেস অ্যাক্ট পাশ হইবে কথা চলিতেছিল বলিয়া উহা মুদ্রিত হয় নাই। প্রেস্ অ্যাক্ট পাশ হয় ১৮৭৮ মার্চ ২৪। অতঃপর 'ব্রিটিশ' স্থলে 'মোগল' শব্দ দিয়া কবিতাটিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) নাটকভুক্ত করা হয়। চতুর্থ অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শুভসিংহের স্বগতোক্তি। —দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-গ্রন্থপরিচয়। রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃ. ৬১-৬২। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ৮৪৯।

জাতীয় সঙ্গীত

'ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি'[২] গানটি 'জাতীয় সঙ্গীত' (প্রথম ভাগ, ২য় সংস্করণ, ১৮৭৮) মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছিল। সুর ভৈরবী। 'রবিচ্ছায়া' বা পরবর্তী কোনো গীতসংগ্রহে এই গানটি ধরা নাই। গীতবিতান (১৯৬০), পৃ. ৮১৩, ৯৮৫।

—দ্র. শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৩১৬। সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য (১৩৬৭) পৃ. ২১৭-১৮।

১৮৭৭ জুলাই (১২৮৪ শ্রাবণ) হইতে 'ভারতী' পত্রিকা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইল।

১২৮৪ শ্রাবণ। ভারতী, প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

ভারতী (কবিতা) [অস্বাক্ষরিত]

শুধাই অয়ি গো ভারতী তোমায়···
তোমার ও বীণা নীরব কেন ?··· পৃ. ৩-৪।

—দ্র. শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬।

মেঘনাদবধ কাব্য স্বাক্ষরিত 'ভ'

সমালোচনা প্রবন্ধ। ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়— শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন।

"মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ।··· এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।" —জীবনস্মৃতি

---

২ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় রবীন্দ্রনাথ যে-সকল গানকে নির্বাচন করিয়া গীতবিতানের অন্তর্গত করেন, সেগুলি ১ম ও ২য় খণ্ডে বা বর্তমান সংস্করণের ৬১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। ইহার পর গানগুলি কবি কর্তৃক সংগৃহীত হয় নাই। তাঁহার গানের তালিকা সম্পূর্ণ করিবার জন্ত সমস্ত গান গীতবিতান-মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে।

'ভ' স্বাক্ষর 'ভানুসিংহ'-এর আদ্যাক্ষর। এই প্রবন্ধ কোনো পুস্তক-মধ্যে সন্নিবেশিত হয় নাই।

ভিখারিণী [ছোট গল্প]

ভারতী, ১২৮৪ শ্রাবণ, পৃ. ৪১-৪৪। ভাদ্র, পৃ. ৭৯-৮৪। দুই সংখ্যায় শেষ। স্বাক্ষরহীন। 'ভারতীর ভিটা' প্রবন্ধে অক্ষয় চৌধুরীর স্ত্রী শরৎকুমারী লিখিয়াছেন… "ছোট গল্প [ভিখারিণী] প্রথম যেটি প্রকাশিত হয় তাহা রবিবাবুর, পরে তাঁহার একটি গল্প [করুণা] ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতে থাকে।" —বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫১ কার্তিক-পৌষ। জীবনস্মৃতি : গ্রন্থপরিচয়।

"ষোলো বছর বয়সের… মুখেই দেখা দিয়েছে 'ভারতী'।… তারই মধ্যে আমি লিখে বসলুম এক গল্প— সেটা যে কী বকুনির বিনুনি নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও তেমন করে খোলে নি।" —ছেলেবেলা

১২৮৪ ভাদ্র। ভারতী, প্রথম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৮৭৭ অগস্ট

হিমালয় [কবিতা] (অস্বাক্ষরিত। কোথাও উল্লেখিত নাই)।

'যেখানে জ্বলিছে সূর্য্য, উঠিছে সহস্র তারা'

—শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ

[মেঘনাদবধ-২য় দফা সমালোচনা। ভিখারিণী সমাপ্ত]

"একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে, সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে।"

—জীবনস্মৃতি

১২৮৪ আশ্বিন। ভারতী, প্রথম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ১৮৭৭ সেপ্টেম্বর

ভানুসিংহের কবিতা।

'সজনী গো— আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা'— সুর মল্লার।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪ জুলাই) গ্রন্থে এই কবিতাটি ১৩-সংখ্যক। পৃ. ৩১

১৮৯৬ কাব্যগ্রন্থাবলী, পৃ. ২৩-২৪। ইহার নাম 'অভিসার'— 'সজনি গো, শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা' ইত্যাদি পাঠ। ১৯০৩…কাব্যগ্রন্থ (মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত) ৮ম খণ্ডের পৃষ্ঠা ১১৪ দ্রষ্টব্য।

১৮৯৩ 'গানের বহি'তে গানটি নাই। ১৯০৯-এর 'গান' বহিতেও এটি বাদ পড়িয়াছে।

র-র, ২, পৃ. ১৮-১৯। ১৩-সংখ্যক কবিতা। গীতবিতানে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী -ভুক্ত না করিয়া 'প্রকৃতি'র মধ্যে প্রদত্ত। পৃ. ৪৪০। স্বরলিপি— কেতকী। স্ব-বি. ২১।

আগমনী [কবিতা]

'সুধীরে নিশার আঁধার ভেদিয়া ফুটিল প্রভাত তারা', পৃ. ১১১-১৩। শনিবারের চিঠি,

১৩৪৬ অগ্রহায়ণ। অন্য কোথাও এই স্বাক্ষরহীন কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া উক্ত হয় নাই।

করুণা [গল্প]

"কেবল বৈষ্ণব পদাবলী নহে, তখন বাংলা সাহিত্যে যে-কোনো বই বাহির হইত আমার লুব্ধ হস্ত এড়াইতে পারিত না।··· এই সব বই পড়িয়া জ্ঞানের দিক হইতে আমার যে অকাল পরিণতি হইয়াছিল বাংলা ভাষায় তাহাকে বলে জ্যাঠামি— প্রথম বৎসরের ভারতীতে প্রকাশিত আমার বাংলা রচনা 'করুণা' নামক গল্প তাহার নমুনা।" —জীবনস্মৃতির খসড়া

জীবনস্মৃতির মধ্যে 'করুণা'র উল্লেখ মাত্র নাই। দ্র. গল্পগুচ্ছ ৪, গ্রন্থ-পরিচয় পৃ. ১০১০।

[ভূমিকা ও প্রথম পরিচ্ছেদ— আশ্বিন, পৃ. ১৩৮-১৪০ ; দ্বিতীয়-চতুর্থ পরিচ্ছেদ— কার্তিক, পৃ. ১৭০-১৮০ ; পঞ্চম পরিচ্ছেদ— অগ্রহায়ণ, পৃ. ২২৯-২৩৪ ; ষষ্ঠ-সপ্তম পরিচ্ছেদ— পৌষ, পৃ. ২৮৪-২৮৮ ; অষ্টম-দশম পরিচ্ছেদ— ফাল্গুন, পৃ. ৩৭৫-৩৭৮ ; একাদশ-চতুর্দশ পরিচ্ছেদ— ১২৮৪ চৈত্র, পৃ. ৪০৮-৪১৩ ; পঞ্চদশ-ষোড়শ পরিচ্ছেদ— ১২৮৫ বৈশাখ, পৃ. ৩৯ ; সপ্তদশ-অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ— ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৭৮-৮২ ; ঊনবিংশ-দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ— ১২৮৫ শ্রাবণ, পৃ. ১৫৩-১৬৫ ; ত্রয়োবিংশ-সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ— ১২৮৫ ভাদ্র, পৃ. ২২৬-২৩৪।]

'করুণা' গল্প কোনো গ্রন্থভুক্ত ছিল না।

গল্পগুচ্ছ (বিশ্বভারতী) ৪র্থ খণ্ডের (১৩৭০) পরিশিষ্ট অংশে ভিখারিণী, করুণা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উৎসর্গ-গীতি

"তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ"— সুর জয়জয়ন্তী, তাল-চৌতাল।

(মনে হয় 'সঞ্জীবনী-সভা'র প্রেরণায় রচিত)

১৮৭৮ অগস্ট ৩০ তারিখে প্রকাশিত 'জাতীয় সঙ্গীত' গ্রন্থের ২য় সংস্করণে আরও তিনটি গান আছে—

১. অয়ি বিষাদিনী বীণা— সুর বাহার-কাওয়ালি।

২. ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা— সুর গৌরমল্লার।

৩. ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি— সুর ভৈরবী।

'জাতীয় সঙ্গীত' ১ম সংস্করণ ১৮৭৬ ফেব্রুয়ারি ১৭ প্রকাশিত হয়; তখন রবীন্দ্রনাথের এই ৪টি গান ছিল না। ১৮৭৮ অগস্ট ৩০-এর ২য় সংস্করণে গান কয়টি আছে। অনুমান, গানগুলি হিন্দুমেলার জন্য রচিত। দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান' (বঙ্গবাসী কার্যালয়), ১৩১২ আশ্বিন, গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

'তোমারি তরে' গানটি 'রবিচ্ছায়া' হইতে, কবির সকল গীতগ্রন্থে আছে। গীতবিতান, পৃ. ৮১৭। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬৩২। স্বরলিপি— শতগান (১৯০০)। স্বরবিতান— ৪৭।

'ঢাকো রে মুখ' গানটি রবিচ্ছায়ায় আছে। গীতবিতান, পৃ. ৮১৬। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬৩১।

'অয়ি বিষাদিনী বীণা'— সুর বাহার-কাওয়ালি। গানটি 'রবিচ্ছায়া' বা পরবর্তী গীত-গ্রন্থে নাই। জাতীয়

সঙ্গীত (১৮৭৮, ২য় সং) গ্রন্থ হইতে সংকলিত। গীতবিতান। (দ্র. শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ কার্তিক, অগ্রহায়ণ) ১৮৭৭ হিন্দুমেলায় পঠিত বা গীত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান। গীতবিতান, ১৯৬০, পৃ. ৯৮৫। (দ্র. সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য (১৩৬৭), পৃ. ২১৭)

১২৮৪ কার্তিক। ভারতী, প্রথম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১৮৭৭ অক্টোবর-নভেম্বর

১. শারদ জ্যোৎস্না— (ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস)।
 'আবার আবার শুনাবে আবার'
 (২৩ স্তবক, ৪ পংক্তি করিয়া)।
 ভারতী, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। পৃ. ২০০-০৬।
২. মেঘনাদবধ কাব্য— [সমালোচনা] পৃ. ১৬১-১৬৪।
৩. করুণা—২য়-৩য়-৪র্থ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৭০-১৮০।

১২৮৪ অগ্রহায়ণ। ১৮৭৭ নভেম্বর-ডিসেম্বর

ঝান্সীর রাণী— [ভ স্বাক্ষরিত] পৃ. ১৫৪-৫৬।
ভারতী, ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, কার্তিক, পৃ. ২০০-০৬।
[দ্র. ইতিহাস, বিশ্বভারতী। শ্রীকানাই সামন্ত, 'রবীন্দ্র-প্রতিভা' পৃ. ২৪৮। র.জী. ১,৬৫ পাটী]

ভানুসিংহের কবিতা।
'গহন কুসুমকুঞ্জমাঝে'— সুর বেহাগড়া।
ভারতী, ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ। পৃ. ২০৬।
(ব্রজবুলিতে রচিত প্রথম কবিতা। দ্র. জীবনস্মৃতি)
১৮৭৯ জুলাই : জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' নাটকের ৩য় অঙ্কে মলিনার গান। গ্রন্থমধ্যে এই প্রথম সন্নিবেশিত হইল।
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১৮৮৪। পৃ. ১৮-১৯। ৮-সংখ্যক কবিতা। ঝিঁঝিট। সকল গীত-সংগ্রহে গানটি আছে। গীতবিতান ১ম সংস্করণে (১৯৩১) ভা. ঠা. প-র মাত্র ৪টি গানের মধ্যে এইটি ধরা আছে। গীতবিতান পৃ. ৭৫৬। র-র ২, পৃ. ১২। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১, পৃ. ১৩৪। ৪, পৃ. ৫৮৮। স্বরবিতান ২১।

করুণা। ৫ম পরিচ্ছেদ। ভারতী, ১২৮৪ অগ্রহায়ণ, পৃ. ২২৯-৩৪।

ছিন্নলতিকা।
'সাধের কাননে মোর রোপণ করিয়াছিনু'
ভারতী, ১২৮৪ অগ্রহায়ণ, পৃ. ২৪০।

'শৈশব সঙ্গীত' গ্রন্থে (১৮৮৪) প্রথম সন্নিবেশিত হয়। র-র, অ-১, পৃ. ৫৬৪-৬৫। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬৮০।

১২৮৪ পৌষ। ১৮৭৭ ডিসেম্বর

কবিকাহিনী। প্রথম সর্গ

ভারতী, ১২৮৪ পৌষ, প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা। পৃ. ২৬৪-৬৮। র-র, অ-১, পৃ. ৫-১৩।

র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ৫৫-৮৯। ভারতী, ১২৮৪ পৌষ-চৈত্র (১৮৭৮ মার্চ পর্যন্ত) মাসে মাসে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পুস্তকাকারে প্রস্তুত হয়। প্রকাশিত হয় নভেম্বরে; কবি তখন বিলাতে।

ভানুসিংহের কবিতা।

'বাজাও রে মোহন বাঁশী'— সুর মুলতান।

ভারতী, ১২৮৪ পৌষ। পৃ. ২৮৮। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪) গ্রন্থভুক্ত। সকল গীতগ্রন্থে আছে। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬)-তে 'ব্যাকুলতা' নাম প্রদত্ত হয়।

গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৫৭। র-র ২, পৃ. ১৪-১৫। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১, পৃ. ১৩৫। ৪, পৃ. ৫৮৮। স্বরবিতান ২১। নানা সংস্করণে পাঠভেদ আছে।

মেঘনাদবধ কাব্য-সমালোচনা [৪ কিস্তি]। ভারতী, ১২৮৪ পৌষ। পৃ. ২৬৯-৭৪।

করুণা। ৬-৭ পরিচ্ছেদ। ভারতী, ১২৮৪ পৌষ। পৃ. ২৮৪-৮৮।

১২৮৪ মাঘ। ১৮৭৮ জানুয়ারি

ভারতী বন্দনা

'আজিকে তোমার মানস সরসে'···

ভারতী, ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ১২৮৪ মাঘ, পৃ. ৩১৩-১৮।

শৈশব সঙ্গীত (১৮৮৪ মে) পৃ. ৫৩-৫৯। র-র, অ-১, পৃ. ৪৬৫-৬৭। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬৮০

কবিকাহিনী, দ্বিতীয় সর্গ

ভারতী, ১২৮৪ মাঘ, পৃ. ৩১৮-৩২৫।

ভানুসিংহের কবিতা

'হম সখি দারিদ নারী'— সুর ভৈরবী

ভারতী, ১২৮৪ মাঘ, পৃ. ৩৩৬।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪) ১৬-সংখ্যক কবিতা।

'রবিচ্ছায়া' প্রভৃতি কোনো গীতগ্রন্থে নাই।

র-র, ২য় খণ্ডের ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে নাই।

গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৬১। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৫৯১। স্বরবিতান ২১

সম্পাদকের বৈঠক। (অনুবাদ)

একটি চুম্বন দাও প্রমোদা আমার	বিদায়-চুম্বন	:	Burns
ললিত- নলিনী—	কৃষকের প্রেমালাপ	:	Burns
এস এস এই বুকে নিবাসে তোমার	জীবন-উৎসর্গ	:	Moore—Irish Melodies.
প্রতিকূল বায়ুভরে উর্মিময় সিন্ধু'পরে	বিচ্ছেদ	:	Moore—Irish Melodies.
যাও তবে প্রিয়তম সুদূর প্রবাসে	বিদায়	:	Mrs. Opic.
মানুষ কাঁদিয়া হাসে—	কষ্টের জীবন	:	Byron

সঙ্গীত : 'কেমন সুন্দর আহা ঘুমায়ে রয়েছে'— Shakespeare.

বিচ্ছেদ : কালিদাসের 'শকুন্তলা'[৩]

মদনভস্ম : কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'[৪]

ভারতী, ১২৮৪ মাঘ, পৃ. ৩২৬-৩৩১

১২৮৪ ফাল্গুন। ১৮৭৮ ফেব্রুয়ারি

ভানুসিংহের কবিতা

'সখীরে পিরীত বুঝবে কে ?'

ভারতী, ১২৮৪ ফাল্গুন। ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, পৃ. ৩৮০-৮১

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪) পৃ. ৩৭-৩৮ ; সংখ্যা ১৫। টোড়ি।

'রবিচ্ছায়া' প্রভৃতি গীতগ্রন্থে বর্জিত হইয়াছে।

র-র, ২য় খণ্ডের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' অংশেও নাই।

গীতবিতান (১৯৬০), পৃ. ৭৬০। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৫১০। ১, পৃ. ১৩৪। স্বরবিতান ২১।

'সতিমির রজনী, সচকিত সজনী'

ভারতী, ১২৮৪ ফাল্গুন। ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, পৃ. ৩৮১।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪), পৃ. ২০-২১। সংখ্যা ৯। মিশ্র জয়জয়ন্তী।

কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬) : 'প্রতীক্ষা' নামে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে প্রকাশিত। পৃ. ২২।

গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৫৭। মিশ্র জয়জয়ন্তী— ত্রিতাল। র-র, ২, পৃ. ১৩-১৪। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১, পৃ. ১৩৪। ৪, পৃ. ৫৮৮। স্বরবিতান ২১।

---

৩ শকুন্তলা নাটক রবীন্দ্রনাথ রামসর্বস্ব ভট্টাচার্যের নিকট পড়িয়াছিলেন। "তিনি আমাকে অর্থ করিয়া শকুন্তলা পড়াইতেন।" —'ঘরের পড়া', জীবনস্মৃতি।

৪ কুমারসম্ভবের অনুবাদ সম্পর্কে পূর্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য। ভারতীর এই অনুবাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ-কৃত।

কবি-কাহিনী, তৃতীয় সর্গ, পৃ. ৩৬০-৬৩।

মেঘনাদবধ কাব্য। সমালোচনা (৬) পৃ. ৩৬৬-৭০।

করুণা, ৮-১০ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৭৫-৭৮।

১২৮৪ চৈত্র। ১৮৭৮ মার্চ-এপ্রিল

ভানুসিংহের কবিতা

'বাদরবরখন, নীরদগরজন'। রাগিণী মল্লার।

ভারতী, ১২৮৪ চৈত্র। ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা,[৫] পৃ. ৪২২।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪) পৃ. ৩৪-৩৫। ১৪-সংখ্যক কবিতা।

কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৬) পৃ. ২২ ; ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে 'বর্ষা' নামে প্রকাশিত।

গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৬০ (১ম সংস্করণে নাই)। র-র, ২য় খণ্ডে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, ১৪-সংখ্যক কবিতা, পৃ. ১৯। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১, পৃ. ১৩৮। ৪, পৃ. ৫৯০। স্বরবিতান ২১।

কবিকাহিনী। চতুর্থ সর্গ, পৃ. ৩৯৩-৯৯।

সান্ত্বনা (প্রবন্ধ) পৃ. ৩৯৯-৪০১।

করুণা, ১১-১৩শ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৪০৮-৪১৮।

১২৮৫ বৈশাখ। ১৮৭৮ এপ্রিল

(বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য যাত্রার পূর্বে চারি মাস আহমদাবাদে ও দুই মাস বোম্বাই-এ বাস। বিলাতযাত্রা— ১৮৭৮, সেপ্টেম্বর ২০)

আহমদাবাদে—

সামুদ্রিক জীব। প্রবন্ধ (প্রথম প্রস্তাব— কীটাণু)।

'ভ' স্বাক্ষরিত 'যতই তোমার ভাব ভাবি হে অন্তরে, ততই বিস্ময় রসে হই নিমগন' কবিতাটি প্রবন্ধ-মধ্যে সংযোজিত। (কবিতাটি কাহার রচনা ?)

এই প্রবন্ধে বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা— ৪১-৪৮ স্তবক উদ্ধৃত।

ভারতী, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১২৮৫ বৈশাখ, পৃ. ৩১-৩৮।

১২৮৫ বৈশাখ। ১৮৭৮ মে

ভানুসিংহের কবিতা

'বারবার সখি বারণ করনু'

ভারতী, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১২৮৫ বৈশাখ, পৃ. ২১।

---

৫ ভারতী প্রথম বর্ষে (১২৮৪) ৯টি সংখ্যা, কারণ শ্রাবণ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪) পৃ. ৫০-৫৩। ১৯-সংখ্যক কবিতা। ইমনকল্যাণ।
কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী অংশে 'দূতীর প্রতি' শীর্ষক কবিতা, পৃ. ২৬।
গীতবিতান (১৯৬০), পৃ. ৭৬৩ (১৮নং)। ১ম সংস্করণে নাই। র-র ২, পৃ. ২২-২৩। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১, পৃ. ১৪০। ৪, পৃ. ৫৯২।

(তুকারাম: সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অভঙ্গের অনুবাদ করিয়াছেন। ভারতী, ১২৮৫ বৈশাখ, পৃ. ২৫-২৬। আহমদাবাদে বাসকালে বোধহয় এই অনুবাদগুলি সত্যেন্দ্রনাথের সাহায্যে কৃত ; মূল মারাঠির অর্থ সত্যেন্দ্রনাথ করিয়া দেওয়াতেই অনুবাদ করা সম্ভব হইয়াছিল) দ্র. নবরত্নমালা।

করুণা। ১৫-১৬ পরিচ্ছেদ

ভারতী, পৃ. ৩৯-৪২।

১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ

করুণা। ১৭ পরিচ্ছেদ

ভারতী, ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৭৮-৮২।

ইংরেজদিগের আদবকায়দা [প্রবন্ধ]

ভারতী, ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৫৮-৬৩।

[আহমদাবাদে ইংরেজিসাহিত্যের ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। সেগুলিই ভারতীতে প্রকাশিত হয়।] ?

১২৮৫ আষাঢ়। ১৮৭৮ জুলাই

অবসাদ [কবিতা]

'হে কবিতা, হে কল্পনা' (দীর্ঘ কবিতা)।
মালতী-পুঁথি। রচনার স্থান— আহমদাবাদ ; তারিখ ১৮৭৮ জুলাই ৬ (১২৮৫ আষাঢ় ২৩)।
মনে হয় এই কবিতাটি কোনো ইংরেজি কবিতার অনুবাদ (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃ. ৮১)।
র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৮৫১।

অনুবাদ : সম্পাদকের বৈঠক।

Byron, Moore-এর অনুবাদ।
ভারতী, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা (১২৮৫ আষাঢ়), পৃ. ১৪০-১৪৩।
ভারতী, ১২৮৫ আষাঢ়।
সম্পাদকের বৈঠক।
এই পর্যায়ে ৩টি কবিতার অনুবাদ আছে। তবে সেগুলি রবীন্দ্রনাথের কি না জানি না। আমাদের 'ভারতী'তে কবি-কর্তৃক চিহ্নিত হইয়াছিল।

১. গভীর গভীরতম হৃদয় প্রদেশে— Byron
২. যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায়— Moore
(দ্র. ভারতী ১২৮৪ মাঘ। সেখানে Mrs Opic লেখিকা বলা হইয়াছিল)
৩. আবার আবার কেন রে আমার— Byron

দিক্‌বালা [কবিতা]

'কোথা গেলে কল্পনা, আইস, আইস, দেবী'

ভারতী, ১২৮৫ আষাঢ়, পৃ. ১০৩-১০৫। শৈশবসঙ্গীত (১৮৮৪)-এ প্রথম ১৬ পংক্তি বর্জিত, সেখানে আরম্ভ 'দূর আকাশের পথ, উঠিছে জলদরথ।' (পৃ. ৩৮)

র-র, অ-১, পৃ. ৪৫৬। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৭৫৯।

১২৮৫ শ্রাবণ। ১৮৭৮ জুলাই

স্যাকসন জাতি ও অ্যাঙ্‌লো-স্যাকসন সাহিত্য [প্রবন্ধ]

ভারতী, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা। (১২৮৫ শ্রাবণ)। পৃ. ১৭১-৮৪। ?

প্রতিশোধ। গাথা

'গভীর রজনী, নীরব ধরণী'

ভারতী, ১২৮৫ শ্রাবণ, পৃ. ১৬৫-৭০। দ্র. মালতী-পুঁথি।

শৈশবসঙ্গীত (১৮৮৪)। পৃ. ৪২-৫৫। র-র, অ-১, পৃ. ৪৫৫-৬৪। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ৭৬০।

করুণা। ১৯-২২ পরিচ্ছেদ

পৃ. ১৫৩-১৬৫

আহমদাবাদ বাসকালে নিজের সুর দেওয়া প্রথম গান—"নীরব রজনী দেখো মগ্ন জ্যোছনায়" জীবনস্মৃতি পাণ্ডুলিপিতে ৪ পংক্তি উদ্ধৃত আছে সমগ্র গানটি 'ভগ্নহৃদয়'-এর অন্তর্গত করা হয়। "ইহার বাকি অংশ পরে ভদ্রছন্দে বাঁধিয়া পরিবর্তিত করিয়া তখনকার গানের বহিতে [রবিচ্ছায়া] ছাপাইয়াছিলাম।"…"সাবরমতীতীরের [আহমদাবাদের শাহীবাগের বাড়িতে] 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটি এমনি আর এক রাত্রে বেহাগ সুরে বসাইয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছিলাম।" দ্র. ভগ্নহৃদয়, ৬ষ্ঠ সর্গ

আহমদাবাদ বাসকালে রচিত অন্য প্রবন্ধাদি

বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য

ভারতী, ১২৮৫ ভাদ্র, পৃ. ২০১-১২।

দান্তের কবিতা অনুবাদ— "প্রেমবন্দী হৃদি যাঁরা সুকোমল মন"।

১২৮৫ আশ্বিন

পিত্রার্ক ও লারা

ভারতী, ১২৮৫ আশ্বিন, পৃ. ২৭২-৭৯। কবিতার অনুবাদ আছে।

গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ

ভারতী, ১২৮৫ কার্তিক, পৃ. ২৮৯-৯৮।

১২৮৫ কার্তিক

কবিতা পুস্তক (শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যের রবীন্দ্রনাথ-কৃত সমালোচনা)

ভারতী, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১২৮৫ ভাদ্র, পৃ. ২৩৪-৪০। দ্র. শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ।

ফুলবালা (কবিতা)। ভারতী, ১২৮৫ কার্তিক, পৃ. ৩০০।

শৈশবসঙ্গীতের ১. 'গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে' (গীতবিতান, পৃ. ৮৬৪) ও ২. 'দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা' (গীতবিতান, পৃ. ৪১৮) গান দুইটি ফুলবালার অন্তর্গত। র-র ১, পৃ. ৪২৯-৫০। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৭৪১-৫৬। ফুলবালার অন্তর্গত গান—

গোলাপফুল ফুটিয়ে আছে, মধুপ হোথা যাস্‌নে

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) ২, পৃ. ৩১। পিলু যৎ। গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ১৬০। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬) কৈশোরক, পৃ. ৪; 'নির্বন্ধ', গোলাপ কলি পড়িছে ঢলি, হোথায় অলি যাস্‌ নে। গান (১৯০৯) পৃ. ৬১। গীতবিতান পৃ. ৮৭১। স্বরবিতান ২০। র-র, অ-১, পৃ. ৪৩৯। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬৭১, ৭৪৮।

দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫)। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬)। স্বরলিপি-গীতিমালা। গীতবিতান (১৯৩১) পৃ. ১১৬। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৪১৮। স্বরবিতান ২০। র-র, অ-১, পৃ. ৪৫৯। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৩২৪, ৭৫৬।

অপ্সরার প্রেম। গাথা। ভারতী, ১২৮৫ ফাল্গুন। র-র ১, পৃ. ৪৭৬-৯৮। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৭৭৬-৮৭।

শৈশবসঙ্গীতে (১৮৮৪) 'অপ্সরার প্রেম' গাথার শেষ গান—'সোনার পিঞ্জর ভাঙিয়ে আমার'।

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ৪৮-৪৯। গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ১৭৩। সুর ভৈরবী একতালা। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬) পৃ. ৪। 'কৈশোরক বিদায়' নামক কবিতা। গান (১৯০৯) পৃ. ১২৯। গীতবিতান (১ম সং) পৃ. ৩২০, গীতবিতান (নূতন) পৃ. ৮৭৪। র-র, অ-১, পৃ. ৪৯০-৯১। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৭৮৬।

বোম্বাই বাসকালে রচিত কবিতাদি (অনুমান)

ভাসিয়ে দে তরী তবে নীল সাগরোপরি

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল একতালা।

ভারতী, ১২৮৫ ভাদ্র, পৃ. ২২৫। বালক, ১২৯২ আষাঢ়, পৃ. ১৪৪। (ভারতী হইতে অনেকগুলি পংক্তি বাদ দিয়া এই পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়; কবিতার মধ্যে ভাষারও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।) গান অভ্যাস— স্বরলিপি, প্রতিভাদেবী। পৃ. ১৪৪-৪৫।

গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৯৫১। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৭৩৩। স্বরলিপি-গীতিমালা (১৮৯৮)। স্বরবিতান ৩৫।

'শুন নলিনী, খোল গো আঁখি'

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫)। শৈশবসঙ্গীত (১৮৮৪), প্রভাতী। র-র, অ-১, পৃ. ৪৯১। প্রভাতী। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৮৭২। স্বরবিতান ২০। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬৭১, ৭৮৭।

'আমি স্বপনে রয়েছি ভোর'

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫)। গীতবিতান (১৯৬০), পৃ. ৮৭৫। স্বরবিতান ৩৫। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬৭৪।

ভারতী, ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১২৮৬ বৈশাখ

ভানুসিংহের কবিতা।

'মাধব না কহ আদর বাণী'

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, ১৭-সংখ্যক কবিতা, পৃ. ৪২-৪৪। (১ম সং ১৮৮৪)। কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৬) পৃ. ২৪। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে 'অনুতপ্তা' নামক কবিতা। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৬১। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে ১৬-সংখ্যক কবিতা। গীতবিতান ১ম সংস্করণে নাই। র-র ২, পৃ. ২০। ১৫-সংখ্যক কবিতা। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১, পৃ. ১৩৯ ; ৪, পৃ. ৫৯১।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র (প্রথম পত্র। প্রথম অংশ ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ (৫ আশ্বিন ১২৮৫) বোম্বাই হইতে বিলাত যাত্রা। এই পত্রে এডেন পর্যন্ত যাত্রার বর্ণনা) পৃ. ৪২-৪৮।

ভারতী, ১২৮৬ জ্যৈষ্ঠ

নর্মান জাতি ও আঙ্গলো-নর্মান জাতি। দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম ভাগ ১২৮৫ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পৃ. ৪৯-৬০।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র (প্রথম পত্র, দ্বিতীয় অংশ। এডেন হইতে য়ুরোপ পর্যন্ত বর্ণনা) পৃ. ৮৭-৯৪।

১২৮৬ আষাঢ়-আশ্বিন। ১৮৭৯ জুলাই-সেপ্টেম্বর

ভারতী, ১২৮৬ আষাঢ়, পৃ. ১২৩-৩১।

ভগ্নতরী। গাথা। প্রথম-পঞ্চম সর্গ।

[ডিভনশিয়রে টর্কিনগরে সমুদ্রতীরে বসিয়া লিখিত।]

"সেই শিলাসনে বসিয়া মগ্নতরী নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম।··· গ্রন্থাবলী হইতে··· নির্বাসিত, তবুও··· তাহার ঠিকানা পাওয়া দুঃসাধ্য হইবে না।" —জীবনস্মৃতি

শৈশবসঙ্গীত (১৮৮৮)। র-র, অ-১, পৃ. ৪৯৮-৫১৪। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৭৯২-৮০৪

চ্যাটার্টন বালককবি। পৃ. ১৩৯-১৪৪

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র (দ্বিতীয় পত্র) পৃ. ১১৯-২৩।

ভারতী, ১২৮৬ শ্রাবণ

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র (তৃতীয় পত্র)। [ব্রাইটনে ফ্যাবল্‌ নাচের বর্ণনা] পৃ. ১৫৯-৬৮।

ভারতী, ১২৮৬ ভাদ্র

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র (চতুর্থ পত্র) [ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কথা। গ্লাডষ্টোন, ব্রাইড প্রভৃতির বক্তৃতা শ্রবণ] পৃ. ২১৩-২৪।

ভারতী, ১২৮৬ আশ্বিন

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র (পঞ্চম পত্র)

[ইঙ্গবঙ্গদের চিত্র] পৃ. ২৪১-৬৪।

নিন্দাতত্ত্ব (প্রবন্ধ) পৃ. ২৭৬।

১২৮৬ কার্তিক। ১৮৭৯ অক্টোবর

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র (ষষ্ঠ পত্র)

ভারতী, ১২৮৬ কার্তিক, পৃ. ২৯৬।

সম্পাদকের বৈঠক।[৬]

ভারতী, ১২৮৬ কার্তিক, পৃ. ৩১৭-২২।

১. জাগি রহে চাঁদ আকাশে যখন। পৃ. ৩১৭। সুর বেহাগ।

২. পাতায় পাতায় দুলিছে শিশির। সুর পূরবী।

Translated from an English translation of an Irish song, পৃ. ৩১৮

৬ রবীন্দ্রনাথ ১৮৮০ সালের জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত বিলাতে ছিলেন। তাই মনে হয় এই কবিতাগুলি বিলাত যাইবার পূর্বে, রচিত অর্থাৎ ১৮৭৮ সালের প্রথমার্ধে। ১৮৭৮ মার্চ মাস হইতে ১৮৮০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দুই বৎসর রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে দূরে ছিলেন।

৩. মন হতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে। স্বর ভূপালি।
Twales-এর কবি Talhaiaran-এর ইংরাজি অনুবাদ হইতে তর্জমা।
রবিচ্ছায়া (১৮৮৫, ১২৯২ বৈশাখ)।

৪. বল গো বালা আমারি তুমি। স্বর পিলু, পৃ. ৩১৮। রবিচ্ছায়া (১৮৮৫)।

৫. বুঝেছি, বুঝেছি সখা ভেঙ্গেছে প্রণয়। পৃ. ৩২১। রাগিণী দেশ।
[জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত স্বপ্নময়ী (১৮৮১)]
তৃতীয় অঙ্কে সুমতির গান। রাগিণী ভৈরবী।
ভগ্নহৃদয় (১৮৮১ জুন) ১৯ সর্গ। ললিতার গান। র-র, অ-১, পৃ. ২৩৭। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ১৮০।
রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ৮১ মিশ্র পিলু আড়াঠেকা। গান (১৯০৯)। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৭১।
র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৫৯৮। স্বরবিতান ২০।

৬. 'কাছে যাই যদি, কত যেন পায় নিধি'— স্বর ভৈরবী ঝাঁপতাল।
ভগ্নহৃদয় (১৮৮১) ৭ম সর্গে অনিলের গানরূপে সংযোজিত হয়।
শৈশবসঙ্গীত (১৮৮৪) কবিতা 'লাজময়ী'। রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ৮৫। টোড়ি-ঝাঁপতাল।
গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ১৯৮। ঝাঁপতাল। গান (১৯০৯) পৃ. ১৭৭। ঝাঁপতাল। গান (বিবিধ) (১৯১৪) পৃ. ১৩৩। গীতবিতান (১৯৩১) সংস্করণে বর্জিত হয়। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৬৯।
র-র, অ-১, পৃ. ১৮১। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৫৯৬। ৫, পৃ. ১৩৮। স্বরবিতান ২০।

৭. 'কি করিব বল সখা, তোমার লাগিয়া'— স্বর মিশ্র ইমনকল্যাণ। কাওয়ালি।
ভারতীতে গানের স্বর উল্লেখ নাই।
রবিচ্ছায়া (১৮৮৫)। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৮৭০, ৯৯৬। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬৬৯।

৮. 'গিয়াছে সেদিন, যেদিন হৃদয়'— ভৈরবী ঝাঁপতাল।
রবিচ্ছায়া (১৮৮৫)। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৮৬৯। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬৬৯, ৮৭২।
Thomas Moore-এর Irish Melodies-এর 'Oh ! the days are gone'-এর অনুবাদ।
দ্র. গীতবিতান ৩, গ্রন্থপরিচয় পৃ. ৯৯৫।

১২৮৫ আশ্বিন - ১২৮৬ মাঘ-ফাল্গুন। ১৮৭৮ সেপ্টেম্বর ২০ - ১৮৮০ ফেব্রুয়ারি

ইংলণ্ডের পথে— ইংলণ্ডে বাস ও প্রত্যাবর্তন— এই দেড় বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রধারা 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' নামে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়।

ডিভনশায়ারের টর্কিতে 'মগ্নতরী' নামে একটি কবিতা লিখিত হইয়াছিল। লণ্ডনে বাসকালে ডাক্তার স্কটের গৃহের স্মৃতি বহন করিয়া লিখিত হয় 'দুইদিন' নামক কবিতা। ইহা ছাড়া অন্য রচনা এই পর্বে লিখিত হইলেও সনাক্ত হয় নাই।

"আমেদাবাদে ও বোম্বাইয়ে মাসছয়েক কাটাইয়া আমরা বিলাতে যাত্রা করিলাম। অশুভক্ষণে বিলাতযাত্রার পত্র প্রথমে আত্মীয়দিগকে ও পরে ভারতীতে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।··· এই চিঠিগুলির অধিকাংশই বাল্যবয়সের বাহাদুরি। অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, আঘাত করিয়া, তর্ক করিয়া রচনার আতসবাজি করিবার এই প্রয়াস।··· ভালো লাগা, প্রশংসা করা, যেন একটা পরাভব, সে যেন দুর্বলতা ; এইজন্য কেবলই খোঁচা দিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার এই চেষ্টা আমার কাছে আজ হাস্যকর হইতে পারিত, যদি ইহার ঔদ্ধত্য ও অসরলতা আমার কাছে কষ্টকর না হইত।" —জীবনস্মৃতি

'ভারতী'তে 'য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র' নামে ১৩টি পত্র চৌদ্দমাসে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ অক্টোবরের (১২৮৫ কার্তিক) মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ লন্‌ডনে কয়েক ঘণ্টা মাত্র থাকিয়া ব্রাইটনে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নিকট উপস্থিত হন।

১২৮৬ ফাল্গুন। ১৮৮০ মার্চ

বিলাত হইতে কলিকাতায় ফিরিবার (১৮৮০ ফেব্রুয়ারি) পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' গীতিনাট্যের জন্য গান রচনা—

'আয় তবে সহচরি, হাতে হাতে ধরি ধরি'— সুর ছায়ানট। তাল কাওয়ালি

মানময়ী (১৮৮০)। স্বরলিপি— প্রতিভাদেবীকৃত 'সহজে গান অভ্যাস'। ভারতী ও বালক, ১২৯৩। আশ্বিন, পৃ. ৩৫২-৫৪।

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ১৯। গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ১৫২। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬) পৃ. ৪৪১। কাব্যগ্রন্থ (১৯০৩) পৃ. ৮৫। গান (১৯০৯) পৃ. ১৫৯। গীতবিতান (১৯৩১) পৃ. ১২৩। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৪১৪। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৩২১। স্বরলিপি গীতিমালা (১৮৯৮)। স্বরবিতান ২০।

ভারতী, ১২৮৬ ফাল্গুন, পৃ. ৫১৩-৫২২।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র (নবম পত্র) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য সমেত।

'প্রেম মরীচিকা'

ভারতী, ৩য় বর্ষ, ১২৮৬ ফাল্গুন, পৃ. ৫১২।

'ওকথা বল না তারে, কভু সে কপট নারে'—সুর ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

শৈশবসঙ্গীত (১৮৮৪)। রাগ-রাগিনী প্রদত্ত। রবিচ্ছায়া (১৮৮৫)। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৮৭৩। র-র, অ-২, পৃ. ৪৯৪। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬৭২, ৭৮৯।

১২৮৭ বৈশাখ। ১৮৮০ এপ্রিল

ভানুসিংহের কবিতা।

'দেখলো সজনী, চাঁদনি রজনী'

ভারতী, ৪র্থ বর্ষ, ১২৮৭ বৈশাখ, পৃ. ১।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪), পৃ. ৫৪-৫৭। ২০-সংখ্যক কবিতা। সুর বেহাগ।

কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬) অন্তর্গত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' অংশে 'সংশয়' নামে আছে ; পাঠ 'হম যব না রব সজনী' এইরূপ আছে। পৃ. ২৬।
গীতবিতান[৭] (১৯৬০) অন্তর্গত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তেও 'হম যব না রব সজনী' বলিয়া আছে। পৃ. ৭৬৩, ২৯নং।
র-র ২য় খণ্ডে নাই। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৫৯৩।
য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র (দশম পত্র) স্ত্রী-স্বাধীনতাবিষয়ক আলোচনা ও তর্ক। ভারতী, ১২৮৭ বৈশাখ, পৃ. ২৯-৩৭। ৯ খানি পত্র ১২৮৬ বৈশাখ (১৮৭৯ মে) হইতে ১২৮৬ ফাল্গুন (১৮৮০ মার্চ) অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দেশে প্রত্যাবর্তন সময় পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১২৮৬ চৈত্র মাসে পত্রধারা নাই ; পুনরায় ১২৮৭ বৈশাখে আরম্ভ হয়।

১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮০ মে

দুদিন [কবিতা]

'আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহার জাল' (লেখক— শ্রীদিকশূন্য ভট্টাচার্য)। ভারতী, ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৫৯-৬০। মালতী-পুঁথিতে ইহার পাঠান্তর আছে।

সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২)। র-র ১, পৃ. ৩২-৩৩। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১, পৃ. ২৫।

'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র'— (একাদশ পত্র) ভারতী, ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৬০-৬৭।

১২৮৭ আষাঢ়।

'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র'— (দ্বাদশ পত্র) ভারতী, ১২৮৭ আষাঢ়, পৃ. ১৩০-৩৬।

১২৮৭ শ্রাবণ

'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র'[৮]— (ত্রয়োদশ পত্র) ভারতী, ১২৮৭ শ্রাবণ, পৃ. ১৯২-৯৯।

---

৭ গ্রন্থপরিচয়ে আছে (পৃ. ৯১১) : "১৯-সংখ্যক গান ও উল্লেখিত গ্রন্থে 'দেখ লো সজনী'... র কবি কর্তৃক সংক্ষেপিত রূপ।" কিন্তু দুটি কবিতা সম্পূর্ণ পৃথক।

৮ রচনা শেষে 'ক্রমশঃ' শব্দ থাকায় মনে হয় রবীন্দ্রনাথ আরো পত্র লিখিয়াছিলেন যাহা সম্পাদক প্রকাশ করিতে চাহেন নাই, অথবা লেখক আরো লিখিবেন এই কথা মনে করিয়া 'ক্রমশঃ' লিখিয়াছিলেন। এই পত্র ১৮৮০ জানুয়ারি ১লা [১২৮৬ পৌষ ১৮] লিখিত। 'আজ নূতন বৎসরের প্রথম দিন'...'টর্কি থেকে বহুদিন হল আমরা আবার লন্ডনে এসেছি।' (য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, পৃ. ২০১-০২)। ইহার কয়েকদিন পরেই বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করেন।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র যাহা য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্ররূপে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় তাহার বিশ্লেষণ। (দ্র. শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ)

১২৮৭ ভাদ্র-আশ্বিন। ১৮৮০ সেপ্টেম্বর

'বাঙ্গালী কবি নয়'। ভারতী, ১২৮৭ ভাদ্র, পৃ. ২১৯-২৯।

'বাঙ্গালী কবি নয় কেন'। ভারতী, ১২৮৭ আশ্বিন, পৃ. ২৫৭-৭৫।

[প্রবন্ধ দুইটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালী কবি কেন' (বঙ্গদর্শন ১২৮২ পৌষ) প্রবন্ধের সমালোচনা। পরে এই দুইটি প্রবন্ধ ভাঙিয়া 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' নামে 'সমালোচনা' গ্রন্থে পুনর্লিখিত হইয়া প্রকাশিত হয় (১৮৮৮)। Marlow-র 'come live with me and be my wife' হইতে অনুবাদ 'ছবি কি আমার প্রিয়া, রবি মোর সাথে?' কোনো গ্রন্থভুক্ত ছিল না। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৮৬৯-৭০। ৪ পংক্তির ৭ স্তবক কবিতা। র-র, অ-২, পৃ. ৮২-৮৩

[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্র : রবীন্দ্রনাথকে ৮ই ভাদ্র ৫১ ব্রাহ্মাব্দ (১৮৮০, অগস্ট ২৩, ১২৮৭ সাল) লিখিতেছেন : "আগামী সেপ্টেম্বরে ইংলণ্ডে যাওয়া স্থির করিয়াছ এবং লিখিয়াছ যে আমি বারিষ্টার হইব।" রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃ. ১০২। দ্র. সমালোচনা, র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১৩, পৃ. ৬০৪।

১২৮৭ ভাদ্র-আশ্বিন। ১৮৮০ অগস্ট-অক্টোবর।

কামিনীফুল।

'ছি ছি সখা কি করিলে'

ভারতী, ১২৮৭ ভাদ্র, পৃ. ২২৯। রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল ঝাঁপতাল।

শৈশবসঙ্গীত (১৮৮৪) 'কামিনীফুল' নামক কবিতা। রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ৪০। ছায়ানট—ঝাঁপতাল। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬) পৃ. ২। কৈশোরক—'কামিনী' নামক কবিতা। গান (১৯০৯) পৃ. ৬৪। মিশ্র ছায়ানট— ঝাঁপতাল। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৯৪৮। ১ম সংস্করণে নাই। র-র, অ-১, পৃ. ৪৯৩। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৭২৯, ৭৮৮।

প্রথম পত্র : বিলাত পৌঁছিবার ৬ মাস পরে প্রকাশিত হয়— ১২৮৬ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়।

দ্বিতীয় পত্র : ১২৮৬ আষাঢ়।

তৃতীয় পত্র : ১২৮৬ শ্রাবণ (চতুর্থ পত্রের প্রথম অনুচ্ছেদ 'ভারতী'তে ইহার অঙ্গীভূত ভাবে ছাপা আছে)।

চতুর্থ পত্র : ১২৮৬ ভাদ্র (পঞ্চম পত্রের কিয়দংশ)।

পঞ্চম পত্র : ১২৮৬ আশ্বিন (পঞ্চম পত্রের অবশিষ্টাংশ)।

ষষ্ঠ পত্র : ১২৮৬ অগ্রহায়ণ (ভারতী সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ কৃত মন্তব্য ও টিপ্পনী সহ)।

সপ্তম পত্র : ১২৮৬ ফাল্গুন (বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন)।

অষ্টম পত্র : ১২৮৬ কার্তিক।

নবম পত্র : ১২৮৬ পৌষ (ভারতী সম্পাদকের ২৫টি ছোট বড় টিপ্পনী ও মন্তব্য সমেত)।

দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ (বা শেষ) পত্র যথাক্রমে ১২৮৭ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়।

শরতে প্রকৃতি

'কইগো প্রকৃতি রাণী'

ভারতী, ১২৮৭ আশ্বিন, পৃ. ২৮৫-৮৬।

হর-হৃদে কালিকা

'কে তুই লো হর-হৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে'

ভারতী, ১২৮৭ আশ্বিন, পৃ. ২৯১

শৈশবসঙ্গীত (১৮৮৪)। র-র, অ-১, পৃ. ৪৯৭। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ৭৯১।

['বাঙ্গালী কবি নয় কেন'— ভারতী, ১২৮৭ আশ্বিন, পৃ. ২৫৭-৭৫]

অকারণ কষ্ট [প্রবন্ধ]

ভারতী, ১২৮৭ আশ্বিন, পৃ. ২৮৭-৯৯।

সম্পাদকের বৈঠক। ডাকিনী: ম্যাকবেথ। ভারতী, ১২৮৭ আশ্বিন, পৃ. ২৯২-৯৩। পূর্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১২৮৭ কার্তিক। ১৮৮০ নভেম্বর

ভারতী, ১২৮৭ কার্তিক, পৃ. ৩৩৬-৪৯।

ভগ্নহৃদয়। গীতিকাব্য। প্রথম সর্গ।

উপহার : শ্রীমতী হে—কে।

'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা', পৃ. ৩৩৬।

উপহার কবিতা-গানটির একটি পাঠ মালতী-পুঁথি মধ্যে আছে। ১২৮৭ মাঘোৎসবের সময় গানটির ভাষার সামান্য বদল করিয়া ব্রহ্মসঙ্গীতরূপে গীত হয়। মূল ১০ পংক্তি স্থলে ৮ পংক্তি হয়। দ্র. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮০২ শক। ১২৮৭ ফাল্গুন)।

'ভগ্নহৃদয়' পুস্তকাকারে প্রকাশকালে (১৮৮১ জুন) এই কবিতা-গানটির ১০ পংক্তিকে দীর্ঘ করিয়া ৩০ পংক্তি কবিতা 'উপহার' রূপে রচিত হয়। দ্র. র-র, অ-১, পৃ. ১২৩।

র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ৯৬।

'ক্ষমা কর মোরে সখি, শুধায়োনা আর পৃ. ৩৪০।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'স্বপ্নময়ী'-নাটক (১৮৮১) : তৃতীয় অঙ্ক। সুর ঝিঁঝিট।

ভগ্নহৃদয় (১৮৮১ জুন)। রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ৮৯। ঝিঁঝিট— কাওয়ালি। গান (১৯০৯) পৃ. ১৭৮। শেষ ২ পংক্তি বর্জিত। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৮৮০। র-র, অ-১, পৃ. ১৩০। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬৭৭। ৫, পৃ. ১০১।

[ভগ্নহৃদয় ১ম সর্গ। ভারতী, ১২৮৭ কার্তিক, পৃ. ৩৪৩-এ গান বলিয়া উক্ত দীর্ঘ কবিতা 'কে গো বলে দেবে এ কেমন ভাব' (২৩ পংক্তি) সুরহীন বলিয়া কোথাও গান বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।]

১২৮৭ অগ্রহায়ণ। ১৮৮০ ডিসেম্বর

ভারতী, ১২৮৭ অগ্রহায়ণ।

ভগ্নহৃদয়। গীতিকাব্য। দ্বিতীয়-তৃতীয় সর্গ। পৃ. ৩৫১-৫৭।

গান: 'নাচ্ শ্যামা তালে তালে'

২য় সর্গ। পৃ. ৩৫১।

ভগ্নহৃদয় (১৮৮১)। বিবাহ উৎসব (১৮৮৪ মার্চ) গীতিনাট্যের অন্তর্গত। রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ৯১। সুর দেওয়া নাই। গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ২০১। খাম্বাজ। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬) পৃ. ৫। কৈশোরক খণ্ডে 'শ্যামা' নামক কবিতা।

গান (১৯০৯) পৃ. ১১৪। সুর দেওয়া নাই। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৭১; সংক্ষেপিত। ১ম সংস্করণে নাই। র-র, অ-১, পৃ. ১৪০। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৫৯৮। ৫, পৃ. ১০৮। গানটি ছোটো, ভাষা ও পংক্তির পার্থক্য আছে। স্বরবিতান ৫১।

ভানুসিংহের কবিতা, ১১-সংখ্যক।

'সখি লো, সখি লো, নিকরুণ মাধব', পৃ. ৩৮৪।

(পুরাতন কবিতা, প্রথম প্রকাশিত হইল। ভানুসিংহের কবিতাগুচ্ছের অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে হয়।)

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪) পৃ. ৪৫। ১৮-সংখ্যক। রাগিণী দেশ। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬) পৃ. ২৫। 'বিদায়' নামক কবিতা। র-র, ২, পৃ. ২১। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে ১৬-সংখ্যক কবিতা। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৬২। ১৭-সংখ্যক। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১, পৃ. ১৪১। ৪, পৃ. ৫৯২। ১৭-সংখ্যক।

গোলাপ-বালা (গোলাপের প্রতি বুলবুল)

'বলি, ও আমার গোলাপ-বালা'— রাগিণী বেহাগ, পৃ. ৩৯৮।

শৈশবসঙ্গীত (১৮৮৪) পৃ. ১০২-১০৪। রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ২৬। বেহাগ— খেমটা। গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ১৫৬। বেহাগ— খেমটা। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬) পৃ. ১। কৈশোরক অংশে 'নিশীথ-গীতি' নামক কবিতা। কাব্যগ্রন্থ (১৯০৩) ৮ম গান। পৃ. ৪। বেহাগ— খেমটা। গান (১৯০৯) পৃ. ৬০। বেহাগ— একতাল। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৮৭১। র-র, অ-১, পৃ. ৪৯৫-৯৬। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬৭০। ৫, পৃ. ৭৯০। স্বরবিতান ২০।

(আহমদাবাদে রচিত, ১৮৭৮। জীবনস্মৃতি, পৃ. ৮৬, ২০৪। পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্‌ধৃত।)

১২৮৭ পৌষ। ১৮৮০ ডিসেম্বর

ভগ্নহৃদয়। গীতিকাব্য। চতুর্থ সর্গ। পৃ. ৪০৩-০৬।

(চতুর্থ সর্গে 'কবি' শীর্ষক অংশে ৮টি গান বলিয়া কবিতা আছে। ১ম ও ৭ম গান দুইটি 'রবিচ্ছায়া'য় গান বলিয়া ধরা হইয়াছে।)

১. 'বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই' (প্রথম গান)

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ৩। খট্ একতালা। কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৬) পৃ. ৬। কৈশোরক অংশে 'প্রথম দর্শন' নামক কবিতা। গান (১৯০৯) পৃ. ১১০। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৭১। র-র, অ-১, পৃ. ১৫২। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ১১৭।

২. 'দু জনে মিলিয়া যদি ভ্রমিগো বিপাশা পারে' (সপ্তম গান)

র-র, অ-১, পৃ. ১৫৬। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ১২০।

ভারতী, ১২৮৭ পৌষ।

পথিক। কবিতা।

'উঠ জাগ তবে, উঠ জাগ সবে', পৃ. ৪২৭-৩১।

শৈশবসঙ্গীত (১৮৮৪) পৃ. ১৩১-৪৯। র-র, অ-১, পৃ. ৫১৪-২৬। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৮০৪।

মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থ' (১৩১০) প্রথম খণ্ডের 'যাত্রা' অংশের 'পথিক' কবিতা শৈশবসঙ্গীতের কবিতার সারাংশ লইয়া সংকলিত পৃ. ৮-১২।

'বল দেখি সখি লো, নিরদয় লাজ তোর'—স্বর বেহাগ। তাল কাওয়ালি।

স্বরদাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৪১৭। ১ম সংস্করণে ধরা হয় নাই। স্বরলিপি-গীতিমালা পৃ. ২৯।

[অন্য কোনো গীতগ্রন্থে নাই।]

১২৮৭ মাঘ। ১৮৮১ জানুয়ারি

ভারতী, ১২৮৭ মাঘ।

ভগ্নহৃদয়। গীতিকাব্য। পঞ্চম সর্গ। পৃ. ৪৭৩-৭৮।

গান: 'আঁধার শাখা উজল করি'। প্রমোদের গান।

(গানটি আহমদাবাদে ১৮৭৮ সালে রচিত। জীবনস্মৃতি পাণ্ডুলিপির পাঠ পৃ. ২০৪ দ্রষ্টব্য)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকের (১৮৮১) ২য় অঙ্কে গানটি আছে। গৌড়সারং—কাওয়ালি।

ভগ্নহৃদয় (১৮৮১)। রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ১৭। গৌড়সারং— যৎ। গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ১৪৯। গৌড়সারং-যৎ কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৬) পৃ. ৭। কৈশোরক অংশে 'একাকিনী' নামক কবিতা।

গান (১৯০৯) পৃ. ৬২। গৌড়সারং-যং। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৬৯। র-র, অ-১, পৃ. ১৬৫। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৫৯৬। ৫, পৃ. ১২৬। স্বরলিপি গীতিমালা। স্বরবিতান ২০।

গান : 'কে আমার সংশয় মিটায়'

ভগ্নহৃদয় ৫ম সর্গ। নীরদের গান। পৃ. ৪৭৬।

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ৮৭। কালাংড়া— কাওয়ালি। গীতবিতান-এ নাই। অন্যান্য গীতগ্রন্থেও নাই। র-র, অ-১, পৃ. ১৬৪। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ১২৬।

গান : 'খেলা কর, খেলা কর কামিনী কুসুমগুলি'

ভগ্নহৃদয় ৫ম সর্গ। নলিনীর গান। পৃ. ৪৭৫। রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) কালাংড়া— কাওয়ালি। র-র, অ-১, পৃ. ১৬৩। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৭০। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৫৯৭। ৫, পৃ. ১২৪-২৫।

শীত। কবিতা : 'পাখি বলে, আমি চলিলাম', পৃ. ৪৫৫-৫৬।

[কবিতাটি পড়িয়া মনে হয় বিলাতের স্মৃতি বহন করিতেছে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' মুদ্রিত না করিয়া 'প্রভাতসঙ্গীতে' উহা মুদ্রিত হয় দুই বৎসর পরে (১৮৮৩)। 'প্রভাতসঙ্গীতে'র পরবর্তী সংস্করণে বর্জিত হয় এবং বহু বৎসর পরে কাব্যগ্রন্থ ৭ম, (১৯০৩) 'শিশু' গ্রন্থভুক্ত করা হয়। দ্র. র-র ৯, পৃ. ৮৪-৮৬।

৫১শ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উৎসব উপলক্ষে রচিত ও গীত ব্রহ্মসংগীত :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮০২ শক (১২৮৭) ফাল্গুন ২০৬-১২।

১. 'তুমি কি গো পিতা আমাদের'। রাগ ভয়রোঁ। তাল কাওয়ালি।

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ১৩১। গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ২৭৯। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬) পৃ. ৪৪৭। কাব্যগ্রন্থ ৮ম (১৯০৩) পৃ. ২১৫। গান (১৯০৯) পৃ. ২৮৩। ধর্মসঙ্গীত (১৯১৪) পৃ. ১৭৫। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৮২৩। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬৪০। স্বরবিতান ৪৫।

২. 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ'। রাগিণী ভৈরবী। তাল ঝাঁপতাল।

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ১০৫। গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ২৮২। কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৬) পৃ. ৪১৯। কাব্যগ্রন্থ ৮ম (১৯০৩) পৃ. ২৪১। গান (১৯০৯) পৃ. ২৯৯। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৮২৪। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬৩৮। স্বরবিতান ৮।

৩. 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। আলাহিয়া— ঝাঁপতাল

[ভারতী, ১২৮৭ কার্তিক দ্রষ্টব্য]

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ১৩২। গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ২৮০। কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৬) পৃ. ৪৪৮। কাব্যগ্রন্থ ৮ম (১৯০৩) পৃ. ২১৭। গান (১৯০৯) পৃ. ২৮৫। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৩১৮। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ২৪৬। ব্রহ্মসঙ্গীত ৩। স্বরবিতান ২৩।

৪. 'আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্রমন'। খট্— ঝাঁপতাল।

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ১৩১। গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ২৭৬। কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৬) পৃ. ৪৪৭।

গান (১৯০৯) পৃ. ৩৭২। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৮১৯। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬৩৭। স্বরবিতান ৪৫।

৫. 'এ কি এ সুন্দর শোভা'। ইমন-ভূপালি— কাওয়ালি।

বালক (১২৯২ শ্রাবণ) পৃ. ১৯২-৯৩।

স্বরলিপি— প্রতিভাদেবী-কৃত 'গান-অভ্যাস'।

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ১৩৩। গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ২৭৭। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬) পৃ. ৪৪৭। কাব্যগ্রন্থ ৮ম (১৯০৩) পৃ. ১৮৯। গান (১৯০৯) পৃ. ২৬৯। ধর্মসঙ্গীত (১৯১৪) পৃ. ১৬৯। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ২১৪। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ১৬৫। ব্রহ্মসঙ্গীত ৩। স্বরবিতান ২৩।

৬. 'দিবানিশি করিয়া যতন'। ধুন-কাওয়ালি।

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ১৩৩। গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ২৮০। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬) পৃ. ৪৪৮। কাব্যগ্রন্থ ৮ম (১৯০৩) পৃ. ২২৪। গান (১৯০৯) পৃ. ২৮৯। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৮২০। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ ৬৩৮। স্বরবিতান ৪৫।

৭. কোথা আছ প্রভু এসেছি দীনহীন। গুজরাটি ভজন। তাল একতালা।

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ১৩৩। গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ২৮০। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬) পৃ. ৪৪৮। কাব্যগ্রন্থ ৮ম (১৯০৩) পৃ. ২২৪। গান (১৯০৯) পৃ. ২৮৯। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৮২০। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬৩৮। স্বরবিতান ২৩।

১২৮৭ ফাল্গুন। ১৮৮১ ফেব্রুয়ারি

ভারতী ১২৮৭ ফাল্গুন।

দুঃখের আহ্বান।

'আয় দুঃখ আয় তুই', পৃ. ৫৪২-৪৪।

সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২), দুঃখ আবাহন। র-র ১, পৃ. ১৫। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১, পৃ. ১৩।

বাল্মীকি-প্রতিভা। গীতিনাট্য।

জোড়াসাঁকোর বাটিতে প্রথম অভিনীত হয় ১২৮৭ ফাল্গুন ১৬, শনিবার (১৮৮১ ফেব্রুয়ারি ২৬)। অভিনয়ের পূর্বে পুস্তক মুদ্রিত হয়। সুতরাং গানগুলি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। ১ম সংস্করণে ২৭টি গান ও ১টি কবিতা আছে। র-র, অ-১, পৃ. ৫২৯-৪২।

"বাল্মীকি-প্রতিভায় অক্ষয়বাবুর [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী] কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সঙ্গীতের দুই-এক স্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।"

—জীবনস্মৃতি

১২৯২ ফাল্গুনে বাল্মীকি-প্রতিভার ২য় সংস্করণে "অনেকগুলি গান পরিবর্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্য হইতে গৃহীত।"

১২৮৭ ফাল্গুন। ১৮৮১ মার্চ

ভারতী ১২৮৭ ফাল্গুন।

ভগ্নহৃদয়। ষষ্ঠ সর্গ। পৃ. ৫০৭-১৩।

র-র, অ-১, পৃ. ১৬৯-৮১। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ১২৯-৩৮।

এই সর্গভুক্ত গান :

১. 'নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়'

গানটির সুরের উল্লেখ নাই। 'রবিচ্ছায়া' গ্রন্থে প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পাইয়াছে ; ইহার কারণ, আমেদাবাদ বাসকালে নিজের সুর দেওয়া প্রথম গান এইটি। (জীবনস্মৃতি, পৃ. ৮৬। ২০৪ পৃষ্ঠায় পাণ্ডুলিপি পাঠে এই গানটির ৪ পংক্তি উদ্‌ধৃত দেখা যায়)।

ভগ্নহৃদয় (১৮৮১) ১ম সং। 'কবির গান'।

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ১। মিশ্র আড়াঠেকা। গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ১৩৫। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬) পৃ. ৪৩৮। গান (১৯০৯) পৃ. ৬৭। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৬৮। র-র, অ-১, পৃ. ১৭০। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৫৯৬। ৫, পৃ. ১৩০। স্বরগীতিমালা। স্বরবিতান ২০।

২. 'সখি, ভাবনা কাহারে বলে'

ভগ্নহৃদয় (১৮৮১) ১ম সং ৬ষ্ঠ সর্গ। চপলার গান। রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ৮৫। বেহাগ-খাম্বাজ একতালা। গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ১৯৯। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬) পৃ. ৮। কৈশোরকে 'সমস্যা' নামক কবিতা। গান (১৯০৯) পৃ. ১৭১। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৭২। র-র, অ-১, পৃ. ১৭৯। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৫৯৯। ৫, পৃ. ১৩৭। স্বরবিতান ২০।

"বিলাতে আর-একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে [স্টীমারে S. S. Oxus February 1880], কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি। ভগ্নহৃদয় নামে ইহা ছাপানো হইয়াছিল…।" "ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম, তখন আমার বয়স আঠারো।"

—জীবনস্মৃতি

১২৮৮ বৈশাখ। ১৮৮১ এপ্রিল

১৮৮১ সালের মে মাসে আর-একবার বিলাত যাইবার কথা হয় ; তৎপূর্বে রবীন্দ্রনাথের দুইখানি বই 'ভগ্নহৃদয়' ও 'রুদ্রচণ্ড' মুদ্রিত হইয়াছিল।

[সরকারী কাগজে যথাক্রমে ১৮৮১ জুন, ২৫ তারিখ দেখা যায়। দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-গ্রন্থপরিচয় (২য় সং) পৃ. ৩-৪]

ভগ্নহৃদয় গীতিকাব্য 'কেহ যেন নাটক বলিয়া মনে না করেন'— এ কথা কবি ভূমিকায় লিখিয়াছেন। অথচ 'কাব্যের পাত্রগণ' আছেন। ১২৮৭ কার্তিক মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ১-৬ সর্গ মুদ্রিত হয়।

অবশিষ্ট অংশ পুস্তকাকারে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হয়। ভারতীর উৎসর্গগীত 'তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' ইত্যাদি ১০ পংক্তির কবিতা গানের পরিবর্তে 'উপহার শ্রীমতী হে'—এর উদ্দেশে ৫ স্তবকের ৩০ পংক্তি কবিতা লিখিত হয়।

'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইলে ১ম সর্গে একটি নূতন গান পাই, যাহা ভারতী ১২৮৭ কার্তিক মাসে মুদ্রিত ছিল না।

গান— 'কতদিন একসাথে ছিনু ঘুমঘোরে'

ভগ্নহৃদয় (১৮৮১)। ১ম সর্গ। রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ৯০। ভৈরবী-কাওয়ালি। গান (১৯০৯) পৃ. ২০০। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৭০। র-র, অ-১, পৃ. ১০৯।

র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৫৯৭। ৫, পৃ. ১০৭।

(গানটির ভাষা দেখিয়া মনে হয় দ্বিতীয়বার বিলাত যাইবার জন্য যাত্রার প্রাক্কালে লিখিত— 'লইয়া দলিত মন হইনু প্রবাসী')

ভগ্নহৃদয় ৭ম সর্গ হইতে ৩৪শ সর্গ পর্যন্ত পুস্তক মধ্যে প্রকাশ পায়। এই কয় সর্গে যে গান আছে তাহার তালিকা—

৭ম সর্গ—'কাছে তার যাই যদি, কত যেন পায় নিধি' (অনিলের গান)।

ভগ্নহৃদয়। ৭ সর্গ। অনিলের গান— কাছে তার যাই যদি

ভগ্নহৃদয় (১৮৮১)। র-র, অ-১, পৃ. ১৮১। শৈশবসঙ্গীত (১৮৮৪)। লাজময়ী।

(মূল ও এইটির মধ্যে পাঠভেদ আছে)। র-র, অ-১, পৃ. ৪৯৩। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ১৩৮। ৪, পৃ. ৫৯৬। রবিচ্ছায়া (১৮৮৫), গীতবিতান পৃ. ৭৬৯। স্বরবিতান ২০।

১২৮৮ বৈশাখ। ১৮৮১ এপ্রিল

ভগ্নহৃদয়

৮ম সর্গ—'যে ভাল বাসুক— সে ভাল বাসুক' (চপলার গান)

গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ১৯৬। গান (১৯০৯) পৃ. ১৭২। রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ৮৩। মিশ্র-একতালা, গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৭২। র-র, অ-১, পৃ. ১৯০। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ১৪৫। ৪, পৃ. ৫৯৯।

৯ম সর্গ—'কি হল আমার? বুঝিবা সজনি হৃদয় হারিয়েছি' (নলিনীর গান)

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ৮২। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৪০৯ ('প্রেম' অংশে স্বরবিতান ২০। কবির দ্বারা সংকলিত; কিন্তু ভাষা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত)। র-র, অ-১, পৃ. ১৯১। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ১৪৬। ৪, পৃ. ৩১৬।

১০ম সর্গ—'কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার'। মুলতান-আড়াঠেকা

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ৩৫। কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৬) পৃ. ৪৩৯। গান (১৯০৯) পৃ. ১৭৫। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৬৯। র-র, অ-১, পৃ. ১৯৯। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ১৫১। ৪, পৃ. ৫৯৭।

১১শ সর্গ—'কিছুই ত হল না' (অনিলের গান)

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ৩৬। ৭ পংক্তি। কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৬) পৃ. ৯। কৈশোরক অংশে 'ছায়া' নামে কবিতা। ৭ ছত্র গানের ভাষা ছাড়া আরো ১৬ ছত্র আছে। সে অংশ ভগ্নহৃদয় হইতে উদ্‌ধৃত। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৮৮২। স্বরবিতান ৩৫। র-র, অ ১, পৃ. ১৯৯। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ১৫১। ৪, পৃ. ৬৭৯।

১৯ সর্গ—'বুঝেছি বুঝেছি সখা, ভেঙ্গেছে প্রণয়'

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ৮১। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৭১। র-র, অ ১, পৃ. ২৩৭। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ১৮০। ৪, পৃ. ৫৯৮। স্বরবিতান ২০।

ভগ্নহৃদয় ২০ সর্গে নলিনীর একটি গান আছে 'সখি লো, শোন লো তোরা শোন, আমি যে পেয়েছি এক মন' ইত্যাদি কিন্তু সুর জানা না থাকায় গীতবিতানের অন্তর্গত হয় নাই। র-র, অ ১, পৃ. ২৪১। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ১৮২।

২২ সর্গ—'তুই রে বসন্ত সমীরণ' (বিনোদের দীর্ঘ গান)।

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ৩৩। সংক্ষেপিত (১৫ পংক্তি)। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৮৮৩, দ্র. পৃ. ৯৯৬। র-র, অ ১, পৃ. ২৪৭। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ১৮৭। ৪, পৃ. ৬৭৯। স্বরবিতান ২০।

১২৮৮ বৈশাখ। ১৮৮১ এপ্রিল

রুদ্রচণ্ড নাটিকায় দু'টি গান

১. 'বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল'

রাগিণী—মিশ্রললিত।

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ৯৮। সুর প্রদত্ত নাই। কাব্যগ্রন্থ (১ ৯৬)। কৈশোরক অংশে কবিতার নাম 'আরম্ভে'। গীতবিতান (১৯৬০), পৃ. ৭৭৩। সংক্ষেপিত। র-র, অ ১, পৃ. ২৮৮। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৫৯৯। ৫, পৃ. ২১৭। স্বরবিতান ৩৫।

২. 'তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল'

রাগিণী—মিশ্র-গৌড়সারং।

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ২৫। কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৬)। কৈশোরক অংশে 'অবসান' নামে কবিতা। 'তরুতলে চ্যুতবৃন্ত মালতীর ফুল' এইরূপ পাঠ। র-র, অ ১, পৃ. ২৯০। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৫, পৃ. ২১৯। ৪, পৃ. ৬০০। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৭৩। স্বরবিতান ২০।

বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা (প্রবন্ধ)

ভারতী, ১২৮৮ বৈশাখ, পৃ. ১৮-২৭।

[প্রবন্ধটির মধ্যে সমুদ্র ও সমুদ্রতীরের বর্ণনা এতবার আছে যে পড়িয়া মনে হয়, রচনাটি বিলাতে রচিত]

১২ পংক্তির একটি নিজ কবিতা (১২ পংক্তি) আছে—'দক্ষিণের দ্বার খুলি মৃদুমন্দ গতি' ইত্যাদি। একটি ইংরেজি কবিতা হইতে উদ্ধৃতি আছে।

সমালোচনা (১৮৮৮)। র-র, অ ২, পৃ. ৯২-৯৬। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১৩, পৃ. ৬১৩।

সঙ্গীত ও ভাব। প্রবন্ধ। ১২৮৮ বৈশাখ ৮। ১৮৮১ এপ্রিল ১৯

[মেডিক্যাল কলেজ হলে বেথুন সোসাইটির উদ্যোগে সঙ্গীত সম্বন্ধে ভাষণ। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি]

ভারতী, ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৬২-৬৯।

র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১৪, পৃ. ৮৭৫।

[১৮৮১ এপ্রিল ২০ রবীন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের স্টীমারযোগে বিলাতযাত্রা; সহযাত্রী আশুতোষ চৌধুরী। মাদ্রাজ পৌঁছাইয়া বিলাত যাত্রার সংকল্প ত্যাগ করিয়া দুজনেরই প্রত্যাবর্তন। মুসূরিতে মহর্ষির সহিত দেখা করিয়া আসিয়া চন্দননগরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথদের সহিত মোরন সাহেবের বাড়িতে বাস; মনে হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ায় এখানে আসেন।]

১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮১ মে-জুন

ভারতী, ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ।

তারকার আত্মহত্যা। কবিতা।

'জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে' পৃ. ৭৭-৭৮।

কবিতার আরম্ভে Shelley হইতে অনূদিত চারিটি পংক্তি আছে [গ্রন্থে নাই]:

'হে তারকা ছুটিতেছ আলোকের পাখা ধরে,
তোমারে শুধাই আমি বল গো বল মোরে—
তুমি তারা, রজনীর কোন গুহা মাঝে যাবে ?
আলোকের ডানাগুলি মুদিয়া রাখিতে পাবে ?'

সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২)। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬) ৪০। মোহিত সেন কাব্যগ্রন্থ (১৯০৩) ১ম ভাগ, ১ম খণ্ডে হৃদয়-অরণ্য অংশে দ্রষ্টব্য— পৃ. ২২-২৪ (সামান্য পরিবর্তন আছে)। র-র, ১, পৃ. ৬-৭। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১, পৃ. ৬।

ভারতী, ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ।

জুতা ব্যবস্থা। প্রবন্ধ। পৃ. ৫৮-৬২।

[Englishman পত্রিকার কোনো মন্তব্যকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। ভুলক্রমে রচনার কাল ১৮৯০ মুদ্রিত হইয়াছিল, উহা ১৮৮০ হইবে।]

ভারতী, ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ।

যথার্থ দোসর। প্রবন্ধ। পৃ. ৭৮-৮৫।

[প্রবন্ধারম্ভে Shelley হইতে অনুবাদ আছে ১২ পংক্তি।]

১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮১ জুন

ভারতী, ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ।

চীনে মরণের ব্যবসায়। প্রবন্ধ। পৃ. ৯৩-১০০।

['The Indo-British Opium Trade' by Dr. Theodre Christliel. Translated from German by David B. 'Croom' প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধ।]

[ভারতী, ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ভারতের জাতীয়তা সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ; যথা ১. জাতীয়তা ও বিজাতীয়তার উপদ্রব, ২. জাতীয়তার নিবেদন ও ৩. জাতীয়তার নিবেদনে বিজাতীয়তার বক্তব্য ; এগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনা কি না বলা যায় না।]

১২৮৮ আষাঢ়। ১৮৮১ জুলাই

ভারতী, ১২৮৮ আষাঢ়।

গোলামচোর। প্রবন্ধ। পৃ. ১১২-১৫।

ভারতী, ১২৮৮ আষাঢ়।

'সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা'। [হার্বার্ট স্পেন্সরের মত] পৃ. ১১৫-১২২।

স্বাঃ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১৪, পৃ. ৮৮১। পূর্বপ্রকাশিত অধিকাংশ রচনাই অস্বাক্ষরিত।

ভারতী, ১২৮৮ আষাঢ়।

জাপানের বর্ত্তমান উন্নতি। পৃ. .২২-১৩৩।

[এই প্রবন্ধের মধ্যে একটি দীর্ঘ জাপানী কবিতার অনুবাদ আছে। 'কড়ি ও কোমল' (বিদেশী ফুলের গুচ্ছ) মধ্যে সন্নিবেশিত হয়। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬)-র অনুবাদ অংশের শেষ কবিতা 'বাতাসে অশথ পাতা পড়িছে খসিয়া'—পৃ. ৪৭৫-৭৬। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪র্থ খণ্ডে 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' মধ্যে সন্নিবেশিত, পৃ. ৮৬৮। 'কোনো জাপানী কবিতার ইংরাজি অনুবাদ হইতে।' রবীন্দ্র-রচনাবলীর কড়ি ও কোমলে নাই। দ্র. কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) ১ম সং। চলতি কড়ি ও কোমলে আছে।

ভারতী, ১২৮৮ আষাঢ়।

নিমন্ত্রণসভা। প্রবন্ধ। পৃ. ১৩৯-১৪৫।

ভারতী, ১২৮৮ আষাঢ়।

সুখের বিলাপ। কবিতা। 'অবশ নয়ন নিমিলিয়া'। পৃ. ১৩৩-৩৫।

সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২)।

কাব্যগ্রন্থ (১৯০৩—মোহিতলাল সেন সম্পাদিত) 'হৃদয়ারণ্য' অংশে পরিমার্জিত রূপ, ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড পৃ. ২৫-২৬। র-র ১, পৃ. ১১-১৩। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১, পৃ. ১০।

সম্পাদকের বৈঠক (অনুবাদ) পৃ. ১৪৬-১৪৮।

১. V. Hugo 'ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া' (প্রভাতসঙ্গীত) শিশু।

২. " 'যে তোরে বাসেরে ভালো (প্রভাতসঙ্গীত) শিশু।

৩. " 'কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস' (প্রভাতসঙ্গীত)।

৪. " 'মহীয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম' (প্রভাতসঙ্গীত)।

৫. Mrs. Browning 'ওই আদরের নামে ডেকো সখা মোরে' (কড়ি ও কোমল)।

৬. Moore 'নিদাঘের শেষ গোলাপ' (কড়ি ও কোমল)।

৭. " 'দিনরাত্রি নাহি মানি'।

৮. " 'দামিনীর আঁখি কিবা' (দ্র. মালতী-পুঁথি)

[মনে হয় অনুবাদগুলি ১৮৭৮-এ আহমদাবাদ-বোম্বাই বাসকালে রচিত হইয়াছিল। মালতী-পুঁথিতেও কিছু কিছু পাওয়া যায়।]

কড়ি ও কোমলে 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' নামে সংগৃহীত ছিল। রবীন্দ্র-রচনাবলীর কড়ি ও কোমলে বর্জিত। র-র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্করণে ৪র্থ খণ্ডে 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' পৃ. ৮৫২-৭২ দ্রষ্টব্য।

ভারতী, ১২৮৮ আষাঢ়।

১২৮৮ শ্রাবণ। ১৮৮১ জুলাই

কাব্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন। প্রবন্ধ। পৃ. ১৪৯-৫৫

(পাদটীকায় Tennyson-এর De Profundis-এর সমালোচনা আছে।)

সমালোচনা (১৮৮৮)।

র-র, অ ২, পৃ. ৯২- ৭।

ভারতী, ১২৮৮ শ্রাবণ।

[বিবাহসঙ্গীত রচনা: 'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি', 'শুভদিনে এসেছে দোঁহে', 'জগতের পুরোহিত তুমি'—এই তিনটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচিত হয় রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলার সহিত কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে। "এই বিবাহ প্রসঙ্গে কোন ব্রাহ্ম সুকবি কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করেন।" "বিবাহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হওয়াতে রাজনারায়ণবাবু ও আদি ব্রাহ্মসমাজের কোন ব্রাহ্মই উহাতে যোগ দিতে সম্মত হন নাই।" রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় সাধারণ ব্রাহ্ম-

সমাজ মন্দিরে অথবা নিকটস্থ কোন স্থানে গিয়া গান কয়টি শিখাইয়া দেন ; গায়কদের মধ্যে তরুণ নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (রামমোহন জীবনীকার), সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি ছিলেন ।]

১. 'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি'

রাগিণী সাহানা । তাল ঝাঁপতাল

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৮০৩ শক (১২৮৮) ভাদ্র, পৃ. ৯৮।

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ১৪১। গানের বহি (১৮৯৬) পৃ. ৪০২। কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৬) পৃ. ৪৬৬। কাব্যগ্রন্থ ৮ম (১৯০৩) পৃ. ৩৩৩। গান (১৯০৯) পৃ. ১৪১। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৬০৯। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৪৬৯। স্বরবিতান ৫৫।

২. 'শুভদিনে এসেছে দোঁহে'—বেহাগ

অন্যপাঠ—'আজি এ সন্তান দুটি মিলিছে তোমার'।

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ১৪২। গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ৪০৪। কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৬) পৃ. ৪৬৭। কাব্যগ্রন্থ ৮ম (১৯০৩) পৃ. ৩৩৫। গান (১৯০৯) পৃ. ৪০২। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৬১০। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৪৭১। স্বরবিতান ৮।

[দ্র. মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৫৭]

যোগেন্দ্রনাথ বসু (রাজনারায়ণ বসুর পুত্র)-কে লিখিত পত্রে এই গানে সামান্য পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—'মহাগুরু দুটি ছাত্র এসেছে তোমার' ইত্যাদি। জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল (পাণ্ডুলিপি পত্র)।

৩. 'জগতের পুরোহিত তুমি'। সুর খাম্বাজ। তাল একতালা

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ১৫৫। গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ৩৯৯। কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৬) পৃ. ৪৬৬। কাব্যগ্রন্থ ৮ম (১৯০২) পৃ. ৩৩২। গান (১৯০৯) পৃ. ৪০১। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৮৫৩। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬৬৪।

ভানুসিংহের কবিতা।

'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান' পৃ. ১৯৬।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী—২১-সংখ্যক। রাগিণী পূরবী (১৮৮৪) পৃ. ৫৮-৬০।

রবিচ্ছায়া (১৮৮৫) পৃ. ৪৬। ভৈরবী—কাওয়ালি। গানের বহি (১৮৯৩) পৃ. ৮০। ভৈরবী—একতালা। কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৬) ৬, 'মরণ' খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭। গান (১৯০৯) পৃ. ১৮৫। র-র ২, পৃ. ২৪। ১৯নং। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১, পৃ. ১৪২। ১৯নং। গীতবিতান (১৯৬০) 'প্রেম' পর্যায়ভুক্ত, পৃ. ৩৪২। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ২৬৪। স্বরবিতান ২১।

ভারতী, ১২৮৮ শ্রাবণ।

আশার নৈরাশ্য।

'ওরে আশা, কেন তোর হেন দীন বেশ' পৃ. ১৭৩।

সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২)। মোহিত সেন -সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪। সংক্ষেপিত।
র-র ১, পৃ. ৮। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১, পৃ. ৮।
ভারতী, ১২৮৮ শ্রাবণ।

১২৮৮ শ্রাবণ। ১৮১৮ অগস্ট (১৮৮১)

প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ। বিদ্যাপতি।
(অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি'র সমালোচনা।) পৃ. ১৭৪-৮৪।
ভারতী, ১২৮৮ শ্রাবণ।

চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়। প্রবন্ধ। পৃ. ১৮৪-৮৯।
ভারতী, ১২৮৮ শ্রাবণ।

বিবিধ প্রসঙ্গ। [১] পৃ. ১৯০-৯৬
[প্যাস্কেলের ছোটো চিঠি লেখা সম্বন্ধে মত। বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩ সেপ্টেম্বর) গ্রন্থে নাই।]
মনের বাগানবাড়ি | গরিব হইবার সামর্থ্য | কিস্তু-ওয়ালা | দয়ালু-মাংসাশী | র-র, অ ১, পৃ. ৩৪৩-৪৮।
র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১৪, পৃ. ৫৪৫-৪৮।
ভারতী, ১২৮৮ শ্রাবণ।

১২৮৮ ভাদ্র।

বিবিধ প্রসঙ্গ। [২] পৃ. ২৩৮-২৪৪।
[শূন্য | স্ত্রৈণ | জমাখরচ | মনোগণিত | নৌকা, বসন্ত ও বর্ষা] | বিবিধ প্রসঙ্গ গ্রন্থে (১৮৮৩ সেপ্টেম্বর) ক্রম পরিবর্তিত দেখা যায়। র-র, অ ১, পৃ. ৩৬৬-৭১, ৩৫৬। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১৪, পৃ. ৫৬১-৬৪; ৫৫৫।
ভারতী, ১২৮৮ ভাদ্র।

দারোয়ান। প্রবন্ধ। পৃ. ২১৫-১৯।

১২৮৮ ভাদ্র। ১৮৮১ সেপ্টেম্বর

শিশির। 'শিশির কাঁদিয়া শুধু বলে' পৃ. ২১৯-২০
সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২)। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬) পৃ. ৫২। র-র ১, পৃ. ৩৫। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১, পৃ. ২৮।
ভারতী, ১২৮৮ ভাদ্র।

প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ। (উত্তর-প্রত্যুত্তর)।

[যোগেন্দ্রনাথ রায়ের সহিত পদাবলীর অর্থ লইয়া বিচার] পৃ. ২২১-২৯।

ভারতী, ১২৮৮ আশ্বিন।

বিবিধ প্রসঙ্গ। [৩] পৃ. ২৮৪-৯২।

[ফলফুল | মাছধরা | ইচ্ছার দাম্ভিকতা | অভিনয় | খাঁটি বিনয় | ধরা কথা | অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া | দ্রুতবুদ্ধি]

বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩ সেপ্টেম্বর)। র-র, অ ১, পৃ. ৩৭১-৭৮। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১৪, পৃ. ৫৬৫-৭০।

ভারতী, ১২৮৮ আশ্বিন।

১২৮৮ আশ্বিন-কার্তিক। ১৮৮১ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর

ডি প্রোফাণ্ডিস (De Profundis)।

[Tennyson-এর De Profundis কাব্যের সমালোচনা।]

সমালোচনা (১৮৮৮)। র-র, অ২, পৃ. ৯৭। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১৩, পৃ. ৬১৭ (সমালোচনা)।

দ্রষ্টব্য : আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭)। র-র ৯, আধুনিক সাহিত্য-মধ্যে নাই।

র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১৩, পৃ. ৯৭৪ (আধুনিক সাহিত্য)।

ভারতী, ১২৮৮ আশ্বিন। পৃ. ২৫৪-৬২।

বৌঠাকুরাণীর হাট। প্রথম-পঞ্চম পরিচ্ছেদ। ভারতী, ১২৮৮ আশ্বিন, পৃ. ২৯৩-৩১৪।

গান—'বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ; ভারতীতে গানটি ৫ম পরিচ্ছেদে আছে; মুদ্রিত পুস্তকে চতুর্থ পরিচ্ছেদে। কারণ পুস্তক মুদ্রণকালে ১ম পরিচ্ছেদ বর্জিত হয়। গানটি বসন্ত রায়ের। এই গানটি 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) গ্রন্থেও আছে।

গানের বহি (১৮৯৩)-তে প্রথম সন্নিবেশিত। ইমনকল্যাণ—ঝাঁপতাল। পরে পরিবর্তন হয়। 'প্রায়শ্চিত্তে' স্বর ভূপালি।

গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৯০। র-র ১, পৃ. ৩৮৯। স্বরবিতান ৯। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬১৭।

র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৮, পৃ. ১৭।

ভারতী, ১২৮৮ কার্তিক।

জীবন ও বর্ণমালা। প্রবন্ধ। পৃ. ৩১৭-২১।

ভারতী, ১২৮৮ কার্তিক।

পরাজয় সঙ্গীত।

'ভাল করে যুঝিলি নে, হলো তোর পরাজয়', পৃ. ৩১৫-৩১৭।

সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২)। র-র, ১, পৃ. ৩৪। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১, পৃ. ২৭।

ভারতী, ১২৮৮ কার্তিক।

১২৮৮ কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১৮৮১ অক্টোবর-নভেম্বর

সম্পাদকের বৈঠক [ইংরেজি কবিতার অনুবাদ]

১। Swinburne— 'রবির কিরণ হতে আড়াল করিয়া রেখে' (কড়ি ও কোমল)।

২। Rossetti— 'কেমনে কি হল পারি নে বলিতে' (কড়ি ও কোমল)।

৩। " — 'দেখিনু যে এক আশার স্বপন' (কড়ি ও কোমল)।

৪। M. Arnold— 'অদৃষ্টের হাতে লেখা সূক্ষ্ম একরেখা'।

৫। Robust Buchanan— ভুজ-পাশবদ্ধ অ্যাণ্টনি
'এই ত আমরা দোঁহে বসে আছি কাছে কাছে'।

৬। Shelley— 'সেথায় কপোত বধূ লতার আড়ালে (প্রভাতসঙ্গীত, 'সম্মিলন' কবিতা)।

ভারতী, ১২৮৮ কার্তিক।

বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ. ৩৪০।

বৌঠাকুরাণীর হাট [২]। ৬-৮ পরিচ্ছেদ।

ভারতী, ১২৮৮ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৩৪১-৫৫।

গান—

১. 'আজ তোমারে দেখতে এলেম'। বসন্ত রায়ের গান।
বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)। র-র ১, পৃ. ৩৯৮। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৮, পৃ. ২৪। গানের বহি (১৮৯৩)। প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯)। পরিত্রাণ (১৯২৯)। গীতবিতান, '৪১৪। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৩২১। স্বরবিতান ৯।

২. 'মলিন মুখে ফুটুক হাসি'।
বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)। র-র ১, পৃ. ৪০২। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৮, পৃ. ২৬। প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯)। গান (১৯১৪)। গীতবিতান (১৯৬০) পৃ. ৭৯১। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৬১৮। স্বরবিতান ৯।
ভারতী, ১২৮৮ অগ্রহায়ণ।

অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরেজ কবি। [সমালোচনা প্রবন্ধ] পৃ. ৩৫৫-৬৪।

১২৮৮ অগ্রহায়ণ-পৌষ। ১৮৮১ নভেম্বর-ডিসেম্বর

গান সমাপন।

'জনমিয়া এ সংসারে'। পৃ. ৩৬৫। সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২)। কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬)। র-র ১, পৃ. ৪৩-৪৪। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১, পৃ. ৩৩।

ভারতী, ১২৮৮ অগ্রহায়ণ।

রেলগাড়ি। [প্রবন্ধ]। পৃ. ৩৬৬-৭০।

বিবিধ প্রসঙ্গ [৪]। পৃ. ৪১৪-১৮।

[ছোট ভাব। জগতের জন্মমৃত্যু। অসংখ্য জগৎ। জগতের জমিদারী। নামগুলি 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থে প্রদত্ত হয় (১৮৮৩)।] র-র, অ ১, পৃ. ৩৮২-৮৬। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১৪, পৃ. ৫৭৩-৭৬।

ভারতী, ১২৮৮ পৌষ।

এক চোখো সংস্কার। প্রবন্ধ। পৃ. ৩০১-০৭।

সমালোচনা (১৮৮৮)। র-র, অ ২, পৃ. ১৪৪-৪৮। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ১৩, পৃ. ৬৫৩।

ভারতী, ১২৮৮ পৌষ।

কবিতা সাধন।

'অনন্ত এ আকাশের কোলে' পৃ. ৪০৭।

সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২)।

'ডাকি তোরে আয়রে হেথায়'— এরূপ পাঠ।

মোহিত সেন কাব্যগ্রন্থ (১৯০৩) ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯। আবাহন নাম।

র-র ১, পৃ. ৩-৫। এখানেও পাঠান্তর—

'চারিদিকে খেলিতেছে মেঘ'। (৪ পংক্তি)

অতঃপর 'অনন্ত এ আকাশের কোলে' ইত্যাদি।

ভারতী, ১২৮৮ পৌষ।

বৌঠাকুরাণীর হাট [৩]। ৯-১০ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৪২৯-৩৬।

গান— 'সারা বরষ দেখিনে মা'— রামমোহন মালের গান। সকল গীত গ্রন্থভুক্ত।

প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯)। গীতবিতান ৬০৩। র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৪, পৃ. ৪৬৩। র-র, ১, পৃ. ৩৭৩-২০।

র-র, পশ্চিমবঙ্গ, ৮, পৃ. ৩৪। স্বরবিতান ৯ (প্রায়শ্চিত্ত)।

ভারতী, ১২৮৮ পৌষ।

সম্পাদকের নিবেদন

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা নবজাগরণ লক্ষ্য করা গেল। রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের হৃদয়মনের কতখানি অধিকার করে আছেন তা সেদিন আরও স্পষ্টভাবে আরও গভীরভাবে অনুভব করলাম। সুপরিজ্ঞাত এবং সর্বজনস্বীকৃত সত্যকেও সব সময় মনে করে রাখা আমাদের স্বভাব নয়। মনে করবার জন্যে মাঝে মাঝে এক একটা উপলক্ষের প্রয়োজন হয়। ১৯৬১ সালে জন্মশতাব্দ উপলক্ষ করে কবিকে আমরা নূতন করে পেলাম, আমাদের মধ্যে তাঁর নবজন্ম হল। শতাব্দীকাল পূর্বে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যে শঙ্খ বেজেছিল শতাব্দীকাল পরে তার বহুগুণিত প্রতিধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল শুধু বাংলা দেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ। ভারতের বাইরেও সকল সভ্য দেশ রবীন্দ্র-জন্মশতাব্দী উপলক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকাল থেকেই আমরা জন্মোৎসব পালন করে আসছি, জীবনাবসানের পরেও করছি। প্রতি বৎসরই পঁচিশে বৈশাখকে কেন্দ্র ক'রে রচিত হয়েছে আমাদের অনুষ্ঠানের বৃত্ত। গানে কবিতায় নৃত্যে নাট্যে নিবেদিত হয়েছে আমাদের ভক্তির অর্ঘ্য। নববর্ষের মত সেটাকেও আমরা জাতীয় উৎসব বলে গণ্য করে নিয়েছি। কিন্তু বার্ষিক উৎসব কতকটা মৌসুমী ফুলের মত। তার একটি বৎসরের সঙ্গে আর এক বৎসরের কোনো অনিবার্য সংযোগ থাকে না। কিন্তু শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করে সমগ্র দেশে কয়েকটি নূতন প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে, যা রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাধনাকে জনমানসে সমুজ্জ্বল রাখতে সহায়তা করবে। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলনও এই উপলক্ষে কম হয়নি এবং তারও ফল নিতান্ত অচিরকালীন নয়। বিশ্বভারতীর সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পঞ্চদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ সুলভ সংস্করণ রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশ সম্ভবত রবীন্দ্র-শতবার্ষিক জন্মোৎসবের মহত্তম উদ্‌যোগ। এর ফলে দেশের প্রায় অর্ধলক্ষ বাসগৃহ কখন যে সকলের অজ্ঞাতসারে এক-একটি ক্ষুদ্রায়তন কিন্তু চিরস্থায়ী রবীন্দ্র-স্মৃতিমন্দিরে পরিণত হয়েছে তা কেউ লক্ষ্যই করে নি।

শতবার্ষিক উৎসবের অঙ্গরূপে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনামাঙ্কিত কয়েকটি নূতন অধ্যাপকপদের সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রবিদ্যানুশীলনের বিশেষ পাঠক্রম প্রবর্তন করেছেন।

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার লক্ষ্যও অনুরূপ। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন আচার্য পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর ইচ্ছানুসারে রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল।

'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' বিশ্বভারতীর উদ্‌যোগে প্রকাশিতব্য একটি বার্ষিক পত্রিকা। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জীবন এবং তাঁর বিচিত্র ও বহুমুখী সাধনা সম্পর্কে উন্নততর আলোচনার বাহনরূপে এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। প্রধানত যে সকল বিষয় এই পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তার একটি তালিকা দেওয়া হল।

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার বিষয়বস্তু

১. রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা।
   (ক) সাহিত্যিক রচনা।
   (খ) চিঠিপত্র।

২. সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি এমন রচনা।

এই জাতীয় রচনা কিছু কিছু সংগৃহীত হয়েছে। অনুসন্ধান করলে আরও পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ ধরনের লেখা আমাদের হস্তগত হলে গ্রন্থরূপে বা কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ক'রে প্রকাশ করবার পূর্বে রবীন্দ্রজিজ্ঞাসায় মুদ্রিত হতে পারে।

৩. রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিসমূহের বিবরণ।

এ যাবৎ যে-সকল পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তার বিশদ বিবরণ সংকলন করা হচ্ছে। এক রবীন্দ্রসদনেই প্রায় আড়াই শ' পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে, তার মধ্যে চল্লিশটির কিছু বেশী ইংরেজি। ইংরেজিগুলির আকর্ষণ আমাদের কাছে গৌণ কারণ এর অধিকাংশই টাইপ করা। কিন্তু বাংলা পাণ্ডুলিপিগুলি যে রবীন্দ্রানুশীলনের পক্ষে মহামূল্য উপকরণরূপে গণ্য হবে তাতে সন্দেহ নেই। এগুলি যে কেবল তাঁর শৈশব থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের হস্তাক্ষর বহন করছে বলেই মূল্যবান তা নয়। অনেক পাণ্ডুলিপি, বিশেষতঃ প্রথম বয়সের পাণ্ডুলিপিগুলি, অন্য কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। বিবিধ রচনায়, বিশেষতঃ কবিতার খসড়ায়, যে সকল কাটাকুটি আছে সেগুলি অনুধাবন করলে কবির মনস্ক্রিয়ার গতিটি লক্ষ্য করা যাবে। আমরা জানি শিশুকাল থেকেই একটি-না-একটি খাতা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই ঘুরত, যখন যা মনে হত তাতেই লিখতেন। হঠাৎ প্রয়োজনের সকল কাজ সম্পন্ন হত এই সব খাতায়। শৈশবের সেই নীল খাতা আর পাবার উপায় নেই, লেটস ডায়ারিরও সেই অবস্থা। কিন্তু ওই ধরনেরই আর একটি খাতা আমাদের হস্তগত হয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে মালতী পুঁথি। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিসমূহের মধ্যে এটি সর্বাধিক পুরাতন। রবীন্দ্র জিজ্ঞাসার এই প্রথম খণ্ডে কয়েক পৃষ্ঠার আলোকচিত্রসহ এই পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত করা হল। রবীন্দ্রভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন 'মালতী-পুঁথি— পাণ্ডুলিপি-পরিচয়' শীর্ষক প্রবন্ধে এই পুরাতন খাতাটির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। অন্যান্য পাণ্ডুলিপির প্রসঙ্গ পরবর্তী সংখ্যায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হবে।

৪. সংবাদপত্র থেকে আহৃত তথ্যাবলী। রবীন্দ্রসদনের সংগ্রহশালায় দেশী ও বিদেশী পুরাতন সংবাদপত্রের অনেক কৃত্তাংশ (clipping) রক্ষিত আছে। রবীন্দ্রজীবনের পূর্ণতর ইতিহাস প্রণয়নের পক্ষে এই দুর্লভ তথ্যাকরগুলির মূল্য অপরিমেয়। এই কৃত্তাংশগুলি থেকে কি জাতীয় তথ্য আহৃত হতে পারে রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার মধ্যে মধ্যে তার নিদর্শন দেওয়া যাবে।

৫. রচনাপঞ্জী। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। রবীন্দ্রসদন-গ্রন্থাগারে রক্ষিত এই জাতীয় অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে, এশিয়ার

অন্যান্য অংশে, ইউরোপে ও আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ কি রকম শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করেছেন, তাঁর চিন্তাধারা ওই সব দেশের মনের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তাঁর কোন্ জাতীয় রচনার দ্বারা কোন্ জাতির চিত্ত বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছে, এই অনুবাদ-গ্রন্থগুলি তার প্রধান দিঙ্‌নির্দেশক। রবীন্দ্রসদনের গ্রন্থাগার অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ-গ্রন্থের তালিকাও নিরন্তর সংশোধন ও সম্পূরণ করে চলেছেন। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসায় এই সব গ্রন্থতালিকার নির্বাচিত অংশ প্রকাশ করা হবে।

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে সুবৃহৎ সাহিত্য গড়ে উঠেছে তার মূল্যও কম নয়। এই রচনাগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়,— এক, পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ; দুই, প্রবন্ধাদি। কবির উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতা অভিনন্দন মানপত্র প্রভৃতিকেও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করব। ভাষা হিসেবে এই জাতীয় রচনার আর এক রকম শ্রেণীবিভাগ হবে। এক, বাংলা ; দুই, ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ; তিন, ইংরেজী এবং চার, অন্যান্য বিদেশী ভাষা। এই জাতীয় বিভিন্ন ভাষার রচনাপঞ্জী প্রণয়নের কাজ চলছে। রবীন্দ্রজিজ্ঞাসায় তার নিদর্শনও দেওয়া হবে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনেতিহাস এবং তাঁর সাহিত্য সংগীত শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল গ্রন্থাদি বেরোবে তার একটি সংক্ষিপ্ত বার্ষিক পর্যালোচনা রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসায় প্রকাশিত হবে।

৬. রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের পরিচয়। রচনাপঞ্জীতে শুধু গ্রন্থকারের এবং তাঁর রচনার নামটুকুই জানা যাবে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশের চিন্তানায়করা আপন আপন গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নূতন কথা কি বললেন সেটা জানবার জন্যে আমাদের কৌতূহল স্বাভাবিক। তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নূতন বই বেরোলে তার পরিচয় প্রসঙ্গে লেখকের মূল বক্তব্যের সার সংকলন করবার ব্যবস্থা হবে। অ-বাংলা বই সম্পর্কেই এই ব্যবস্থার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করা হচ্ছে। বঙ্গীয়েতর রবীন্দ্রানুশীলনরত বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের সংযোগসাধন করবার মত আর কোনো সেতু নেই। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার দ্বারা সেই যোগাযোগের কাজ অংশত সম্পন্ন হতে পারবে বলে আশা করা যায়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রচিত গ্রন্থ সম্পর্কে যা বলা হল প্রবন্ধাদি সম্পর্কেও সেটা প্রযোজ্য।

৭. রবীন্দ্রনাথের চিত্র। রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্র, বিশেষত অপ্রকাশিত আলোকচিত্র, রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসায় প্রকাশ করা হবে। কবির স্বহস্তাঙ্কিত অপ্রকাশিত চিত্রের মুদ্রণ এবং প্রয়োজনবোধে পূর্ব প্রকাশিত চিত্রের পুনর্মুদ্রণ করা হবে।

৮. স্বরলিপি ও রেকর্ড। যে সব গানের স্বরলিপি এখনও কোনো স্বরলিপি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি, রবীন্দ্রজিজ্ঞাসায় তা প্রকাশিত হবে।

রবীন্দ্রসংগীতের যাবতীয় রেকর্ডের একটি তালিকা প্রণয়ন করার কাজে কেউ কেউ হাত দিয়েছেন। কিছু কিছু রেকর্ডের তালিকা অসম্পূর্ণ হলেও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তালিকা সম্পূরণের কাজে রবীন্দ্র সংগীতানুরাগীদের সহযোগিতা আহ্বান করি। পুরাতন রেকর্ড সম্পর্কে নূতন তথ্যাদি রবীন্দ্রজিজ্ঞাসায় প্রকাশ করা হবে।

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা একান্তভাবে রবীন্দ্রবিষয়ক পত্রিকা। অন্যান্য পত্রিকা থেকে এইখানেই তার প্রথম এবং

প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তার উপকরণবিন্যাসে। কি কি উপকরণ এর অঙ্গীভূত হবে তা বিশদভাবে বলা হয়েছে। তার থেকেই বোঝা যাবে রবীন্দ্রবিষয়ক পত্রিকা হলেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ এতে বেশী প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। তবে বিশেষজ্ঞের লেখা নূতন তত্ত্বভূয়িষ্ঠ ও মৌলিক চিন্তাসমৃদ্ধ রচনা এই পত্রিকায় সাদরে গৃহীত হবে। বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার তার দৃষ্টান্তস্থল।

মালতী-পুঁথি

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার বর্তমান সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ মালতী-পুঁথি। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন 'মালতী পুঁথি— পাণ্ডুলিপি-পরিচয়' শীর্ষক প্রবন্ধে এই পাণ্ডুলিপিটির সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রকাব্য-সাধনার আদিপর্বের ইতিহাসের এই দুর্লভ উপকরণটি রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকসম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত করা সম্ভব হয়েছে বলে আমরা আনন্দ বোধ করছি।

মালতী-পুঁথি সম্পাদন করতে গিয়ে পৃষ্ঠাঙ্ক সংশোধন করার প্রয়োজন বোধ করেছি। পাণ্ডুলিপিতে পুরাতন পৃষ্ঠাঙ্ক সুবিন্যস্ত ছিল না বলেই নূতন পৃষ্ঠাঙ্ক বসানো হল। যে যে পৃষ্ঠায় কোনো লেখা নেই সেগুলিরও পৃষ্ঠাঙ্ক থাকা দরকার, নূতন করে তাও দেওয়া হল। অনবধানতাবশত পুরাতন পৃষ্ঠাঙ্ক বিন্যাসে যে অসামঞ্জস্য ঘটেছিল নূতন পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়ায় সেটার অবসান হল। এখন থেকে পুরাতন পৃষ্ঠাঙ্ক ব্যবহার করার আর প্রয়োজন হবে না। তবু মালতী-পুঁথির মুদ্রিত সংস্করণে নূতনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন পৃষ্ঠাঙ্কও উল্লেখ করা হয়েছে। মালতী-পুঁথির প্রসঙ্গ নিয়ে ইতিপূর্বে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের রচনায় পুরাতন পৃষ্ঠাঙ্ক ব্যবহৃত হয়েছে। এই কারণেই পুরাতন পৃষ্ঠাঙ্ক সম্পূর্ণ বর্জন করা হল না। পুরাতন ও নূতন পৃষ্ঠাঙ্ক কিভাবে প্রদর্শিত হয়েছে, নিম্নলিখিত নিদর্শন থেকে তা বোঝা যাবে :

3/২ক অর্থাৎ পুরাতন পৃষ্ঠাঙ্ক ৩,
নূতন পৃষ্ঠাঙ্ক ২ক।
২ক = ২য় পত্রের ১ম পৃষ্ঠা।

60/৩১খ অর্থাৎ পুরাতন পৃষ্ঠাঙ্ক ৬০,
নূতন পৃষ্ঠাঙ্ক ৩১খ।
৩১খ = ৩১ম পত্রের ২য় পৃষ্ঠা।

প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর প্রবন্ধে যদিও বলেছেন "এই পুঁথিটির কালসীমা নিরূপণ করার পক্ষে প্রথম কর্তব্য এর অন্তর্গত রচনাগুলির সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া। কিন্তু সে বিবরণ দান মালতী-পুঁথির সম্পাদন ও প্রকাশনের অঙ্গ বলেই গণ্য। বর্তমান আলোচনায় নিষ্প্রয়োজন বোধে ও পুনরুক্তিভয়ে সে কাজ থেকে নিরস্ত থাকা গেল।" তথাপি তিনি নিরস্ত থাকেন নি, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা তাঁকে নিরস্ত থাকতে দেয় নি। মালতী পুঁথির অনেকগুলি রচনার সঙ্গে গ্রন্থাকারে অথবা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সেকালকার কয়েকটি রচনার সাল তারিখ মিলিয়ে তিনি একটি সুনির্দিষ্ট

সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সেটি এই,— মালতী পুঁথির রচনাকালের উর্দ্ধসীমা ১৮৭৪ এবং নিম্নসীমা ১৮৮৪। অর্থাৎ এই খাতাটি অন্ততঃ দশ বৎসর যাবৎ কবির 'সাহিত্যের সঙ্গী' ছিল।

তথ্যলতিকা

"মালতী পুঁথির অন্তর্গত রচনাগুলির সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশের বিবরণদান" যে সম্পাদনার অঙ্গ সে বিষয়ে মতান্তরের তিলমাত্র অবকাশ নাই। বস্তুতঃ সে কাজে একক চেষ্টায় অনেক দূর অগ্রসরও হয়েছিলাম। অনুসন্ধানের ফলে যে সকল তথ্য সংকলিত হয়েছে সেগুলি পরে প্রয়োজনমত প্রকাশ করা হবে। ইতিমধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যপঞ্জী রচনা করে দিয়েছেন রবীন্দ্রভবনের কর্মী শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব। সেটি এখানে মুদ্রিত হচ্ছে।

তথ্যলতিকাটি পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক অনুসারে সাজিয়ে দেওয়া হল। সন্নিবিষ্ট বিষয়ের ক্রম এইরকম :— ১. পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক— পুরাতন ও নূতন। ২. রচনার প্রথম ও শেষ পংক্তি। ৩. যে পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত তার নাম, প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠাঙ্ক। ৪. অবিন্যস্ত পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রচনার পৌর্বাপর্য নির্দেশ।

যে সকল রচনা কোথাও প্রকাশিত হয়েছে কি না জানা যায় নি সেগুলির পাশে তারকাচিহ্ন দেওয়া হল।

1/১ক *কস্যচিৎ বৃক্ষস্য...প্রার্থয়সি ?

3/২ক *হা বিধাতা ছেলেবেলা হতেই···আদরেতে উচ্ছ্বসিয়া কেঁদেছি কতই।

4/২খ (১) প্রতিকূল বায়ুভরে উর্মিময় সিন্ধু পারে···যেখানে এসেছি তারে ফেলি। Moore's Irish Melodies থেকে অনূদিত। বিচ্ছেদ, সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪, পৃ ৩২৬।

(২) *বিদেশেতে দেখি যদি, উপত্যকা দ্বীপ নদী···কি যে সুখ হইত তখন। Moore's Irish Melodies থেকে অনূদিত।

(৩) *পূর্ব্বে যবে সন্ধ্যাকালে, গ্রামে অন্ধকার জালে· মুমূর্ষু কিরণ। Moore's Irish Melodies থেকে অনূদিত।

(৪) এস এস এই বুকে নিবাসে তোমার···রক্ষিব, মরিব কিংবা তোমারি পশ্চাতে। Moore's Irish Melodies থেকে অনূদিত। জীবন উৎসর্গ, সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪, পৃ ৩২৭।

(৫) মানুষ কাঁদিয়া হাসে, পুনরায় কাঁদে গো হাসিয়া···মৃতসিন্ধুতীরে জন্মে অভ্যন্তর যার ভস্মময়। Byron থেকে অনূদিত। কষ্টের জীবন, সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪, পৃ ৩২৬-২৭।

(৬) *ভালোবাসে যারে তার চিতাভস্মপানে·· ইংরাজেরা ভাঙ্গিয়াছে প্রাচীর তোমার···।

5/৩ক (১) *···কেতুসম তারা কি কুক্ষণে হায়···দেবতা প্রতিমাগুলি লয়ে গেল হরি। (পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ।)

(২) সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন···মুকুতা কলাপসম সিন্ধুবার মালা। 'কুমারসম্ভব'এর অনুবাদ। এটি প্রথম প্রয়াস। দ্বিতীয় এবং সংশোধিত অনুবাদের (দ্রষ্টব্য 43/২৩ক, 44/২৩খ, 45/২৪ক, 46/২৪খ, 47/২৫ক, 48/২৫খ পৃষ্ঠা) পরিমার্জিত রূপ প্রকাশিত হয়েছে। মদন-ভস্ম, সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪, পৃ ৩২৯-৩১।

6/৩খ (১) স্তনভারে নতকায় ঈষৎ অমনি···হেতায় মদন তনু ভস্ম অবশেষ। 5/৩ক-পৃষ্ঠার (২) সংখ্যক 'সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন' প্রভৃতির শেষাংশ।

(২) ধ্বজা লয়ে গেলে যথা প্রতিকূল বাতে···অংশুক তাহার মুখ ফিরায় পশ্চাতে। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' হইতে অনূদিত। বিচ্ছেদ, সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, ১২৮৪ মাঘ, পৃ ৩২৫। পাণ্ডুলিপিতে দুটি পংক্তি ; কিন্তু মুদ্রিত পাঠে চারটি পংক্তি আছে—আরম্ভে দুটি পংক্তি 'শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে, অধীর হৃদয় কিন্তু চায় পিছুবাগে'।

7/৪ক (১) *বাহিরের আবরণ খুলে যায় যেন···বিচিত্র বরণ যায় শূন্যে মিশাইয়া।

(২) *মরিতে ছিল না সাধ তোমা তরে ভাই···আমার মতন ভাল কে বাসিবে আর ?

8/৪খ *তারকার ফুলরাশি দিল ছড়াইয়া মর্ত্ত্যের ভাষায় যাহা নারি প্রকাশিতে।

9/৫ক (১) প্রতি উচ্চ শাখাময় সরল কানন···তাঁহারি জীবন্ত, ছবি করিছে বহন। অনূদিত কবিতা। পিত্রার্কা ও লরা, ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫, পৃ ২৭৫।

(২) দুর্গম সংসারে যত করি গো ভ্রমণ···ভাঙ্গি দেয় যৌবনের সুস্বপন মোর। অনূদিত কবিতা। পিত্রার্কা ও লরা, ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫, পৃ ২৭৫-৭৬।

(৩) হারে হতভাগ্য বিহঙ্গম সঙ্গীহীন···তাই নিয়ে আমি শুধু গাইতেছি গীত। অনূদিত কবিতা। পিত্রার্কা ও লরা, ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫, পৃ ২৭৭।

(৪) সুকোমল ম্লানভাব কপোলে তাহার···আমি ছাড়া আর কেহ দেখেনি গো তায়। অনূদিত কবিতা। পিত্রার্কা ও লরা, ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫, পৃ ২৭৭।

(৫) সবিষাদে অবনত নয়ন তাঁহার···লইয়া যেতেছে ডেকে এত দূর দেশে। অনূদিত কবিতা। পিত্রার্কা ও লরা, ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫, পৃ ২৭৭।

(৬) শুব্ধ সন্ধ্যাকালে যবে পশ্চিম আকাশে···দ্বিগুণ সে জ্বালা হৃদি করে ছারখার। অনূদিত কবিতা। পিত্রার্কা ও লরা, ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫, পৃ ২৭৮।

(৭) প্রজ্বলন্ত রথচক্র নিম্নপানে যবে···গিরিশিখর সমুন্নত কায়া। অনূদিত কবিতা। পিত্রার্কা ও লরা, ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫, পৃ ২৭৮। এর শেষাংশ পরবর্তী 10/৫খ পৃষ্ঠার (১) সংখ্যায়।

10/৫খ (১) দেয় উপত্যকা পরে বিস্তারিত করি···চিন্তা চালি দেয় তার বন্য বায়ু পরে। পূর্বোক্ত কবিতার শেষাংশ (দ্র. 9/৫ক পৃষ্ঠা)।

(২) চিরকাল সুখে তারা করুক যাপন…আমার যে দশা তাহা রহিল সমান। অনূদিত কবিতা। পিত্রার্কা ও লরা, ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫, পৃ ২৭৮।

(৩) দগ্ধ হোয়ে মর্মভেদী মর্মযন্ত্রণায় …মৃত্যু এই জীর্ণ দেহ না ফেলে বিনাশি। অনূদিত কবিতা। পিত্রার্কা ও লরা, ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫, পৃ ২৭৮।

(৪) বিমল বাহিনী ওগো তরুণ তটিনী…এই ভগ্নহৃদয়ের শেষ দুঃখগান। অনূদিত কবিতা। পিত্রার্কা ও লরা, ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫, পৃ ২৭৬।

(৫) অবশ্য ফলিবে যদি ভাগ্যের লিখন…ভ্রমিবে যখন আত্মা স্বদেশ আকাশে…। (বাকি অংশ 25/১৪ক পৃষ্ঠায় 'মরণের কঠোরতা হয় যেন হ্রাস…ঘুমাইব পৃথিবীর দুঃখ শোক ভুলি'। পিত্রার্কা ও লরা, ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫, পৃ ২৭৬।

11/৬ক (১) [দাও] গো বিদায় এবে যাই নিজ ধামে…বৈকুণ্ঠে পৃথিবী ছাড়ি যায় তুকারাম। শ্রীস লিখিত 'তুকারাম'। ভারতী, আষাঢ় ১২৮৫, পৃ ১২৮। নবরত্নমালা—পঞ্চমভাগ, পৃ ৪১।

(২) বাহিরে ও ঘরে মোর আছে যারা যারা…এই যে চলিল তুকা ফিরিবে না আর। শ্রীস লিখিত 'তুকারাম'। ভারতী, আষাঢ় ১২৮৫, পৃ ১২৮। নবরত্নমালা পঞ্চমভাগ, পৃ ৪৩।

(৩) তুকার পরীক্ষা শেষ হয়…তুকারে বৈকুণ্ঠে লয়ে যান। শ্রীস লিখিত 'তুকারাম'। ভারতী, আষাঢ় ১২৮৫, পৃ ১২৮। মুদ্রিত পাঠ স্বতন্ত্র— যথা 'তুকার পরীক্ষা হইল শেষ' ইত্যাদি। নবরত্নমালা পঞ্চমভাগ, পৃ ৪৪।

(৪) *ধরায় পাণ্ডরি আছে লোকেদের তরে…দুর্গম সে পথ অতি জানিও নিশ্চয়।

(৫) *বন্ধুগণ শুন রাম নাম কর সবে…পাণ্ডরী পুরেতে যায় হরিভক্ত সব।

12/৬খ (১) হেথা কেন আসে লোকগুলা…কুকুরের মত করে তাড়া। শ্রীস লিখিত 'তুকারাম'। ভারতী, বৈশাখ ১২৮৫, পৃ ২৬। নবরত্নমালা পঞ্চমভাগ, পৃ ১১।

(২) শুন দেব এ মনের বাসনা নিচয়…তুমিই করগো মোর লজ্জা নিবারণ। শ্রীস লিখিত 'তুকারাম'। ভারতী, বৈশাখ ১২৮৫, পৃ ২৭-২৮। নবরত্নমালা, পঞ্চমভাগ, পৃ ১২।

(৩) নামদেব পাণ্ডুরঙ্গে লোয়ে সঙ্গে কোরে…একশত কোটি শ্লোক হইবে পুরাতে। শ্রীস লিখিত তুকারাম। ভারতী, বৈশাখ ১২৮৫, পৃ ২৮। নবরত্নমালা, পঞ্চমভাগ, পৃ ১৩।

(৪) যদি মোরে স্থান দাও তব পদ ছায়…এই অনুগ্রহ তব গাঁথা রোল মনে। শ্রীস লিখিত 'তুকারাম'। ভারতী, বৈশাখ ১২৮৫, পৃ ২৮। নবরত্নমালা, পঞ্চমভাগ, পৃ ১৩।

13/৭ক ফুলবালা পরিমল দাও…ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়। অমিয়ার গান। রুদ্রচণ্ড— অষ্টম দৃশ্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ২৯১-৩০৩। 15/৮ক ও 16/৮খ পৃষ্ঠায় "বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল" ইত্যাদির শেষাংশ।

14/৭খ দেখি দেখি মুখানি…আঁখি মেললো। এর শেষাংশ 27/১৫ক পৃষ্ঠায় 'সরমের মেঘে ঢাকা বিধু-মুখানি…উঠিবে কি লো।'

15/৮ক বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল···ফুল বলে "এই লও লও"। এর শেষাংশ 13/৭ক পৃষ্ঠায় "ফুলবালা পরিমল দাও"। অমিয়ার গান, রুদ্রচণ্ড— ৮ম দৃশ্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ২৯১-৩০৩।

16/৮খ (১) বায়ু আসি কহে কাণে ২ ··আজিকে হরষ এ কি রে 'বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল' ইত্যাদি গানের অংশ।

(২) তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল···মধুকর গেল অন্য ঠাঁই। 'বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল' ইত্যাদি গানের অংশবিশেষ। (দ্র. 15/৮ক পৃষ্ঠা।)

17/৯ক (১) ···এখনি সকল ফুরায় নাই। কবিতার আরম্ভ এই রকম : খাবার কোথায় পাবি বাছা? বাপ তোর থাকেন মন্দিরে। শ্রীস লিখিত 'তুকারাম'। ভারতী, বৈশাখ ১২৮৫, পৃ ২৫-২৬। নবরত্নমালা, পৃ ৯।

(২) গেছে সে আপদ গেছে·· মনে মনে তবু ভালবাসে। শ্রীস লিখিত 'তুকারাম'। ভারতী, বৈশাখ ১২৮৫, পৃ ২৬। নবরত্নমালা পৃ ১০।

(৩) ঘরে আর আসে না সে··তুকা বলে "থাক সহ্য কোরে।" শ্রীস লিখিত 'তুকারাম'। ভারতী, বৈশাখ ১২৮৫, পৃ ২৬। নবরত্নমালা, পৃ ১০।

18/৯খ (১) আমারি বেলায় উনি সংসারে বিরাগী···কাঁদিলে কি হবে বল আর। শ্রীস লিখিত 'তুকারাম'। ভারতী, বৈশাখ ১২৮৫, পৃ ২৫। নবরত্নমালা, পৃ ৭। মুদ্রিত পাঠ পাণ্ডুলিপি থেকে স্বতন্ত্র।

(২) বোধ হয় এ পাষণ্ড··কভু বা আপন মনে হাসে। শ্রীস লিখিত 'তুকারাম'। ভারতী, বৈশাখ ১২৮৫, পৃ ২৫। নবরত্নমালা পৃ ৮।

(৩) ঘরে দুটা অন্ন এলে···তাই এত পেতেছিস তাপ। শ্রীস লিখিত 'তুকারাম'। ভারতী, বৈশাখ ১২৮৫, পৃ ২৫। নবরত্নমালা, পৃ ৮।

19/১০ক (১) [গে] ল ২ নিয়ে গেল এ প্রণয় স্রোতে···শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হোয়েছে হৃদয় মোর। গান। বিবিধসংগীত, পৃ ১৯৬ (ইণ্ডিয়ান প্রেস। ১৯০৯।)

(২) *হায় বিধি এ কপালে এই কি আছিল শেষে···কহিতে মরম কথা সরমের বাঁধ টুটি।

১০খ কাছে থাকি দূরে থাকি প্রাণেরে জাগায়। প্রথম অংশ নাই; বউঠাকুরাণীর হাট, সৌদামিনী দেবীকে উপহার— "দিদি, তোমার স্নেহের কোলে আমার স্নেহের ধন ··" ইত্যাদি আরম্ভ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ ৩৭১-৭২।

19A/১১ক (১) ভ্রমরে ডাকিত হাসিতে হাসিতে···হৃদয় আমার চাই। এর প্রথমাংশ 62/৩২খ পৃষ্ঠায় 'কি হল আমার বুঝিবা সজনি হৃদয় হারিয়েছি।' ভগ্নহৃদয়। নলিনীর গান, রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ১৯১-১৯৩।

(২) এস মন! এস, তোমাতে আমাতে···অন্য কোন খানে। ভগ্নহৃদয়। নলিনীর গান— রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ২০৯-২১০।

20/১১খ পারি—না কি মোরা দু'জনে থাকিতে। 19A/১১ক পৃষ্ঠায় 'এস মন এস তোমাতে আমাতে'··· ইত্যাদি গানের অংশবিশেষ।

21/১২ক (১) বাহিরিতে চায় বাহিরিতে নারে। 19A/১১ক পৃষ্ঠায় 'এস মন এস তোমাতে আমাতে··' ইত্যাদি গানের শেষ অংশ।

(২) বায়ু! বায়ু! কি দেখিতে আসিয়াছ হেথা···ও শুধু একটি জুঁই ফুল। শেষাংশ 22/১২খ পৃষ্ঠায় 'ওরে আসিয়াছ দিতে কি সংবাদ হায়।' ভগ্নহৃদয়। ললিতার গান, রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ২৬৯-২৭১।

22/১২খ ওরে আসিয়াছ দিতে কি সংবাদ হায়···ক্ষুদ্র এই বিষাদের হইবে সমাধি। এর আরম্ভ 21/১২ক পৃষ্ঠায় 'বায়ু! বায়ু! কি দেখিতে আসিয়াছ হেথা।' ললিতার গান। মাঝখানের আটটি পংক্তি 'মুখখানি ধীরে ধীরে দেখিতেছ তুলে···প্রভাতপবন'— 52/২৭খ পৃষ্ঠায় আছে।

23/১৩ক (১) ভয়ে তাহাদের হৃদি হইল আকুল···পলাল ইজিপ্টগণ ভয়ে কম্পান্বিত। অনূদিত কবিতা। স্যাকসন জাতি ও অ্যাঙ্গ্লো স্যাকসন সাহিত্য। ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৫, পৃ ১৮০-১৮১।

(২) সমুদ্র তরঙ্গরাশি মেঘের মতন···মুমূর্ষুর স্বরে বায়ু হোল ঘনীভূত। অনূদিত কবিতা। স্যাকসন জাতি ও অ্যাঙ্গ্লো স্যাকসন সাহিত্য, ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৫, পৃ ১৮০-১৮১।

(৩) কেন বা সেবিব তারে প্রসাদের তরে·· যুঝিব ঈশ্বর সাথে ইহাদেরি লোয়ে। অনূদিত কবিতা। স্যাকসন জাতি ও অ্যাঙ্গ্লো স্যাকসন সাহিত্য ; ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৫, পৃ ১৮১।

(৪) ইহাদেরি রাজা হয়ে শাসিব এ দেশ···কখনো কখনো তাঁর হইব না দাস। অনূদিত কবিতা। স্যাকসন জাতি ও অ্যাঙ্গ্লো স্যাকসন সাহিত্য, ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৫, পৃ ১৮১।

(৫) উচ্চ স্বর্গধামে প্রভু করিলেন দান···চির প্রজ্জলিত অগ্নি নিভেনা কিছুতে। অনূদিত কবিতা। স্যাকসন জাতি ও অ্যাঙ্গ্লো স্যাকসন সাহিত্য, ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৫, পৃ ১৮১।

24/১৩খ (১) দেখে যা ২ ২ লো তোরা সাধের কাননে মোর···আধ আধ ঘুমঘোর। ফুলবালা, গান, ভারতী, কার্তিক ১২৮৫, পৃ ৩০৬। শৈশবসংগীত, গান, রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৪৪৯-৪৫০।

(২) গহির নীদমে অবশ শ্যাম মম···কত শত নারী মিলন টুটাও ত···। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১২৯১ সংস্করণ), ১২ সংখ্যক পদ, পৃ ২৮-৩০।

25/১৪ক (১) মরণের কঠোরতা হয় যেন হ্রাস ··ঘুমাইবে পৃথিবীর দুঃখ শোক ভুলি। এর প্রথম অংশ 10/৫খ পৃষ্ঠায় 'অবশ্য ফলিবে যদি ভাগ্যের লিখন'। পিত্রার্কা ও লরা, ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫, পৃ ২৭৬-২৭৭।

(২) বোধহয় একদিন সে 'মোর ললনা··জাগাইবে মোর পরে স্বর্গের করুণা'। অনূদিত কবিতা। পিত্রার্কা ও লরা, ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫, পৃ ২৭৬-২৭৭।

(৩) এখনো সে মনে পড়ে যবে পুষ্পবন…প্রেম হেথা করিয়াছে সাম্রাজ্য বিস্তার। অনূদিত কবিতা। পিত্রার্কা ও লরা, ভারতী, আশ্বিন, পৃ ২৭৬-২৭৭।

(৪) সেই পুরাতন বায়ু লাগিতেছে গায়ে…প্রচারিতে দিশে দিশে তার যশোগান। অনূদিত কবিতা। পিত্রার্কা ও লরা, ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫, পৃ ২৭৬-২৭৭। মুদ্রিত পাঠে পাণ্ডুলিপির প্রথম দু পংক্তি নাই।

26/১৪খ (১) ক্ষমা কর মোরে সখি শুধায়োনা আর…তবুও লুকানো রবে এ-কথা আমার। ভগ্নহৃদয়, ভারতী, কার্তিক ১২৮৭, পৃ ৩৪০। ভগ্নহৃদয় (মুরলার উক্তি), রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ১৩০-১৩১। গীতবিতান (১৩৬৭ সং), পৃ ৮৮০ (শেষ দুই পংক্তি বাদ পড়েছে)।

(২) তোমারেই করিয়াছি সংসারের ধ্রুবতারা…অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা। ভগ্নহৃদয় (উপহার), ভারতী, কার্তিক ১২৮৭, পৃ ৩৩৭। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১২৮৭, পৃ ২১১। গীতবিতান (১৩৬৭ সং), পৃ ৩১৮।

(৩) *সখা, এতদিনে জুড়াল হৃদয়…পেয়েছি সে সুখ যাহা খুঁজেছি পৃথিবীময়। দুটিমাত্র পংক্তি স্বতন্ত্রভাবে লেখা।

(৪) শুধু যদি বলি সখা ভালোবাসি তারে…প্রকাশিতে নারে তাহা মানুষের ভাষা। ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৭, পৃ ৫০৯। কাব্যগ্রন্থাবলী (সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত), কৈশোরক—ভাবাবেগ, পৃ ৭।

(৫) কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার…হৃদয়ে থাকুক জেগে সৌন্দর্য তোমার। ভগ্নহৃদয়, নীরদের উক্তি, রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ১৬৪। পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত নং ৯৩, পৃ ১১১।

(৬) কে আমার সংশয় মিটায়…পাছে এ আশার মাথে পড়ে গো অশনি। ভারতী, মাঘ ১২৮৭, পৃ ৪৭৬। ভগ্নহৃদয়, নীরদের উক্তি, রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ১৬৩।

27/১৫ক সরমের মেঘে ঢাকা বিধু মুখানি…উঠিবে কি লো। এর প্রথম অংশ 14/৭খ পৃষ্ঠায় 'দেখি দেখি মুখানি…' ইত্যাদি।

28/১৫খ সারস্বত সমাজ। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক পৌষ ১৩৫০, পৃ. ২১৮-২২০। শেষাংশ 29/১৬ক পৃষ্ঠায়।

29/১৬ক পূর্বোক্ত 28/১৫খ পৃষ্ঠায় লেখা 'সারস্বত সমাজ'এর শেষাংশ এখানে আছে।

31/১৭ক *এস আজি সখা বিজন পুলিনে…গাহিয়া সুখের গান।

32/১৭খ ঝান্সী রাণী। 'ভ'-স্বাক্ষরে এই প্রবন্ধের পরিবর্তিত পাঠ 'ঝান্সীর রাণী'-শিরোনামে 'ভারতী'তে (অগ্রহায়ণ ১২৮৪, পৃ ২০১-২০৬) প্রকাশিত। ইতিহাস (১৩৬২, শ্রাবণ), ১০৩-১১৩ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত।

33/১৮ক …দস্যু দস্যু করি ধ্বনি…তোমার বুকের পরে। শৈশবসংগীত, লীলা (গাথা), রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৪৭০-৪৭১।

34/১৮খ …রহে রণধীর পলক বিহীন বিপাশা নদীর জলে। লীলা (গাথা), রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৪৭৩-৪৭৪।

35/১৯ক ভবিষ্যৎ ক্রমে হইতেছে বর্ত্তমান…ঘুমময় অন্ধকার গভীর নীরব। কবিকাহিনী-৪র্থ সর্গ, ভারতী, ১২৮৪ চৈত্র, পৃ ৩৯৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৩৫-৩৯। ইহার পরবর্তী অংশ 38/২০খ পৃষ্ঠায় 'দিবানিশি হাসিবারে শিখেছিস্ তোরা…প্রাণের ভিতরে যেন উথলিয়া ওঠে'। রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৪ ৩৭-৩৮।

36/১৯খ সুগম্ভীর পর্ব্বতের পদতল দিয়া…তবুও মানুষ বলি গর্ব্ব করে তারা। কবিকাহিনী, ৪র্থ সর্গ, ভারতী, চৈত্র ১২৮৪, পৃ ৩৯৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৩৯-৪১। এর পরের অংশ 59/৩১ক ও 60/৩১খ পৃষ্ঠায় 'কত রক্ত-মাখা ছুরি হাসিছে হরষে…' এবং একদিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে…' রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৪১-৪৫।

37/২০ক (১) শাখায় শাখায় সব করি জড়াজড়ি…চাঁদের মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া। কবিকাহিনী, ৩য় সর্গ, ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৪, পৃ ৩৬১। রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ২৯-৩০।
(২) *পার কি বলিতে কেহ কি হল এ বুকে…যা কিছু যুঝিছে হৃদে খুলে ফেলি তাহা।

38/২০খ দিবানিশি হাসিবারে শিখেছিস তোরা…প্রাণের ভিতরে যেন উথলিয়া উঠে। কবিকাহিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৩৭-৩৮। 36/১৯খ পৃষ্ঠায় 'সুগম্ভীর পর্ব্বতের পদতল দিয়া' ইত্যাদির আগে যাবে। রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৩৯ ৪১।

39/২১ক সংসারের পথে পথে মরীচিকা অন্বেষিয়া…তাপিত কুসুম যথা বিতরে সুরভিশ্বাস। ভগ্নহৃদয়, ললিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ২৫৯-২৬০।

40/২১খ (১) *এক বৎসরের মধ্যে…ভোগ দখল করিতেছেন।
(২) *সে ঘুম ভাঙ্গিবে যবে নূতন জীবন লয়ে…অনন্ত গম্ভীর সুখে রহিব গো ডুবিয়া। দ্র 39/২১ক পৃষ্ঠায় 'সংসারের পথে পথে মরীচিকা অন্বেষিয়া' ইত্যাদি। রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ২৫৯-২৬০-তে মুদ্রিত শেষ পংক্তি 'সেই ঘুম ঘুমাইব—আর কোনো নাই আশা'।

41/২২ক Little Miss Muffet sat on a tuffet…And said what a good boy am I—(Old song)। এখানে Miss Muffet শীর্ষক ইংরেজি ছড়ার কেবল প্রথম দুটি পংক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। Little Jack Horner শীর্ষক ছড়াটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত। এই দুইটি অতি পরিচিত ছড়াই বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত।

42/২২খ * …ছেলেবেলাকার আহা ঘুমঘোরে দেখেছিনু কতদিন বেঁচে রব ভাবিতেছি তাইলো।

43/২৩ক 48/২৫খ—সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন…হেতায় মদন তনু ভস্ম অবশেষ। কুমারসম্ভব।

দ্বিতীয় এবং সংশোধিত অনুবাদ। এর পরিমার্জিত রূপ প্রকাশিত হয়েছে। দ্র. মদনভস্ম, সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪, পৃ ৩২৯-৩৩১। রবীন্দ্র-গ্রন্থপরিচয় (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংকলিত) ২য় সংস্করণ, পৃ ৮২-৮৫। 5/৩ক ও 6/৩খ পৃষ্ঠায় লিখিত অনুবাদ কবির প্রথম প্রয়াস।

50/২৬খ *Monday···Exercises ইংরেজিতে লেখা দৈনিক লেখাপড়া করার সময়সূচী।

51/২৭ক বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্যগৌড়ে···দুটা লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত। য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র, পঞ্চম পত্র (নূতন সংস্করণ), পৃ ৮৩-৮৪।

52/২৭খ মুখখানি ধীরে ধীরে দেখিতেছ তুলে···তবে যাও চলে যাও আর কেন ফিরে চাও প্রভাত পবন। এই আটটি পংক্তি 'বায়ু! বায়ু! কি দেখিতে আসিয়াছ হেথা' ৯/১২ক পৃষ্ঠার ভগ্নহৃদয় (ললিতার গান)-এর মাঝখানের অংশ। রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ২৭০।

53/২৮ক *কি উপায়ে সাবধান করবেন ?···গুণদাদাকে এনেই তুমি যাবে কি ? (প্ল্যাকেট লিখন)।

54/২৮খ কেমন গো আমাদের ছোট সে কুটীরখানি···এখনও রয়েছে দৃষ্টি ভরি। শৈশব সংগীত, অতীত ও ভবিষ্যৎ, রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৪৫০-৪৫২। এর শেষাংশ 57/৩০ক পৃষ্ঠায় 'নানা বর্ণময় মেঘ মিশেছে বনের শিরে···ঝকমকি বিদ্যুৎ শিখায়'। রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৪৫২-৪৫৩।

55/২৯ক দামিনীর আঁখি কিবা ধরে জ্বল জ্বল বিভা···তোমার নয়নে যত নলিনী লো নলিনী। Moore-এর কবিতার অনুবাদ— তিনটি স্বতন্ত্র স্তবকে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, ১২৮৮ আষাঢ়, পৃ ১৪৮।

56/২৯খ হে কবিতা হে কল্পনা···করগো জীবন দান তোমার ও অমৃত-নিষেকে। 'অবসাদ'-শিরোনামে ১২৯২ বঙ্গাব্দের 'বালক' পত্রিকায় চৈত্র মাসে প্রকাশিত (পৃ ৫৮৫-৮৬); প্রথম পংক্তি পরিবর্তিত হয়ে 'দয়াময়ি, বাণি, বীণাপাণি' রূপে মুদ্রিত। এটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার প্রকাশিত শতবার্ষিক সংস্করণ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র ৪র্থ খণ্ডের ৮৫১ পৃষ্ঠায়। শৈশবসংগীত-এর সংযোজন অংশে।

57/৩০ক (১) নানা বর্ণময় মেঘ মিশেছে বনের শিরে ··ঝকমকি বিদ্যুত শিখায়। শৈশব সংগীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৪৫২-৫৩, এর প্রথমাংশ 54/২৮খ পৃষ্ঠায় 'কেমন গো আমাদের ছোট সে কুটীরখানি···এখনও রয়েছে দৃষ্টি ভরি'—(রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৪৫০-৪৫২)।

(২) *আমার এ মনোজ্বালা কে বুঝিবে সরলে···তুমি এস কল্পনা।

(৩) *ছেলেবেলা হোতে বালা যত গাঁথিয়াছি মালা···ভগ্নহৃদয়ের এই প্রীতি উপহার। উপহারগীতি।

(৪) শুন কলপনাবালা, ছিল কোন কবি···সমস্ত পৃথিবী দেবি, পারিত বেষ্টিতে। কবিকাহিনী, প্রথম সর্গ, ভারতী, ১২৮৪ পৌষ, পৃ ২৬৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৫।

58/৩০খ (১) দুরন্ত শিশুর মত মুক্ত বায়ুধারা নীরবে নিশীথ বায়ু কাঁপাত···। কবিকাহিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৮।

59/৩১ক কত রক্তমাখা ছুরি হাসিছে হরষে···কাঁদিলেন আর্দ্র হয়ে পৃথিবীর দুখে। কবিকাহিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৪১। এই অংশ 36/১৯খ-পৃষ্ঠার পরে যাবে।

60/৩১খ (১) [একদিন হি]মাদ্রির নিশীথ বায়ুতে···বাতাস কত-কি কথা যায় গো কহিয়া। কবিকাহিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৪৫-৪৬। 58/৩০খ থেকে 60/৩১খ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কবিকাহিনীর পাঠের সঙ্গে ভারতীতে মুদ্রিত পাঠ তুলনীয়। দ্র ভারতী, পৌষ ১২৮৪, পৃ ২৬৪-২৬৮।

(২) *পাষাণ হৃদয়ে কেন সঁপিনু হৃদয়··· মিছামিছি বিঁধে আহা বাণ বিষময়।

(৩) *ওকি সখি কেন করিতেছ······তবুও অটল রবে হৃদয় তোমার।

(৪) *ভেবেছি কাহারো সাথে মিশিব না আর···তবে মানুষের সাথে মিশিব না আর।

(৫) *হারে বিধি কি দারুণ অদৃষ্ট আমার···হেথা কতকাল বল বেঁচে রব আর।

61/৩২ক ফুরালো দুদিন···যায়নি গলিয়া। দুদিন, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭, পৃ ৫৯-৬০। রবীন্দ্র-রচনাবলী-সন্ধ্যাসংগীত, দুদিন, পৃ ৩২-৩৩।

62/৩২খ (১) কিন্তু এ দুদিন মাঝে একটি পরাণে···অঙ্কিত রহিবে শত বরষের শিরে। 61/৩২ক পৃষ্ঠায় 'ফুরালো দুদিন···' ইত্যাদি কবিতার শেষাংশ।

(২) কি হোল আমার? বুঝিবা সজনি···জোছনা আলোয় নয়ন মেলিত···। ভগ্নহৃদয় (নলিনীর গান); কাব্যগ্রন্থাবলী (সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত), হারা হৃদয়ের গান, পৃ ৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ১৯১-১৯৩। 19A/১১ক পৃষ্ঠায় "ভ্রমরে ডাকিত হাসিতে হাসিতে···হৃদয় আমার চাই" এর অন্তর্গত।

63/৩৩ক গভীর রজনী নীরব ধরণী···যুবক নির্ভীক হিয়া। শৈশব সংগীত, প্রতিশোধ-গাথা, ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৫, পৃ ১৬৫-১৭০। রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৪৫৫-৪৬৪।

64/৩৩খ বুকেতে রয়েছে ছুরিকা লুকানো· ·"প্রতিশোধ-প্রতিশোধ"। 63/৩৩ক পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি। মুদ্রিত পাঠের জন্য পূর্বোক্ত ভারতী ও রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১ দ্রষ্টব্য।

65/৩৪ক বুকের বসন হইতে কুমার···ভাঙ্গিল না এ জনমে। 64/৩৩খ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি। মুদ্রিত পাঠের জন্য পূর্বোক্ত ভারতী ও রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্রষ্টব্য।

66/৩৪খ সাধিনু কাঁদিনু কত-না করিনু···ধ্বনিতেছে চারিভিতে। লীলা (গাথা), ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫, পৃ ২৮৫-২৮৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৪৬৭-৪৭০।

67/৩৫ক (১) আসে সন্ধ্যা হোয়ে আঁধার আলয়ে···যেতেছে দিবস নিশি। অপ্সরা প্রেম (গাথা),

ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৫, পৃ ৫১৪। অপ্সরার প্রেম, নায়িকার উক্তি, শৈশবসংগীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ৪৭৮ (অচলিত সংগ্রহে মুদ্রিত পাঠে—'কোথায় গো সখা কোথা গো···সখা কোথা গো'! এই ছয়টি পংক্তি বেশী আছে)।

(২) অদিতি ভবন হইতে যখন···উঠিল আকাশ পরে। অপ্সরা প্রেম (অপ্সরার উক্তি), ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৫, পৃ ৫১৫-৫১৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, শৈশবসংগীত, অপ্সরার উক্তি, পৃ ৪৭৯-৪৮১। শেষাংশ পরিবর্তিত।

68/৩৫খ (১) সহসা ভ্রূকুটী উঠিল সাগর···পাগল সাগর কানে। 67/৩৫ক পৃষ্ঠার 'অদিতি ভবন হইতে যখন···' ইত্যাদির শেষাংশ।

(২) কেন গো সাগর এমন চপল···চাঁদের স্বপন মুখে। গীত, ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৫, পৃ ৫১৭-৫১৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, শৈশবসংগীত, গীত, পৃ ৪৮২-৪৮৩। মুদ্রিত পাঠে অনেকগুলি পংক্তি বেশী আছে।

69/৩৬ক (১) গা সখি গাইলি যদি আবার সে গান···শুনিতে শুনিতে যেন যায় এই প্রাণ রে। গীতবিতান (১৩৬৭ সং), পৃ ৮৮৫-৮৬।

(২) সেই যদি সেই যদি ভাঙ্গিল এ পোড়া হৃদি···আর বার গাও সখি পুরানো সে গান। গীতবিতান (১৩৬৭ সং), পৃ ৮৮৪।

70/৩৬খ (১) ভাল যদি বাস সখি কি দিব গো আর···কি আছে কবির বল কি তোমারে দিব আর। গীতবিতান (১৩৬৭ সং) পৃ ৭৭৭।

(২) ওই কথা বল সখা বল আর বার···ভালবাসো মোরে তাহা বল গো আবার। গান, শৈশবসংগীত ; রবীন্দ্র-রচনাবলী-অচলিত সংগ্রহ-১, পৃ ৫০১।

(৩) *ওকথা বোল না সখি প্রাণে লাগে ব্যথা···তুমিও কি চিনিলে না আমারে সজনি।

(৪) কতদিন এক সাথে ছিনু ঘুমঘোরে···তখন জানিনু সখি তোরে ভালবাসি। ভগ্নহৃদয়, গান ; রবীন্দ্র-রচনাবলী : অচলিত সংগ্রহ ১, পৃ ১৩৯।

(৫) *কি হবে বল গো সখি ভালবাসি অভাগারে···পোড়ে স্মৃতি নাম যার।

71/৩৭ক (১) *এ হতভাগারে ভাল কে বাসিতে চায় ?···ভালবেসে কাজ নাই স্বজনি আমায়!

(২) *জানি সখা অভাগীরে ভাল তুমি বাসনা···সময় আসিছে কাছে বিদায় বিদায়।

(৩) কেমনে শুধিব বল তোমার এ ঋণ···শূন্য হৃদয়ের যত ঘুচেছে আঁধার জাল। গীতবিতান (১৩৬৭ আশ্বিন) পৃ ৮৭৮।

72/৩৭খ গুহা অন্ধকার ছাড়া ছিল না কিছুই···এই মরুময় স্থানে পাইল প্রকাশ। স্যাকসন জাতি ও অ্যাঙ্‌লো স্যাকসন সাহিত্য, ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৫, পৃ ১৮০।

73/৩৮ক কি করিলি আশার ছলনে···তোমার অমৃত ভবনে। গীতবিতান (১৩৬৭ আশ্বিন), পৃ ৮২৭ (মুদ্রিত পাঠে আছে 'কি করিলি মোহের ছলনে')।

মালতী-পুঁথির সব কটি পৃষ্ঠার আলোকচিত্র দেওয়া সম্ভব হল না বলে মুদ্রণোপযোগী করবার জন্যে পাণ্ডুলিপিটির কিছু সম্পাদনা আবশ্যক হয়েছে। এই সম্পাদনার উদ্দেশ্য কি এবং তার পদ্ধতি কিরূপ আনুক্রমিক টীকায় তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। এক হিসাবে বলতে পারা যায় এই টীকা মালতী-পুঁথির বহিরঙ্গের আংশিক বিবরণ।

মালতী-পুঁথির বহিরঙ্গের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু স্থানাভাববশতঃ সেটি এ সংখ্যায় দেওয়া গেল না। তবু নিদর্শনরূপে তার থেকে কয়েকটি পৃষ্ঠার পরিচয় এখানে তুলে দিচ্ছি। এতে করে পাঠকের কৌতূহল কিছুটা চরিতার্থ হতে পারে।

পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 1/১ক

নাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লেখা। দুটি অনুচ্ছেদ, প্রতি অনুচ্ছেদে সাত ছত্র। মোট চৌদ্দ ছত্র। মালতীপুঁথি—পাণ্ডুলিপি-পরিচয়, পৃ ১৪০ দ্রষ্টব্য।

প্রথম অনুচ্ছেদ এই রকম :

> কস্যচিৎ বৃকস্য গলে অস্থিঃ বিদ্ধরভূৎ। इतस्ततः धाविमानो रधीरः स वृकः पुरस्कारस्य लोभं दर्शयित्वा प्राणियः तस्य यन्त्रणां शमयितुमुवाच। काचित् दीर्घग्रीवा सारसी प्रलुब्धा सन् तस्य कण्ठात् अस्थिं मुमोच। अथ सा तस्मात् पुरस्कारमप्रार्थयत्। तच्छ्रुत्वा स वृकः दन्तान् घृष्ट्वा तामुवाच रे अकृतज्ञ प्राणि, वृकस्य मुखे त्वंम् शिरं प्रविशयित्वा निरापदे वहिस्कारमकुरुताम्, किमधिक-म्पुरस्कारंत्वंम् प्रार्थयसि।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদও প্রথম অনুচ্ছেদেরই পুনর্লিখিত রূপ। বাঘ ও বক বিষয়ক ঈসপের বিখ্যাত গল্পের সংস্কৃত অনুবাদ। কিন্তু যে মূল থেকে অনুবাদ করা হচ্ছিল তার ভাষা ইংরেজি নয় ব'লে মনে হচ্ছে।

এই রচনাংশটিকে ব্যাকরণশিক্ষার অনুশীলনী বলা চলতে পারে। লাইনগুলিতে কাটাকুটি অনেক আছে। প্রথম অনুচ্ছেদে বেশী, দ্বিতীয়ে কম। রচনাটি পড়ে লেখকের সংস্কৃত জ্ঞানের যে পরিচয় পাই তাতে মনে হয় রচনাকালের অন্ততঃ এক বছর আগে সংস্কৃত পাঠ আরম্ভ হয়েছে। লেখক শব্দরূপ অনেকগুলি শিখেছেন, তবে প্রয়োগ সর্বত্র শুদ্ধ হয়নি। প্রথমার একবচনে 'অস্থিঃ' তে বিসর্গ। দ্বিতীয়ার একবচনে 'অস্থিং'। প্রাণিন্ শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনে 'প্রাণিয়ঃ'। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ভুলগুলির কিছু কিছু সংশোধন হয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদে ছিল 'অস্থিঃ বিদ্ধরভূৎ'। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ক্রিয়াপদ বাদ দিয়ে লেখা হয়েছিল 'অস্থি বিদ্ধঃ', তারপর তোলাপাঠে 'অস্থি' ও 'বিদ্ধঃ' এই দুই শব্দের মধ্যে 'খণ্ডৈক' শব্দ বসানো হয়েছে। ফলে ব্যাক্যটির পূর্ণরূপ হল 'অস্থিখণ্ডৈক বিদ্ধঃ'। অস্থি শব্দের অশুদ্ধি চাপা পড়লেও সন্ধির অশুদ্ধি রয়ে গেল। বিসর্গ সন্ধির নিয়ম পুরোপুরি আয়ত্ত হয় নি। ধাতুরূপ শুধু লট্ লোট্ লঙ্ বিধিলিঙ্ নয়, লিট্ পর্যন্ত শেখা হয়েছে। 'উবাচ' এবং 'মুমোচ' শব্দের প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছি।

মনে হয় প্রথম অনুচ্ছেদটি দেখে কেউ মুখে মুখে কিছু কিছু সংশোধন করে দিয়েছিলেন। লেখক নিজের হাতে কেটে সেগুলি শুদ্ধ করে লিখেছিলেন। ব্যাকরণের ভুল ছাড়াও বাগ্‌ভঙ্গীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে যেমন,—অথ সা তস্মাৎ পুরস্কারমপ্রার্থয়ৎ' এই বাক্যকে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ করা হয়েছে, 'অথ তয়া পারিতোষিক

প্রার্থিতঃ'। প্রথম অনুচ্ছেদে 'পুরস্কার' শব্দটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনবারই 'পুরস্কারে'র স্থলে 'পারিতোষিক' করা হয়েছে।

বাংলা লেখায় অভ্যস্ত বালকের পক্ষে নাগরী লিখতে গেলে প্রথম দিকে যে সব ত্রুটি স্বভাবতই ঘটতে পারে তেমন ত্রুটি কয়েকটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মাত্রাগুলি প্রতিটি অক্ষরে স্বতন্ত্রভাবে বসেছে। আকারগুলি [T] এইরকম না হয়ে [ৗ] এইরকম হয়েছে। নাগরীতে 'কশ্চিৎ' এবং 'বভূৎ' লিখতে গিয়ে লেখা হয়েছে 'কস্যচিং' এবং রমুং'। যেখানেই 'ৎ' লেখার কথা সেখানেই বাংলা খণ্ড ত [ৎ] বসে গেছে। এই ধরনের আর একটি গণ্ডগোল ঘটেছে লুপ্ত অকারে। দুটি অনুচ্ছেদে দু-বার লুপ্ত অকার ব্যবহৃত হয়েছে, আকৃতি বাংলার লুপ্ত (ঽ) অকারের মত।

ম্ কোথায় অনুস্বার হবে কোথায় ম্ আকারেই বর্তমান থাকবে আবার কোথায় বা বর্গের পঞ্চম বর্ণে পরিণত হবে সে সম্বন্ধে লেখক নিঃসংশয় নন। একবার লিখছেন, 'কিমধিকং পুরস্কারং ত্বম্ প্রার্থয়সি' আর একবার লিখছেন,—'কিমধিকম্পুরস্কারং ত্বং প্রার্থয়সি'। অনুস্বার চিহ্ন [˙] বর্ণের মাথার উপর বসিয়ে কাটা হয়েছে এবং পরে ওই অনুস্বার স্থলে ম্ বসানো হয়েছে। যেমন,— **হামযিত্নুংমুবাচ** এই বাক্যে 'ত্নু' -এর অনুস্বার কাটা। দু-এক স্থলে এই বিন্দুচিহ্ন অপ্রয়োজনে বসেছে কিন্তু কাটা হয়নি। যেমন— **किमधिकंन्त्वंम्पारितोषिकम्प्रार्थयसि** এই বাক্যে অনুস্বার দুটি অবান্তর। এই বাক্যটি অনুচ্ছেদের বাইরে স্বতন্ত্র ভাবেও পৃষ্ঠার নীচের দিকে আর একবার লেখা হয়েছে। তার থেকে বোঝা যায় বাক্যটি সম্পূর্ণ শুদ্ধ হল কি না সে সম্বন্ধে লেখক নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

নাগরী যুক্তাক্ষরগুলির অধিকাংশই বাংলার মত। বর্ণগুলি নীচে নীচে সাজানো, পাশাপাশি সাজানো নয়। **न्त्व** লেখা হয়েছে 'ন্ত্ব' এর মত,—আগে, **न**, তার নীচে **त**, তার নীচে **व**।

নাগরী বর্ণমালার দু-রকম টাইপ ছাপাখানায় ব্যবহৃত হয় এটা অনেকেই জানেন। এই দুই ধরনের টাইপে কয়েকটি অক্ষরে বিশেষ পার্থক্য আছে। তার মধ্যে অ এবং ণ-এর পার্থক্যটা সহজেই চোখে পড়ে। বাংলা দেশের ছাপাখানায় অ=স ণ=ग। বোম্বাই টাইপ নামে খ্যাত দ্বিতীয় ধরনের টাইপে অ=**अ** এবং ণ=**ण**। আলোচ্য সংস্কৃত রচনাংশ দুটিতে **अ** ও ণ এর টাইপ প্রথমোক্ত প্রকারের।

এই পৃষ্ঠায় কবির ছটি ইংরেজী স্বাক্ষর আছে।—একটি R. N. Tagore, পাঁচটি Rabindra Nath Tagore। দেখলেই বোঝা যায় লেখক স্বাক্ষর মক্শ করছেন। কোন্ স্বাক্ষরটা ভবিষ্যতের জন্যে বহাল রাখা হবে মনের মধ্যে সে চিন্তাটা ক্রিয়াশীল। এই দুটি ছাড়া একটি অর্ধলিখিত স্বাক্ষরও এই পৃষ্ঠায় আছে, R. N. পর্যন্ত লিখে পছন্দ না হওয়ায় কেটে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি ইংরেজী স্বাক্ষরের মক্শ পাণ্ডুলিপির আরও কয়েকটি পৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে। ১৮খ, ২১ক, ২২ক, ২২খ, ২৩ক, ২৪খ, ২৫ক, ২৫খ, ২৮খ এবং ৩০খ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। লক্ষ্য করবার বিষয় ইংরেজী স্বাক্ষর এতগুলি থাকলেও বাংলায় লেখা পূর্ণ স্বাক্ষর একটিও নাই। কবির স্বহস্তে লেখা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু স্বাক্ষর হিসেবে নয়। সারস্বত সমাজের কার্যবিবরণে অন্যান্য কর্মকর্তাদের নামের সঙ্গে কবি তাঁর নিজের নামও লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত বাংলা নাম এতাবৎ যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে

এটিকেই প্রথমতম বলা যেতে পারে। মালতী পুঁথির নামপত্রে আমরা সেই নামটিরই প্রতিরূপ ব্যবহার করেছি। এ ছাড়া ১৪ক পৃষ্ঠার ডাইনে মার্জিনে একটি 'রবি' শব্দ আছে। ৩৬খ পৃষ্ঠায় একটি 'শ্রীরবীন্দ্র' দেখতে পাচ্ছি।

পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 10/৫খ

পৃষ্ঠার ডান দিকে এক সারিতে লেখা ইংরেজি থেকে অনূদিত কয়েকটি কবিতা, পয়ার ছন্দে লেখা। ৪২ ছত্র। ৪০ ছত্র ছাপা হয়েছে। ৪১তম ছত্রের কয়েকটি শব্দ পড়া যায়—

'দেখ গো যেন গো আহা এই প্রিয় স্থান।' এর মধ্যে 'যেন' শব্দের পরবর্তী 'গো আহা' শব্দ দুটি কাটা। ৪২ তম ছত্র অবলুপ্ত।

এই পৃষ্ঠার বাঁ দিকে একটি কবিতার খসড়া। ছত্র সংখ্যা ১৯। কবিতাটি লিখে উপর থেকে নীচের দিকে দুটি লাইন টেনে কেটে দেওয়া হয়েছে। পড়তে অসুবিধে হচ্ছে না। কেবল ১১শ এবং ১৪শ ছত্রের মধ্যবর্তী দুটি লাইন আড়াআড়ি কাটা। চেষ্টা করলে কিছুটা পড়া যায়।

খসড়া কবিতাটি এখানে তুলে দিচ্ছি :

আজি পুরণিমা নিশি
তারকা কাননে বসি
অলস-নয়নে শশি
মৃদু হাসি হাসিছে
পাগল কবির মত
প্রাণের কবিতা যত
নিশীথের কানে কানে
সব যেন ভাষিছে !§
মিলিয়া) পশিছে সে গান যত
সুখের স্বপন মত—
(দিগন্ত বধুর গান ঘুমঘোরে জড়িত ॥
ধীরে স্থিরে পশি ··দিক্‌বধূ শ্রবণে)
সমীর সভয়-হিয়া
মৃদু ২ পা টিপিয়া
উঁকি মারি দেখে গিয়া
লতিকার ভবনে।
বিবর্ণ সায়াহ্ন পূর্ব্বে আসে পা টিপিয়া !
পশ্চিমে আঁধার সন্ধ্যা আসে পা টিপিয়া

বন্ধনীর ( ) মধ্যস্থ অংশ আড়াআড়ি কাটা। § চিহ্নিত ছত্রের পর এবং তৎপরবর্তী ছত্রের মধ্যে 'সমীর অধীর' এই দুটি বিচ্ছিন্ন শব্দ আছে। 'সমীর অধীর' দিয়ে একটি স্তবক আরম্ভ করতে গিয়ে কবি সেটা বাতিল করে দেন, কিন্তু আড়াআড়ি কাটেন নি। পরে ওই পূর্বপরিকল্পিত স্তবকটি নূতন রূপ নিয়েছে ('সমীর সভয়-হিয়া' ইত্যাদি)।

এই খসড়া কবিতার বাঁ দিকের ফাঁকে বড় বড় গোটা গোটা অক্ষরে 'আমার কথা' এই দুটি শব্দ লিখিত আছে।

মালতী-পুঁথির যে পৃষ্ঠানুক্রমিক বিশদ বহিরঙ্গ পরিচয় প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে তারই নমুনা হিসাবে এই দুটি পৃষ্ঠার পরিচয় দেওয়া গেল। সমগ্র পাণ্ডুলিপির পরিচয় যে কতখানি স্থান অধিকার করবে তা এই দুই পৃষ্ঠার বিবরণ থেকেই অনুমান করা যাবে। এই সংখ্যায় স্থানাভাববশত সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হল না সেজন্য আমরা দুঃখিত।

মালতী-পুঁথির ছবি

মালতী-পুঁথির এখানে ওখানে অন্যমনস্কভাবে আঁকা টুকরো টুকরো কয়েকটি ছবি আছে। লিখতে লিখতে কবির মনটা যখন অবকাশ নিয়েছে তখনও কলম থামে নি। হয়তো লেখকের অজ্ঞাতসারেই কাগজের উপরে আঁচড় কেটে চলেছে। রেখার টানে ফুটে উঠেছে নানা ভঙ্গীর মানুষের মুখ, হিজিবিজি আঁচড়ে আঁকা হয়েছে অর্থহীন নক্‌সা, কোনো কোনো কবিতার শেষে অথবা দুই কবিতার মাঝখানে লাইন টেনে সমাপ্তি বা ব্যবধান দেখানো হয়েছে। সে লাইনগুলিও নিতান্ত সরল রেখা নয়, মধ্যে একটু আধটু খোঁচখাঁচ দিয়ে অলংকৃত করা হয়েছে। সমাপ্তিসূচক কয়েকটি নক্‌সা সুন্দর টেলপীসের কাজ করেছে। এছাড়া ইংরেজী স্বাক্ষরের মক্‌শ আছে অনেকগুলি। আত্মীয়-স্বজনের নাম পাণ্ডুলিপির যেখানে সেখানে লেখা। যেমন,— D. N. Tagore, N. Tagore, R. Tagore, S. N. Tagore, S. C. Mookherjee, A. Dass, Dwipendra Nath Tagore, Gopal Chandra Chakravarti। সব নামই ইংরেজিতে লেখা। শেষোক্ত নামটির বাংলা রূপও আছে। নারী নাম একটিমাত্র আছে Neeralata।

কবিতার খসড়ায় কাটাকুটি বিস্তর। কিন্তু সে কাটাকুটি এ-কালের মত চিত্ররূপ ধরেনি।

রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার সম্পাদনায় অনেকের কাছ থেকে অনেক রকমের সাহায্য পেয়েছি। রবীন্দ্রভবনের কর্মিমণ্ডলী, বিশেষত শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীমোহনলাল বাজপেয়ীর নাম এদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি; তিনি তথ্যসংকলন ছাড়াও মালতী-পুঁথির প্রুফগুলি পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার কাজে অনেক সাহায্য করেছেন। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার মুদ্রণ প্রকাশন এবং ইত্যাদি বিষয়ে সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীগোপেশচন্দ্র সেন। গ্রন্থনবিভাগের পক্ষ থেকে ডঃ সুশীল রায় শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে গিয়েছেন, ফলে যখনই প্রয়োজন হয়েছে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার সুযোগ পেয়েছি।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ এই তিনজন মনীষী প্রথম সংখ্যার জন্যে তিনটি অমূল্য প্রবন্ধ দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। প্রবোধবাবুর কাছেই সম্পাদকের ঋণ সব চেয়ে বেশী; সম্পাদনার সর্ব স্তরেই তাঁর সহৃদয় আনুকূল্য পাওয়ায় আমার কর্মভার দুর্বহ হয় নি।

মান্যবর উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাস মহাশয় গত বৎসর যেদিন রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন সেদিন নিজের যোগ্যতার প্রতি আস্থাবশত নয় তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করবার শক্তি নেই বলেই, সে দায়িত্ব নতশিরে গ্রহণ করেছিলাম। আজ প্রথম সংখ্যার কাজ শেষ হল বটে, কিন্তু যে কালসীমার মধ্যে পত্রিকা প্রকাশিত হবার কথা ছিল নানা কারণে তা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। সে অক্ষমতার অপরাধ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য